অনলাইনে ইসলামী তৎপরতা: যেভাবে চলা উচিত

www.maktabatulabrar.com

বই || অনলাইনে ইসলামী তৎপরতা : যেভাবে চলা উচিত
লেখক || মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
প্রকাশনায় || মাকতাবাতুল আবরার
প্রচ্ছদ || আবরার গ্রাফিক্স টিম
অঙ্গসজ্জা || আবরার গ্রাফিক্স টিম

অনলাইনে ইসলামী তৎপরতা:
যেভাবে চলা উচিত

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

গ্রন্থকার, আহকামে যিন্দেগী, ফাযায়েলে যিন্দেগী, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, আহকামে হজ্জ, বয়ান ও খুতবা, ইসলামী ভূগোল ইসলামী ইতিহাস প্রভৃতি।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আবরার

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

www.maktabatulabrar.com

অনলাইনে ইসলামী তৎপরতা:
যেভাবে চলা উচিত

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২২ ঈ.

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আবরার

ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, দোকান নং #২২-২৩

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

(সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)

যাত্রাবাড়ী বিক্রয়কেন্দ্র

আল-কুরআন পাবলিকেশন্স

কিতাব মার্কেট, যাত্রাবাড়ী (বড় মাদরাসা সংলগ্ন), ঢাকা-১২০৪

মোবাইল : ০১৭৬৪-১৮৫৬৫৪

অনলাইনে অর্ডার করুন

www.maktabatulabrar.com

মূল্য : ২৬০/=

ONLINE A ISLAMI TOTPOROTA :
JEVABE CHOLA UCHIT

Writer : Maolana Muhammad Hemayet Uddin

Published by

Maktabatul Abrar

Islami Tower 11/1, Shop #22-23

Banglabazar, Dhaka-1100

Mobile : 01712-306364

www.facebook.com/maktabatulabrarbd

maktabatulabrar@gmail.com

www.maktabatulabrar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ৭
ফেসবুকে আসবেন: লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী ৯
ফেসবুকে যারা ইসলামের পক্ষে কাজ করেন তাদের উদ্দেশে কিছু কথা........ ১৩
রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফেসবুক প্রভৃতি থেকে ধর্মীয় বিষয় শেখার ক্ষেত্রে করণীয়........ ১৬
দ্বীনী ইলম অর্জন অনলাইনে নয় অফলাইনেই শ্রেয় ২৮
সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অবাধে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে ৩৩
ফেসবুক ও ইউটিউব: যেগুলোর তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন খুব বেশি ৩৭
ইউটিউবে ইসলামী ভিডিও: কত কিছুই ভিত্তিহীন ৪০
ফেসবুকে নামডাক: আহামরি কিছু নয় ৪৪
ফেসবুকে কিছু ভাইরাল হওয়া সত্য হওয়ার প্রমাণ নয় ৪৯
গ্রন্থ পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি ৫২
অধ্যয়নের জন্য বিষয় ও গ্রন্থ নির্বাচন করার পদ্ধতি ৫৯
যে কোন গ্রন্থ পাঠ করার পূর্বে তার লেখক সম্বন্ধে যা জেনে নেয়া চাই ৬৬
দ্বীনী গ্রন্থ অধ্যয়ন: কোন বিষয়ের আগে কোন বিষয়ের পরে হওয়া চাই ৬৯
অধ্যয়নের জন্য কীভাবে গ্রন্থ নির্বাচন করবেন? ৭১
কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিউ: পদ্ধতি ও মাসায়েল ৭৫
চালু হয়েছে রিভিউ বেচাকেনা: উপার্জনের এক সহজ পদ্ধতি ৮০
যে কোন বিষয় অধ্যয়নের পূর্বে আপনার জ্ঞান কোন স্তরের তা বিবেচনায় রাখুন ৮৩
কারও ফলোয়ার হতে চাইলে তার কী দেখে নেয়া চাই?........ ৮৬
আলেম ও বুযুর্গদের প্রতি ভক্তির ভিত্তি কী হওয়া চাই ৯০
প্রসঙ্গ: আল্লামা ও বিশেষজ্ঞ ৯৩
কেউ ডক্টর: তার মানে কি তিনি সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ? ৯৮

www.maktabatulabrar.com

সমালোচনার নীতিমালা ১০২
আলেমদের সমালোচনা করতে পারবেন কারা, কীভাবে? ১১৩
সমালোচনা করে আলেম সমাজকে কলঙ্কিত করে দিলে কাদের লাভ? ১১৭
উলামায়ে কেরাম সামনে না থাকলে কি আদব রক্ষার গুরুত্ব কমে যায়? ১২১
প্রসঙ্গ: অমুক আলেম এটা করেন না কেন? তমুক আলেম সেটা করেন না কেন? ১২৫
সমালোচনার ভাষা কেমন হওয়া উচিত ১৩৬
সমালোচনার জন্য যাচাই-বাছাই চাই দলীল-প্রমাণ চাই ১৩৯
সোশ্যাল মিডিয়া গভীর ইলমী তাহকীকের জায়গা নয় ১৪২
সব বাতিল-ভণ্ডের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় আনতে নেই ১৪৬
সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যায় পোস্ট দেখলে যা করণীয় ১৪৯
ফেসবুক ইউটিউব: লাইক শেয়ার প্রসঙ্গ ১৫১
সোশ্যাল মিডিয়ায় যতসব বাজে চর্চা ১৫৬
ফেসবুকে কয়েকটি বিভ্রান্তি ১৫৯
গীবত ও গালিগালাজ কি সোশ্যাল মিডিয়ায় জায়েয হয়ে গেল? ১৬৫
যারা ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদিতে অন্যের কেলেংকারি ছড়াতে মজা বোধ করে ১৬৮
ওয়াজ-মাহফিলে চলছে বিকৃত চর্চা: কারা দায়ী? ১৭১
সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্রি স্টাইলে ভিডিও/ছবি ছাড়া কি জায়েয হয়ে গেল? ১৭৭
সোশ্যাল মিডিয়ায় লেগেছে ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ: আপনি কী করবেন? ১৮৮
কথায় কথায় কাফের ফতোয়া দেয়া প্রসঙ্গ ১৯২
যেগুলো ইসলামী গবেষণার সঠিক ফর্মুলা নয় ১৯৬

✦ সূচী সমাপ্ত ✦

ভূমিকা

সম্প্রতি ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন তথ্য আদান-প্রদান, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য প্রচারের এক বিস্তৃত প্লাটফর্মে পরিণত হয়েছে। মন্দের পাশাপাশি ভাল অনেক ধরনের তথ্যও এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। প্রচুর মানুষ এখন সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন বিভিন্ন সোর্স থেকে নানান ধরনের বিদ্যা ও শিক্ষা অর্জন করছে। তার মধ্যে ধর্মীয় বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখন যে কোন ধরনের ধর্মীয় বিষয় জানতে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইনের স্মরণাপন্ন হচ্ছে, সহযোগিতা নিচ্ছে। তাই উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার তবকার লোকেরাও সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইনকে দ্বীনী দাওয়াতের প্লাটফর্ম হিসেবে গ্রহণ করে এগুলোতে বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় তথ্য প্রদান, বয়ান ভাষণ ও পোস্ট দেয়ার কাজে এগিয়ে এসেছেন।

কিন্তুসোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন এমন প্লাটফর্ম যেখানে যোগ্য অযোগ্য, বুঝমান না-বুঝ সব ধরনের লোকের অবাধ বিচরণ। ফলে এখানে দ্বীনের কথা বলা এবং দ্বীনী বিষয়াদি উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যতটা সতর্কতার প্রয়োজন তার অভাব পরিলক্ষিত হয় অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে। আবার এসব প্লাটফর্মে প্রচুর বাতিল-ভণ্ডেরও তৎপর উপস্থিতি রয়েছে। ফলে এসব মিডিয়া থেকে তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে কতভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই তা জানা বুঝার অভাবও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের অন্যায় পোস্ট দেয়া কিংবা কোন পোস্টে অন্যায় লাইক শেয়ার দেয়া বা অন্যায় কমেন্ট করার মত ত্রুটি-বিচ্যুতিও দেখা যায় প্রচুর। এসব কিছুর প্রেক্ষিতে বিগত এক বছর (২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত) সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইনে ইসলামী তৎপরতার ক্ষেত্রে কত ধরনের ভুল-বিচ্যুতি বিরাজ করছে, সেগুলো সম্বন্ধে সতর্ককরণ এবং এসব মিডিয়া থেকে তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে কতভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা চাই ও কীভাবে ইসলামী তৎপরতাগুলো পরিচালিত হওয়া উচিত- এ জাতীয় বিষয়াদির ওপর আমি ৪১টা প্রবন্ধ লিখি এবং সেগুলো ফেসবুক ও অনলাইনে ব্যাপকভাবে প্রচার করি। প্রবন্ধগুলো সুপ্রভাব ফেলেছে বলে আমাদের ধারণা।

অনেক পাঠক প্রবন্ধগুলো একত্রে গ্রন্থ আকারে হাতে পাওয়ার আকাঙ্খা পেশ করেছেন। আমরাও সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইনে

www.maktabatulabrar.com

ইসলামী তৎপরতাসমূহের ভাল মন্দ যাবতীয় দিকের গাইড সম্বলিত এ লেখাগুলো একত্রে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করলে আগ্রহীদের জন্য একত্রে এ বিষয়গুলো পাওয়া সহজ হবে চিন্তা করে গ্রন্থ আকারে এগুলো প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলাম। গ্রন্থটি অনলাইনে বিচরণকারী সকলের জন্য উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে কবূলিয়াতের দুআ করছি। আমীন!

বিনীত
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
১০/৪/২০২২

ফেসবুকে আসবেন: লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

বিগত ১৩ এপ্রিল ২০২১ রোজ মঙ্গলবার জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল আওয়ার ইসলাম (Ourislam24.com)-এর সম্পাদক মাওলানা হুমায়ুন আইয়ুব সাহেব যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় এসেছিলেন সাক্ষাতের জন্য। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা হল। এক কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ফেসবুকে হক কথা প্রচার করার বিরাট সুযোগ রয়েছে, প্রয়োজনও রয়েছে। ফেসবুক দাওয়াতী কাজ করার এক বিরাট অঙ্গন। আল-হামদুলিল্লাহ আমাদেরও প্রচুর লোক রয়েছে ফেসবুকে, অনেক মেধাবীরাও এখানে কাজ করছেন। অনেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন। পাশাপাশি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রচুর লোক এমন আছে ফেসবুকে যাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক নেই। তাদের কাজই হল কার কী দোষ পাওয়া যায় সেগুলো খুঁজে খুঁজে একত্র করা আর সেগুলো অন্যদের শেয়ার করা, ব্যস। ঘুমানোর পূর্বে আর ঘুম থেকে উঠে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতেরও আগে অন্তত আধা ঘন্টা করে ফেসবুক দেখতেই হবে, নইলে পেটের ভাত হজম হবে না। কিন্তু কেন এই ফেসবুক দেখা তার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাদের নেই।

www.maktabatulabrar.com

হুমায়ুন আইয়ুব সাহেবের কথায় ফেসবুকে উদ্দেশ্য লক্ষ্যহীনভাবে চলার কারণে মনের কষ্ট প্রকাশও ছিল, আবার তার আড়ালে দিক-নির্দেশনাও ছিল। তার কথায় মূলত দুটো দিক-নির্দেশনা ছিল। এক. ফেসবুকে বিচরণের পেছনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকা চাই। দুই. মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো বা অনুরূপ নেতিবাচক লক্ষ্য উদ্দেশ্য অবশ্যই না থাকা চাই। ভাবলাম এ দুটো বিষয় নিয়ে একটা নাতিদীর্ঘ লেখা দাঁড় হতে পারে।

বস্তুত ফেসবুকে মানুষ কত উদ্দেশ্যে বিচরণ করে তার কোন ইয়ত্তা নেই। প্রেমপ্রীতি করা তো একটা কমন উদ্দেশ্য রয়েছেই। এ ছাড়া বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাজ করে। কেউ বাজারে উঠে আসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম আত্মপ্রচারমূলক অডিও ভিডিও ছাড়ে। কেউ আছে কার কী কী দোষ পাওয়া যায় সেগুলো খুঁজে খুঁজে অন্যদের শেয়ার করার কাজে ব্যস্ত। কেউ আছে শুধু অন্যের সমালোচনা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ আছে নিজের রূপ চেহারা দেখানো নিয়ে ব্যস্ত। তারা বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে ছবি তুলে তা স্টোরিতে ছাড়ছে। এর পেছনে কী মহৎ (?) উদ্দেশ্য তা তারাই ভালো জানেন। কেউ কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছাড়াই যখন যা মনে চায় অবলীলায় তাতে জড়িয়ে পড়ে। তাদের অবস্থা হল চলতে চলতে দেখল এক স্থানে ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে ইট ছোড়াছুড়ি হচ্ছে তো ব্যস মারো একটা ইট। কিংবা দেখল কিছু লোক কারও কাপড় নিয়ে টানাটানি করছে ব্যস মারো একটা টান। আবার জ্ঞান চর্চা ও আদর্শ বিস্তারের মহতী লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়েও অনেকে কাজ করে যাচ্ছেন। এভাবে মন্দ ভাল কত লক্ষ্য উদ্দেশ্যে কতজন কাজ করে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কার কী লক্ষ্য উদ্দেশ্য তা নিজেরটাই প্রত্যেকে ভাল জানেন। আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই দ্বীন ধর্ম ও আদর্শ-বিরোধী লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেন রাখা না হয়। কিংবা লক্ষ্য উদ্দেশ্যহীন চলাও যেন না হয়। মানুষের জীবনে সব কাজের পেছনেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকা চাই এবং অবশ্যই ভালো লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকা চাই। অবলীলায় জীবন চালানো কিংবা গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়া মহৎ জীবনের ধারা হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।

ফেসবুকে কত রকম অনিয়ম বিশৃঙ্খলা রয়েছে তারও কোন ইয়ত্তা নেই। প্রতিপক্ষের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত দিয়ে কথা বলা, টিকা-টিপ্পনী কাটা, প্রতিপক্ষের মান-হানিকর কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন- এগুলো তো

মামুলি, রীতিমত অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ পর্যন্ত প্রয়োগ করা হচ্ছে। ছুতোনাতা অজুহাতে প্রতিপক্ষকে কাফের ফাসেক ইত্যাদি ফতোয়াও দেয়া হচ্ছে। যার যোগ্যতা নেই সেও যোগ্য ব্যক্তিদের সমালোচনা করছে। বড়দের সমালোচনা করতে আদব-তমিজেরও বালাই থাকছে না। মানুষের দোষ খুঁজে খুঁজে সেগুলো অন্যদের শেয়ার করে কুরুচিকর আনন্দ উপভোগ করা হচ্ছে। অন্যের কেলেংকারি জানতে পারলে প্রমাণিত হোক না হোক তা ছড়াতে মজা বোধ করা হচ্ছে। এসব অনিয়ম বিশৃঙ্খলার কোনটাই শরীয়তসম্মত নয়, নীতিসম্মত নয়, সুরুচিসম্মত নয়, বিবেকসম্মত নয় বরং অনেকটাই পাপের। তা সত্ত্বেও ইসলামের লেবাসে এগুলো করা হচ্ছে এবং ভাল জ্ঞানে করা হচ্ছে। ফেসবুকে যারা বিচরণ করেন, তাদের মধ্যে যারা আলেম রয়েছেন, সমঝদার রয়েছেন, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রয়েছেন তারা যদি এ জাতীয় অন্যায় ও পাপমূলক পোস্ট দেখলে তা লাইক শেয়ার না করে বরং প্রত্যেকে কমেন্ট করেন যে, এরকম বলা বা এগুলো প্রচার করা পাপ, আর পাপের পন্থায় ইসলামের কাজ হয় না, তাহলে এ জাতীয় পোস্ট নিরুৎসাহিত হবে, এগুলোর পরিমাণ ধীরে ধীরেহ্রাস পাবে। যারা আলেম, সমঝদার ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন তাদের দায়িত্বও রয়েছে শরীয়তবিরোধী কাজ দেখলে জবান দ্বারা সেটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা। এভাবে শরীয়তবিরোধী, নীতিবিরোধী ও বিবেকবিরোধী তৎপরতাগুলো প্রতিহত করার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ফেসবুকে বিচরণ করলে ফেসবুক থেকে রকমারি তথ্য আহরণও হবে, সাথে সাথে দ্বীনী দাওয়াত ও গর্হিত তৎপরতা ইসলাহের ছওয়াবও হবে।

উল্লেখ্য- ফেসবুক একটা জগাখিচুড়ি ফিল্ড। এখানে শিক্ষিত, যোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও রুচিসম্পন্ন লোকের পাশাপাশি অশিক্ষিত, অযোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও কুরুচিপূর্ণ লোকেরও সমাবেশ রয়েছে এবং তাদের সংখ্যা নগন্যও নয়। তাদের দ্বারা এই ফিল্ড যাচ্ছে তাই হয়ে যাচ্ছে। তাই এই ফিল্ডে ইসলাহী তৎপরতা চালানোর প্রয়োজন অনেক বেশি। এখানে বাজে লোকের সংখ্যা বেশি, এর ইসলাহ করা সম্ভব নয়- এমনটা ভেবে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। কারণ যেভাবেই হোক প্রচুর লোক জ্ঞান চর্চার সহজ ফিল্ড হিসেবে ফেসবুককে বেছে নিয়েছে এবং শতভাগ লোককে ফেসবুক থেকে বিরত করাও আপাতত

www.maktabatulabrar.com

সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। তাই পুরো ইসলাহ সম্ভব না হলেও যতটুকু সম্ভব তার চেষ্টা থেকে বিমুখ না হওয়া চাই। আরবী বাগধারায় আছে- ما لا يدرك كله لا يترك كله অর্থাৎ পুরো পাওয়া যাবে না বলে পুরোটাই ছেড়ে দেয়া হবে না। বোঝানো হয়েছে পুরো না পাওয়া গেলেও যতটুকু পাওয়া যায় তার জন্যই চেষ্টা চালানো চাই।

এতক্ষণ ফেসবুকে ইসলাহী তৎপরতা চালানোর প্রয়োজন সম্বন্ধে বলা হল। ফেসবুকের ন্যায় টুইটার ইউটিউব প্রভৃতি অন্য সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতেও ইসলাহী তৎপরতা চালানোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আল্লাহ্ আমাদের ভাল কিছু করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ফেসবুকে যারা ইসলামের পক্ষে কাজ করেন তাদের উদ্দেশে কিছু কথা

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

ফেসবুক এখন তথ্য আদান-প্রদান ও মতামত তুলে ধরার একটি বহুল ব্যবহৃত গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ফেসবুকে চলছে অনেক ধরনের লেখালেখি ও বলাবলি। ব্লগ, স্টেটাস, স্টোরি- ইত্যাদি নামে ও ধরনে চলছে লেখালেখি। আর বয়ান-ভাষণ, ওয়াজ-নসীহত, অডিও ভিডিও- ইত্যাদি নামে ও ধরনে চলছে বলাবলি। এই বলাবলি ও লেখালেখি জাগতিক বিষয়াদি নিয়ে যেমন হচ্ছে, তেমনি হচ্ছে ইসলামী বিষয়াদি নিয়েও। ইসলামের পক্ষেও চলছে বলাবলি ও লেখালেখি, চলছে বিপক্ষেও। হকপন্থীগণও বলছেন লিখছেন, বাতিলরাও বলছে লিখছে। ইসলামের পক্ষ ও বিপক্ষের মধ্যে এবং হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদের মধ্যে চলছে লেখালেখি ও বলাবলির যুদ্ধ। ফেসবুকে এই যুদ্ধ এখন সরগরম। যারা ফেসবুক আইডি ব্যবহার করেন তারা আইডিতে ঢোকা মাত্রই এরকম যুদ্ধের তাজা তাজা খবর পেতে থাকেন। ইদানিংকার এসব যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য হেন প্রকারের অস্ত্র নেই যা ব্যবহার করা না হচ্ছে। অস্ত্র হিসেবে প্রতিপক্ষের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত দিয়ে কথা বলা,

www.maktabatulabrar.com

টিকা-টিপ্পনী কাটা, প্রতিপক্ষের মান-হানিকর কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন- এগুলো তো মামুলি, রীতিমত অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ পর্যন্ত প্রয়োগ করা হচ্ছে। ছুতোনাতা অজুহাতে প্রতিপক্ষকে কাফের ফাসেক ইত্যাদি ফতোয়াও দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার কোনো যুদ্ধেই সব ধরনের অস্ত্র প্রয়োগের অনুমতি থাকে না। ইসলাম বাতিলপন্থীদের সাথে লেখালেখি ও বলাবলির যুদ্ধে এসব অস্ত্র প্রয়োগের অনুমতি দেয়নি। প্রতিপক্ষের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত দিয়ে কথা বলা, টিকা-টিপ্পনী কাটা, প্রতিপক্ষের মান-হানিকর কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন, গালিগালাজ-এগুলো ইসলামে অনুমোদিত নয়। এগুলোর অনেকটা স্পষ্টত হারাম ও গোনাহে কাবীরা। আর গোনাহের পন্থায় এবং ইসলামে অনুমতি নেই- এমন পন্থায় কোন কাজ করলে সেটা ইসলামের কাজ বলে গণ্য হয় না। সেসব পন্থায় কাজ করে কেউ হয়তো মনের ঝাল মেটাতে পারবেন, লাইক বাহবা কুড়াতে পারবেন, হয়তো তাদের কথা ও লেখার প্রচুর শেয়ারও হবে, হয়তো কোনটা ভাইরালও হবে, কিন্তু তারা এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে ভাল কিছু পাবেন না তা নিশ্চিত। যারা ইসলামের স্বার্থে কিছু করতে চান, আল্লাহর কাছে ভাল কিছু পাওয়ার নিয়তে করতে চান তাদেরকে অবশ্যই ইসলামী নীতিমালার আওতায় থেকেই সবকিছু করতে হবে। যারা সমালোচনার অঙ্গনে কাজ করতে চান তাদেরকে ইসলামে সমালোচনার নীতিমালা কি তা জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কাজ করতে হবে। যাদের মধ্যে সমালোচনা কর্মের যোগ্যতা নেই, যারা সমালোচনার নীতিমালায় উত্তীর্ণ নন বা উত্তীর্ণ হতে পারবেন না তাদেরকে এই অঙ্গনে বিচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ফেসবুকে চলছে আরও অনেক ধরনের গলত তরীকা ও ভ্রান্ত পন্থা-পদ্ধতি। যেমন ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই না করেই অবলিলায় যার তার পোস্ট, স্ট্যাটাস, স্টোরি ও ব্লগ পাঠ করে তা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং অন্যদের তা শেয়ারও করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে বহু দ্বীনী বিষয়ও রয়েছে। অথচ কারও থেকে দ্বীন-ধর্ম বিষয়ক কোন জ্ঞান নিতে হলে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নেওয়ার রয়েছে। ফেসবুকে অবলম্বিত আর একটা গলত তরীকা হল- যার তার কাছ থেকে বইপত্রের সাজেশন নেয়া হচ্ছে। কারও একটা বিষয় সম্বন্ধে বই-কিতাব সংগ্রহের চিন্তা জাগল, অমনি ফেসবুকে আবেদন জানিয়ে একটা পোস্ট ছেড়ে দিল- অমুক বিষয়ে

কোন কোন বই-কিতাব পাঠ করা যায়? আর যার তার থেকে সাজেশন পেয়েই তা আমলে নেয়া হল। অথচ কোন বই সম্বন্ধে সাজেশন দেয়া যার তার কাজ নয়। যার তার থেকে সাজেশন নিয়ে তদনুযায়ী কাজ করলে ক্ষেত্র বিশেষে প্রতারিত হতে হয়, বিভ্রান্ত হতে হয়। ফেসবুকে আর একটা বিভ্রান্তি হল- পর্যাপ্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনেকে বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিও দিচ্ছেন। রিভিও দেয়া কোন ছেলেখেলা নয়। কোন একটা গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিও দিতে হলে সেই গ্রন্থের লেখকের চেয়েও বেশি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তদুপরি কোন ব্যক্তিস্বার্থের একপেশে চেতনা থেকে নয় বরং নিরপেক্ষ চেতনা থেকে, আমানতদারির চেতনা থেকে রিভিও হওয়া চাই। কিন্তু ফেসবুকের রিভিওগুলো কি এমন হচ্ছে? ফেসবুকের এসব গলত তরীকা সম্বন্ধে আমি কয়েকটি বিশদ বিবরণমূলক লেখা সকলের খেদমতে পেশ করেছি। সেগুলোর শিরোনাম হচ্ছে- (১) ফেসবুকে কয়েকটা বিভ্রান্তি (২) রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদি থেকে ধর্মীয় বিষয় শেখার ক্ষেত্রে করণীয় (৩) অধ্যয়নের জন্য বিষয় ও গ্রন্থ নির্বাচনের পদ্ধতি (৪) গ্রন্থ পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি। লেখাগুলো পূর্বে উল্লিখিত আইডি, পেজ ও ওয়েবসাইটসমূহে দেখে নেয়া যাবে।

ফেসবুকে পরিচালিত ইসলামী তৎপরতাসমূহে আরও যেসব ভুল-বিচ্যুতি চলছে সেগুলো সম্বন্ধেও পর্যায়ক্রমে লেখা পেশ করব ইনশাআল্লাহ। ফেসবুকে পরিচালিত ইসলামী তৎপরতাসমূহে বিরাজমান ভুল-বিচ্যুতির সংস্কার সাধনের লক্ষেই এই প্রয়াস। সকলকে এই সংস্কারমূলক প্রয়াসের সাথে থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। সকলকে আমার উপরোক্ত লেখাগুলো দেখার এবং নিজ নিজ আইডি, পেজ, গ্রুপ ও ওয়েবসাইটে সেগুলো পোস্ট করার মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার আবেদন রাখছি।

وما علينا إلا البلاغ

www.maktabatulabrar.com

রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফেসবুক প্রভৃতি থেকে ধর্মীয় বিষয় শেখার ক্ষেত্রে করণীয়।

আবশ্যক পরিমাণ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরযে আইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ। আবশ্যক পরিমাণ জ্ঞান (যা প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন) বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয় এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজনীয় লেন-দেন ও কায়-কারবার সম্পর্কিত বিষয়াদির মাসআলা-মাসায়েল ও হু কুম-আহকাম জানা। আবশ্যক পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত ইল্‌ম যা অন্যেরও উপকারার্থে প্রয়োজন, তা হাছিল করা ফরযে কেফায়া অর্থাৎ, কতক লোক তা অর্জন করলে সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়।

প্রয়োজন পরিমাণ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা যেহেতু ফরয, তাই কুরআন-হাদীছের জ্ঞানার্জন সতর্কতার সঙ্গেই সম্পন্ন হতে হবে। কারণ ফরয বিষয় অবশ্যই সতর্কতার বিষয়। সতর্কতার সঙ্গে তা না হলে যথাযথভাবে ফরয আদায় না হওয়ায় গোনাহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে সু-শিক্ষার পরিবর্তে কু-শিক্ষা, হেদায়েতের পরিবর্তে

গোমরাহী এসে যাওয়ার মাধ্যমে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই সতর্কতার সঙ্গেই এই জ্ঞান অর্জনের কাজ নিষ্পন্ন হওয়া চাই। কার থেকে এই জ্ঞান অর্জন করতে হবে, কীভাবে করতে হবে তা সযত্ন সতর্কতার সঙ্গেই নিষ্পন্ন হওয়া চাই। যার থেকে যা কিছু শোনা যাবে, যেখানে যা কিছু লেখা পাওয়া যাবে কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই যদি তা গ্রহণ করা হয়, তাহলে অবশ্যই তা হবে সতর্কতার পরিপন্থী। তাই প্রত্যেক মুসলমানেরই জানা উচিত কার থেকে এবং কীভাবে এই জ্ঞান অর্জন করতে হয় এবং কোন্ পন্থায় জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে কী কী করণীয়। অতএব এ পর্যায়ে দুই ধরনের আলোচনা সামনে আনা প্রয়োজন।

১. ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার পন্থা কি কি ?

২. সেই পন্থাগুলোতে জ্ঞান অর্জন করার নিয়ম-নীতি ও শর্ত কি কি?

এর মধ্যে বিশেষভাবে রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফেসবুক প্রভৃতি থেকে ধর্মীয় বিষয় শেখার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। তবে আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার খাতিরে ব্যাপকভাবেই আলোচনা পেশ করা হবে।

ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার পন্থা প্রধানত দু'টি। এক. কোন ব্যক্তি থেকে শুনে শেখা তথা ব্যক্তির ক্লাস বা পাঠদানের আসর থেকে শুনে কিংবা ব্যক্তির ওয়াজ, বয়ান ও বক্তব্য-ভাষণ, কারও অডিও ভিডিও শুনে শেখা। রেডিও টেলিভিশন থেকে শুনে শেখাও শুনে শেখার অন্তর্ভুক্ত। ক্যাসেট বা সিডি থেকেও শেখাও এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। দুই. কোন ব্যক্তির লেখা পাঠ করে শেখা তথা কোন ব্যক্তির লেখা বই-পুস্তক থেকে শেখা। পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার, বিবৃতি, মতামত, মন্তব্য, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি থেকে শেখাও এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির লেখা থেকে শেখাও এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে বলা যায়, ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার পন্থা প্রধানত দু'টি। যথা: ব্যক্তি থেকে শেখা, কিতাবপত্র থেকে শেখা।

যে কেউ উপরোক্ত পন্থাদ্বয়ের যে পন্থায়ই ধর্মীয় বিষয় শিখতে চায় তার জন্য কিছু নিয়ম-নীতি ও শর্ত রয়েছে। অবলীলায় যে কারও কথা শুনে কিংবা যে কারও লেখা পাঠ করে ধর্মীয় বিষয় শেখা বিহিত নয়। তাতে সু-শিক্ষার পরিবর্তে কু-শিক্ষা এসে যেতে পারে, হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী এসে যেতে পারে। তদুপরি তাতে ফরয দায়িত্ব যথাযথভাবে

www.maktabatulabrar.com

নিষ্পন্ন না হওয়ায় ফরয তরকের গোনাহ থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সু-শিক্ষার স্বার্থে, কু-শিক্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে এবং গোনাহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন্ পন্থায় ধর্মীয় বিষয় শেখার কি নিয়ম-নীতি ও শর্ত সে সম্বন্ধে জানা আবশ্যক। নিম্নে কুরআন-হাদীছের আলোকে শিক্ষা অর্জনের প্রধান দুটো উপায় তথা ব্যক্তি থেকে শেখা ও কিতাব-পত্র থেকে শেখার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পেশ করা হল।

ব্যক্তি থেকে শেখা প্রসঙ্গে

কোন ব্যক্তি থেকে শেখার অর্থ হল তাকে উস্তাদ বানানো। আর কাউকে উস্তাদ বানানোর পূর্বে তার সম্বন্ধে অন্তত তিনটা বিষয় আগেই জেনে নিতে হবে। সে তিনটা বিষয় হল

১. তিনি হকপন্থী কি না, তার আকীদা-বিশ্বাস সহীহ কি না, অর্থাৎ, তিনি সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না তা যাচাই করে নিতে হবে। বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী কোনো লোককে উস্তাদ বানানো যায় না। মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামায় (ভূমিকা অংশে) রেওয়ায়েত আছে হযরত ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন,

إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. (مقدمة الصحيح لمسلم)

অর্থাৎ, নিশ্চয় (কুরআন-হাদীছের) এই জ্ঞান দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছো (অর্থাৎ, কার থেকে দ্বীনী ইলম গ্রহণ করছো) তা যাচাই করে নিয়ো। (মুকাদ্দামাতু মুসলিম)

২. তিনি ভাল জাননেওয়ালা তথা যোগ্য আলেম কি না। যদি আলেম না হয়ে থাকেন তাহলে কোন যোগ্য আলেমের সাহচর্যে থেকে ধর্ম শিক্ষা করে ধর্মীয় শিক্ষার বিশুদ্ধ মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন কি না এ বিষয়টা যাচাই করে নিতে হবে। যিনি আলেম নন বা ধর্মীয় শিক্ষার বিশুদ্ধ মানে উত্তীর্ণ নন, এমন লোক থেকে কিছু শেখা হলে অজ্ঞ লোক থেকে শিখলে যা হয় তা-ই হবে। অজ্ঞ লোক নিজেও বিভ্রান্ত অন্যরাও তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। এরূপ অযোগ্য লোককে উস্তাদ বানানোর নিষেধাজ্ঞা বুঝে আসে বোখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অর্থাৎ, আল্লাহ বান্দাদের অন্তর থেকে ইল্‌ম ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নিবেন না, বরং আলেমদের তুলে নেয়ার মাধ্যমে ইল্‌মকে তুলে নিবেন। তারপর যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না, লোকেরা অজ্ঞ লোকদের ধর্মীয় গুরু বানাবে। তাদের কাছে ধর্মীয় বিষয় জানতে চাইবে। তারা সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই সমাধান বলে দিবে। ফলে তারা তো বিভ্রান্ত রয়েছেই অন্যদেরও বিভ্রান্ত করবে। (বোখারী: হাদীছ নং ১০০)

৩. তিনি ইলম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। আদর্শবান ব্যক্তি না হলে তার বক্তব্যে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যার প্রতিফলন না-ও ঘটতে পারে। এ জাতীয় ব্যক্তিদের অনেকে নিজেদের বে-আমলী ও আদর্শহীনতাকে ঢাকা দিয়েই কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। আমরাও নিত্য তা প্রত্যক্ষ করে থাকি। তাই আমলহীন ব্যক্তির বক্তব্য থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। তাছাড়া তা'লীম বা শিক্ষাদানের সঙ্গে শিক্ষকের নৈতিক চরিত্র তথা তারবিয়াত, তায্‌কিয়া ও আদর্শস্থানীয় হওয়ার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষকের মধ্যেই যদি শিক্ষার প্রতিফলনের অভাব থাকে তাহলে শিক্ষার্থীর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়াটা অনিবার্য। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে তাই আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে তা'লীম ও তায্‌কিয়া বিষয় দু'টোকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ.

অর্থাৎ, তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের তায্‌কিয়া (পরিশুদ্ধি) করবেন। (সূরা বাকারা: ১২৯) বলা বাহুল্য, অন্যদের তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধি যখন করবেন, নিজের মধ্যেও অবশ্যই পরিশুদ্ধি থাকবে। কেউ অন্যদের ভাল হওয়ার জন্য বলবে আর নিজে ভাল হবে না, তার বিরুদ্ধেও কুরআনে কারীমে বক্তব্য এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ.

অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে নেক কাজের কথা বল আর নিজেদেরকে ভুলে যাও? (সূরা বাকারা: ৪৪) এ আয়াতে যারা অন্যদেরকে ওয়াজ-নসীহত করবে বা শিক্ষা দিবে তাদেরকে ঐ বিষয়ের আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করবে না তাদের শাসানো হয়েছে। তাহলে এ আয়াত থেকেও বুঝা গেল শিক্ষকের ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি হওয়া চাই।

আমল ও নৈতিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হল ইল্‌ম বা শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। আর মনস্তাত্ত্বিকভাবেই শিক্ষার্থী শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক উপযোগিতা দেখতে চায়। এ বিষয়টিও তার প্রেষণার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক উপযোগিতা দেখার প্রথম ক্ষেত্র হল শিক্ষকের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবন। তাই শিক্ষকের ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রয়োগ না দেখলে শিক্ষার্থীর প্রেষণা বলবতি হয় না। অধিকন্তু ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বিরূপ প্রতিচ্ছায়া পড়তে পারে। তাই শিক্ষকের ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক।

"ব্যক্তি থেকে শেখা" শিরোনামে এ পর্যন্ত কাউকে উস্তাদ বানানোর পূর্বে তার সম্বন্ধে অন্তত যে তিনটা বিষয় আগেই জেনে নিতে হয় যাচাই করে নিতে হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রমাণ-ভিত্তিক আলোচনা পেশ করা হল। সংক্ষেপে কোন ব্যক্তি থেকে শেখার আগে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনটা বিষয় জেনে নিতে হয়। যথা: ১. তিনি সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না। ২. তিনি ভাল জাননেওয়ালা কি না। ৩. তিনি ইলম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। নিজের পক্ষে এসব বিষয় যাচাই করা সম্ভব না হলে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সহযোগিতা নিতে হবে।

অতএব, কোন ব্যক্তির ক্লাস বা পাঠদান থেকে কিংবা কারও ওয়াজ, বয়ান ও বক্তব্য-ভাষণ শুনে, কারও অডিও ভিডিও শুনে শেখার পূর্বে তাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলো জেনে বুঝে নিন। রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সিডির, অডিও ভিডিওর বক্তাদের সম্বন্ধেও সেগুলো ভালভাবে জেনে বুঝে নিন। আপনি যদি তাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়াবলী

তাহকীক-তদন্ত ছাড়াই, যথাযথভাবে না জেনেই তাদের কথা অবলীলায় গ্রহণ করেন তাহলে আপনার জন্য তা ভালোর পরিবর্তে মন্দের তথা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব আপনার হেদায়েত লাভ কিংবা হেদায়েত রক্ষার স্বার্থে অবলীলায় কোন ব্যক্তিকে বা রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সিডির, ভিডিওর বক্তাদেরকে উস্তাদ বানাবেন না, তথা তাদের কথা গ্রহণ করবেন না।

এ পর্যায়ে উল্লেখ্য যে, আজকাল বাজারে গ্রহণযোগ্য অগ্রহণযোগ্য নির্বিশেষে সব ধরনের ওয়ায়েজ ও বক্তাদের ক্যাসেট বা সিডি পাওয়া যায়, আর দেখা যায় মানুষ কোনো বাছ-বিছার ছাড়াই এসব ক্যাসেট ও সিডি ক্রয় করে আনে এবং তা থেকে শেখা শুরু করে দেয়। অনেক মানুষ দোকান থেকে মোবাইলে ওয়াজ লোড করে আনে এবং অবলীলায় তা শুনে তা থেকে শেখা শুরু করে দেয়। কিংবা কোথাও ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে জানল, ব্যস সে মাহফিলে গিয়ে কথা শুনল, গ্রহণ করল, আমল শুরু করে দিল। এসব ক্ষেত্রে যাচাই করা হয় না কার বক্তব্যের কাসেট, কার বক্তব্যের সিডি, কার ওয়াজ, কার বয়ান, তিনি আদৌ মানোত্তীর্ণ কি না, গ্রহণযোগ্য কি না। রেডিও টেলিভিশনে যারা ধর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন তাদের সম্বন্ধেও অনেক শ্রোতা উপরোক্ত তিনটা শর্তের আলোকে তারা উত্তীর্ণ কি না তা পরখ করে নেন না। পরখ করা ছাড়াই অবলীলায় তাদের কথা গ্রহণ করেন। রেডিও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও প্রায়শই ধর্ম সম্বন্ধে আলোচক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ নীতির আদৌ তোয়াক্কা করেন না। তারা সযত্নে যেগুলো দেখেন তা হল আলোচকের চেহারা ফটোজেনিক কি না, তাকে দেখতে স্মার্ট লাগে কি না, তার গলার ভয়েস সুন্দর কি না, উপস্থাপন আকর্ষণীয় কি না ইত্যাদি। এ ছাড়া গ্রুপিং লবিং ইত্যাদি কতকিছু যে তারা দেখেন তা তারাই ভাল জানেন। তারা এ বিষয়গুলো দেখুন তাতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যদের তেমন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু মানুষের হেদায়েত বা গোমরাহীর সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়, সঠিক বা ভুল পরিবেশনের সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়, হক না-হকের সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়– সে বিষয়গুলো তারা চিন্তায় না রেখেই অবলীলায় ধর্মীয় বিষয়ের আলোচক নির্ধারণ করবেন, এভাবে অনেক ক্ষেত্রে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীর বিস্তার ঘটাবেন, তাতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও বিশুদ্ধ পন্থার বিস্তারপ্রয়াসী মুসলমানদের

www.maktabatulabrar.com

আপত্তি থাকাই স্বাভাবিক। আমরা রেডিও, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

এখানে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রায়শই যে নীতি অবলম্বন করে থাকেন সে সম্বন্ধে কিছু কথা বলা হল। এ পর্যায়ে রেডিও টেলিভিশনের শ্রোতা দর্শকদের সম্বন্ধেও কিছু কথা বলতে চাই। রেডিও, টেলিভিশনের অনেক শ্রোতা দর্শকের অবস্থা হল তারা বক্তার বাহারি টুপি, বিশাল আকারের পাগড়ি, জুব্বা, আসকান, চেহারার আকর্ষণ, নামের শুরুতে উপাধির বহর, টাইটেল ইত্যাদি দেখে-শুনে মনে করেন বাপরে বাপ সাংঘাতিক বড় আলেম, কত ডিগ্রী, কী নূরানী চেহারা! এভাবে তারা মুগ্ধ হয়ে পড়েন, ভক্তিতে বিগলিত হয়ে যান। তারা আরও মনে করেন ভাল আলেম না হলে কি এসব লোক রেডিও, টেলিভিশনে চান্স পেতেন? এই শ্রেণীর শ্রোতা দর্শকদের উদ্দেশে বলছি, বাহারি টুপি, পাগড়ি, জুব্বা, আসকান, চেহারার আকর্ষণ– এগুলো ভাল আলেম হওয়া দূরের কথা আদৌ আলেম হওয়ারই দলীল নয়। রেডিও, টেলিভিশনে চান্স পাওয়াও যোগ্য আলেম হওয়ার দলীল নয়। রেডিও, টেলিভিশনে বক্তা নির্বাচিত হওয়ার কিছু সূত্র তো পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। আর উপাধি ডিগ্রীর প্রকৃত বাস্তবতা কি তারা যাচাই করেছেন? না করে থাকলে কীভাবে উপাধি ডিগ্রীর বহর দেখে নুয়ে পড়েন?

কেউ যেন ভুল না বোঝেন তাই এখানে উল্লেখ করা সংগত মনে হচ্ছে যে, রেডিও, টেলিভিশনের পর্দায় যারা আসেন তাদের কেউই যোগ্য নয়, গ্রহণযোগ্য নয় তা আমাদের বলা উদ্দেশ্য নয়। হয়তো তাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হবেন। আমরা যা বলছি তা হল রেডিও, টেলিভিশনের বক্তাদের কথা গ্রহণ করার পূর্বে তাদের সম্বন্ধে জেনে নিন তারা যোগ্য কি না, গ্রহণযোগ্য কি না, অর্থাৎ, তারা সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না, তারা ভাল জাননেওয়ালা কি না, তারা ইলম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। এসব বিষয় যাচাই-বাছাই না করে অবলীলায় তাদের কথা গ্রহণ করবেন না।

যাহোক কোন বক্তা, ওয়ায়েজ, ভাষণদাতা, রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সিডি, অডিও ভিডিওর বক্তা প্রমুখদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত তিনটা বিষয় ভালভাবে জেনে বুঝে নিন। তাহকীক-তদন্ত এবং যথাযথভাবে বাছ-বিচারের পর কোন বক্তা,

ওয়ায়েজ, ভাষণদাতা কিংবা রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সিডির বক্তাগণ উস্তাদ বানানোর যোগ্য বিবেচিত হলেই তাদেরকে উস্তাদ বানাতে পারেন এবং সেমতে তাদের কথা শুনে শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারেন, অন্যথায় নয়।

"ব্যক্তি থেকে শেখা" পর্যায়ের এতক্ষণের আলোচনার সারকথা হিসাবে বলা যায়,

● অবলীলায় কোন ব্যক্তিকে উস্তাদ বানাবেন না।

● অবলীলায় যে কারও ধর্মবিষয়ক ভাষণ-বক্তব্য শুনবেন না।

● অবলীলায় রেডিও, টেলিভিশনকে উস্তাদ বানাবেন না।

● অবলীলায় ক্যাসেট, সিডিকে উস্তাদ বানাবেন না।

● অবলীলায় আপনার মোবাইলে যে কারও ওয়াজ, বয়ান লোড করে তা শুনবেন না।

● অবলীলায় ওয়াজ মাহফিলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না। সর্বাগ্রে যাচাই-বাছাইয়ের কাজটা সেরে নিবেন।

কিতাব-পত্র থেকে শেখা প্রসঙ্গে

কারও লিখিত কিতাব-পত্র পাঠ করে শেখার অর্থও উক্ত কিতাব-পত্রের লেখককে উস্তাদ বানানো। অতএব পূর্বে কাউকে উস্তাদ বানানোর আগে তার সম্বন্ধে যে তিনটা বিষয় জেনে নেয়ার কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য। অর্থাৎ, কারও লিখিত কিতাব-পত্র পাঠ করে ধর্মীয় বিষয় শিখতে হলে তার লেখক সম্বন্ধে তিনটা বিষয় আগেই জেনে নিতে হবে। বিষয় তিনটা একটু ভিন্নভাবে আবার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি।

১. তিনি হকপন্থী কি না, তার আকীদা-বিশ্বাস সহীহ কি না, অর্থাৎ, তিনি সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না তা জেনে নিতে হবে। কোন বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী লোককে উস্তাদ বানানো যাবে না। অতএব কোন বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী লেখকের লেখাও পাঠ করা যাবে না। বিজ্ঞ আলেম নন এমন ব্যক্তির জন্য কোন বাতিলপন্থী ও বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লিখিত বা প্রচারিত বইপত্র পাঠ করা ঠিক নয়। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য বিধর্মীদের কিতাব যেমনঃ তাওরাত, ইঞ্জীল, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করাও জায়েয নয়। অনেকে যুক্তি

www.maktabatulabrar.com

দিয়ে থাকেন, আমরা পাঠ করে ভালটি গ্রহণ করব মন্দটা গ্রহণ করব না, তাহলে কী অসুবিধা? এ যুক্তি এজন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ভাল/মন্দ সঠিকভাবে বিচার করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকায় তিনি হয়ত মন্দটাকেই ভাল ভেবে গ্রহণ করে বিভ্রান্তি ও গোমরাহী-র শিকার হয়ে পড়বেন।

২. তিনি ভাল জাননেওয়ালা তথা যোগ্য আলেম কি না। যদি আলেম না হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কোন যোগ্য আলেমের সাহচর্যে থেকে লিখেছেন কি না বা লিখে কোন যোগ্য আলেম দ্বারা সত্যিকার অর্থে সম্পাদনা বা ন্যূনপক্ষে যাচাই-বাছাই করিয়ে নিয়েছেন কি না।

৩. তিনি ইল্ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। আদর্শবান ব্যক্তি না হলে তার লেখায় কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যার প্রতিফলন না-ও ঘটতে পারে। এ জাতীয় লেখকদের অনেকে নিজেদের বে-আমলী ও আদর্শহীনতাকে ঢাকা দিয়েই কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। আমরাও নিত্য এটা প্রত্যক্ষ করে থাকি। তাই আমলহীন লেখকের লেখা থেকে ধর্মীয় বিষয় শেখা নিরাপদ নয়।

"কিতাব-পত্র থেকে শেখা" শিরোনামে এ পর্যন্ত কারও লেখা কিতাব-পত্র পাঠ করার পূর্বে তার সম্বন্ধে অন্তত যে তিনটা বিষয় আগেই জেনে নিতে হয় যাচাই করে নিতে হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল। সংক্ষেপে কোন লেখকের লেখা থেকে শেখার আগে ঐ লেখক সম্বন্ধে তিনটা বিষয় জেনে নিতে হয়। যথা: ১. তিনি সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না। ২. তিনি ভাল জাননেওয়ালা কি না। ৩. তিনি ইলম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। নিজের পক্ষে এসব বিষয় যাচাই করা সম্ভব না হলে এ ব্যাপারে সঠিক জাননেওয়ালাদের সহযোগিতা নিন, বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সহযোগিতা নিন।

যাহোক, কোন ব্যক্তির লেখা বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার, বিবৃতি, মতামত, মন্তব্য, স্ট্যাটাস, ব্লগ, পোস্ট, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে উপরোক্ত তিনটা বিষয় ভালভাবে জেনে বুঝে নিন। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদিতে যারা ধর্মীয় বিষয়ে লেখেন তাদের সম্বন্ধেও উপরোক্ত বিষয়গুলো ভালভাবে জেনে বুঝে নিন। আপনি যদি তাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়াবলী তাহকীক-তদন্ত

ছাড়াই, যথাযথভাবে না জেনেই তাদের লেখা অবলীলায় গ্রহণ করেন তাহলে আপনার জন্য তা ভালোর পরিবর্তে মন্দের তথা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব আপনার হেদায়েত লাভ কিংবা হেদায়েত রক্ষার স্বার্থে অবলীলায় যেকোনো গ্রন্থের লেখক কিংবা ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির লেখকদেরকে উস্তাদ বানাবেন না। বিনা বাছ-বিচারে তাদের লেখার প্রতি আস্থা স্থাপন করবেন না।

এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, ইসলামের শত্রুরাও ইসলাম সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তাদের লোকদের দিয়ে ইসলামের নামে ইসলাম সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়ে থাকে। ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েব সাইটে, ফেসবুকে, টুইটারেও ইসলামের শত্রু ও ইসলাম বিদ্বেষীরা এরূপ অপপ্রয়াস নিয়ে থাকে, যা আমাদের সকলেরই কমবেশ জানা আছে। তাই অবলীলায় যেকোনো লেখা গ্রহণ করবেন না। তাহকীক-তদন্ত এবং যথাযথভাবে বাছ-বিচারের পর কোন গ্রন্থের লেখক এবং ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির লেখকরা উস্তাদ বানানোর যোগ্য বিবেচিত হলেই তাদেরকে উস্তাদ বানাতে পারেন এবং সেমতে তাদের লেখা পাঠ করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারেন, অন্যথায় নয়।

আজকাল ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন তথ্য আহরণ সহজ বিধায় ব্যাপকহারে মানুষ এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এটা একদিকে খুশির বিষয় এ জন্য যে, জ্ঞান লাভ সহজতর হয়েছে, ফলে ব্যাপক মানুষ শেখার সুযোগ পাচ্ছে, শিখছে। আবার অন্যদিকে অখুশি এবং আশংকারও বিষয় এ কারণে যে, অনেকেই কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই অবলীলায় বিভিন্ন ওয়েব সাইট বা ফেসবুকে যা পাচ্ছে তাতে আস্থা স্থাপন করে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে বা হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। অনেকেরই অবস্থা এমন একটা কিছু সম্বন্ধে জানতে মনে চাইল, ব্যস সংশ্লিষ্ট শব্দটা লিখে সার্চ দিয়ে যা বের হল তা-ই গোগ্রাসে গিলে নিল। সংশ্লিষ্ট তথ্য বা তত্ত্ব কে বা কারা পরিবেশন করেছে, তারা আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না, তারা খাদ্যের নামে যা পরিবেশন করেছে তা আসলেই খাদ্য না অখাদ্য এ বিষয়গুলো ভাববার ও বাছ-বিচার করার কোনো প্রয়োজনই তারা অনুভব করে না। বাজার থেকে খাদ্য-খাবার ক্রয় করতে গিয়েও তো আমরা খাঁটি না ভেজাল তা নিয়ে সামান্য হলেও একটু ভেবে নেই, যথাসাধ্য যাচাই-বাছাই করে

www.maktabatulabrar.com

তারপর ক্রয় করি। ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞান কি এতই হেলাফেলার হয়ে গেল যে, তা নিয়ে মোটেই কিছু ভাববার নেই, মোটেই বাছ-বিচারের প্রয়োজন নেই? তাছাড়া বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে মাযহাবগত কিছু পার্থক্যও রয়েছে। আপনি যার লেখা পড়ছেন, তিনি ভিন্ন মাযহাবের কি না, তিনি ভিন্ন মতবাদের কি না, তা-ও তো যাচাইয়ের প্রয়োজন? একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, তিনি যে মাযহাবেরই হোন ধর্মের কথা হলেই আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। এরূপ মনে করা ঠিক নয় এ কারণে যে, তাহলে সেটা হবে যে মাযহাবের যেটা পছন্দ সেটা গ্রহণ করার নীতি, সেটা হল খাহেশাত অনুযায়ী চলার নীতি, যা গ্রহণযোগ্য নয়, গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে মাযহাব মানা জরুরি এবং যে মাযহাবই হোক একটিরই অনুসরণ করতে হবে, একেক বিষয়ে একেক মাযহাবের অনুসরণ করা যাবে না। তাই কারও লেখা থেকে কিছু গ্রহণ করতে হলে তিনি আপনার মাযহাবের কি না, আপনার মতবাদের কি না তা-ও যাচাই করার প্রয়োজন। এভাবে যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন বহুবিধ কারণে। এসব প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই যে কারও লেখা অবলীলায় গ্রহণ করলে আপনার সঠিক পথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কিংবা সঠিক পথে টিকে থাকার নিশ্চয়তা কীভাবে লাভ হবে?

কেউ যেন ভুল না বোঝেন তাই পরিষ্কার করে বলছি, ইন্টারনেটের ওয়েব সাইট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি সবকিছুকে সর্বতোভাবে বর্জন করুন তা বলছি না। আমরা যা বলছি তা হল এগুলো থেকে অবলীলায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করবেন না, বাছ-বিচার ছাড়া গ্রহণ করবেন না। এগুলো থেকে শিখতে চাইলে আগে যাচাই-বাছাইয়ের পর্বটি সেরে নিন। এগুলো সর্বতোভাবে বর্জনের কথা বলে আমরা যেমন প্রান্তিকতার প্রবক্তা হতে চাই না, তেমনি অবলীলায় এগুলো থেকে সবকিছু গ্রহণ করার মত লাগামহীনতারও সমর্থনকারী হতে চাই না।

"কিতাব-পত্র থেকে শেখা" পর্যায়ের এতক্ষণের আলোচনার সারকথা হিসাবে বলা যায়,

- অবলীলায় কোন গ্রন্থকে উস্তাদ বানাবেন না।
- অবলীলায় ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটারকে উস্তাদ বানাবেন না।
- অবলীলায় যেকোনো লেখা পড়ে তার প্রতি আস্থা আনবেন না।
- অবলীলায় লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদির বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করবেন

না। সর্বাগ্রে যাচাই-বাছাইয়ের কাজটা সেরে নিবেন।

সর্বশেষে সংক্ষেপে বলতে চাই, ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অসচেতন নয় সচেতন থাকুন। ধর্মীয় শিক্ষার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী মেনে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করুন, সঠিক পন্থায় থাকবেন। যাচাই-বাছাই পূর্বক শিক্ষা গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকবেন। আল্লাহ আমাদেরকে সবকিছু সঠিকভাবে বুঝার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.maktabatulabrar.com

দ্বীনী ইলম অর্জন অনলাইনে নয় অফলাইনেই শ্রেয়

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

আদি কাল থেকে অফলাইনেই দ্বীনী ইলম অর্জনের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। সরাসরি কোন ব্যক্তি থেকে শুনে বা কোন ব্যক্তির রচিত কিতাবপত্র পাঠ করে দ্বীনী ইলম অর্জনের যে ধারাবাহিকতা সেটিই হল অফলাইনের ধারাবাহিকতা। কিন্তু সম্প্রতি অফলাইনের পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের আর একটা লাইন চালু হয়েছে, সেটার নাম অনলাইন। অনলাইন বলতে নেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। এই অনলাইনে এখন প্রচুর লোক জ্ঞান অর্জন করছে। এবং এ লাইনটা সহজিয়া লাইন হওয়ার কারণে দিন দিন এখানে ভিড় বাড়ছে। এটাকে সহজিয়া লাইন বললাম এ কারণে যে, এ লাইনে জ্ঞান অর্জন করার জন্য কিতাবপত্র সংগ্রহের ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয় না, কিতাবপত্র ঘাটাঘাটির কষ্ট করতে হয় না, জানার জন্য কারও কাছে যাওয়া বা কোথাও সফর করার কষ্টও সইতে হয় না। শুধু মোবাইলে বা কম্পিউটারে একটা কিছু লিখে সার্চ দিলেই সাজানো গোছানো রেডিমেড সব তথ্য সামনে চলে আসে।

এভাবে অনলাইনে জ্ঞান অর্জন করা সহজ বটে তবে তাতে বহুবিধ সমস্যাও রয়েছে। শুধু সমস্যা নেই অনলাইনে কেউ যদি কোন গ্রন্থের সফট কপি বা পিডিএফ সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করে। সেটা অফলাইনে গ্রন্থ পাঠের মতই হবে। সেটা যেকোনো সময় প্রিন্ট দিয়ে হার্ড কপিতে পরিণত করে বই বানিয়ে নেয়া যায়। নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত- এমন কোন লেখকের কোন ব্লগ (প্রবন্ধ/নিবন্ধ), স্ট্রোরি, স্ট্যাটাস ইত্যাদি পাঠ করেও জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে। এর বাইরে অনলাইনে জ্ঞানার্জনে রয়েছে বহুবিধ সমস্যা। যেমন:

১. অনলাইনে ইলম কার থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে সাধারণত তা যাচাই করে নেয়া হয় না। কেউ যাচাই করে নিতে চাইলেও অনেক সময় প্রয়োজনীয় ডাটা না পাওয়ায় তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অথচ কারও থেকে দ্বীনী ইলম গ্রহণ করতে হলে আগে তার সম্বন্ধে যাচাই করে নিতে হয় তিনি নির্ভরযোগ্য লোক কি না, তিনি ভাল জাননেওয়ালা কি না, তিনি আমলওয়ালা কি না, তার আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সহীহ কি না, তিনি হকপন্থী কি না ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত ইবনে সিরীন রহ. বলেছেন, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم অর্থাৎ, ইলম হচ্ছে একটি দ্বীনী বিষয়। অতএব লক্ষ্য রেখো কার থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

২. অনলাইনে ব্যক্তি সম্বন্ধে যাচাই করতে গিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। কারণ একজন লোক যেমন নয় তেমনই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তার সম্বন্ধে প্রচার পাওয়া যায়। পূর্বে 'ফেসবুকে নামডাক: আহামরি কিছু নয়' এবং 'ফেসবুকে কিছু ভাইরাল হওয়া সত্য হওয়ার প্রমাণ নয়' শিরোনামের দু'টো ব্লগে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. অনলাইনে যেসব ইসলামী শিক্ষামূলক অডিও ভিডিও পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রচুর ভিত্তিহীন অডিও ভিডিও রয়েছে। কোনটার ভিত্তি আছে কোনটা ভিত্তিহীন তা নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেগুলো থেকে অর্জিত জ্ঞানে বিভ্রাট-এর সম্ভাবনা থেকে যায়। এসব অডিও ভিডিও থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনকারীরা ভুয়া কিংবা অনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। পূর্বে 'ইউটিউবে ইসলামী ভিডিও: কতকিছু ভিত্তিহীন' শিরোনামের একটি ব্লগে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

৪. ইদানিং অডিও ভিডিওতে কোন ব্যক্তির কণ্ঠে যেসব কথা উচ্চারিত হয় ঐ কথাগুলো যে ঐ ব্যক্তিরই তার নিশ্চয়তাও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি কানাডার কিছু বিজ্ঞানী এমন এক সফটওয়্যার আবিষ্কার করেছে যা দ্বারা যে কোন ব্যক্তির কণ্ঠ কপি করে তা দিয়ে আরও বহু শব্দ ও কথা তৈরি করা যায়, যেগুলো শুনলে মনে হবে হুবহু সেই ব্যক্তিরই কথা। যদিও মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই সফটওয়্যার অনুমতি পায়নি, তবে হ্যাকারদের হাতে ইতিমধ্যে তা পৌঁছে গেছে। তাই যেকোনো সময় এর অপব্যবহার ছড়িয়ে পড়তে পারে। (ইতিমধ্যে বিভিন্ন জনকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানোর কাজে এর ব্যবহার শুরু হয়েও গেছে।) এরূপ অপব্যবহার দ্বীনী অডিও ভিডিওর ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হতে পারে। তাহলে কার অডিও ভিডিও শুনে আস্থা করা যাবে? সন্দেহের মধ্য দিয়েই চলবেন? তা কোন রকম সন্দেহ বা অস্পষ্টতা নিয়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা তো বিধিবদ্ধ নয়।

৫. বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার ওপরই বা কতটু কু আস্থা করা যায়? অনেক সময় এমন হয় কিছুদিন পর খুঁজলে সেই ওয়েবসাইটের পাত্তাই নেই কিংবা ইতিমধ্যে পূর্বে পেশকৃত তথ্যের মাঝে আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। কেন পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তার কোন ব্যাখ্যাও নেই। কিছু লেখক ও গবেষককে আমরা দেখেছি যারা অফলাইনে পড়াশোনা ছাড়া শুধুই এ জাতীয় ওয়েবসাইট নির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে কোন রচনা বা গবেষণাপত্র দাঁড় করেছে তারপর এক সময় তাদের কাছে কোন তথ্যের বরাত তলব করা হলে তারা সেসব ওয়েবসাইট খুঁজেই পায়নি। তখন তাদের অবস্থা হয়েছে শুধু কটমট করছে- শালার পুত তথ্যগুলো গেল কোথায়! কিংবা আমি এখন কার খালু। অফলাইনে পড়াশোনা করলে এসব বিভ্রাট দেখা দেয় না। তবে হ্যাঁ অনলাইনে পেশকৃত তথ্যাবলির রেফারেন্স খুঁজে সেই রেফারেন্স বুকগুলোর সঙ্গে যদি সরাসরি মিলিয়ে নেয়া হয় এবং তার উপরই আস্থা করে সবকিছু দাঁড় করানো হয় তাহলে এমনতর সমস্যা দেখা দেয় না। এ পদ্ধতিতে অনলাইনের বর্ণনাকে ফাইনাল হিসেবে নয় বরং তথ্য খুঁজে পাওয়ার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এটা লেখক গবেষকদের কাজে আসানী পয়দা করে।

৬. যারা লেখাজোখার কাজ করেন বা গবেষণা করেন তারা অনলাইনে পেশকৃত রেফারেন্স-এর ওপর কতটুকু ভরসা করতে পারেন? অনেকেই তো বরাত দিয়ে থাকে আরেকজনের বরাত দেখে। অথচ সে বরাত হয়ে থাকে ভুল। এ সমস্যা অনলাইনের ন্যায় অফলাইনেও আছে, তবে পার্থক্য হল অফলাইনে বরাত প্রদানকারীদের খুঁজে পাওয়া যায়, প্রয়োজনে তাদের সাথে পর্যালোচনাও করে নেয়া যায়, কিন্তু অনলাইনের বরাত প্রদানকারীরা কোন ফাঁকে যে চুপচাপ কেটে পড়ে, তা মালূমও করা যায় না।

৭. অনলাইনে পেশকৃত দলীল-প্রমাণের টেক্সটগুলোর ওপর (যেমন হাদীছের মতনের ওপর) কতটুকু ভরসা করা যায়? যেখানে অফলাইনের কিতাবপত্রে বহুপ্রুফ দেখা ও বহুবার যাচাই-বাছাই পূর্বক মুদ্রণ সত্ত্বেও হাদীছের মতনে এমনিভাবে তাফসীর, ফেকাহ প্রভৃতির মতনে প্রচুর গরমিল পাওয়া যায় (মূল কিতাবের মতনের সঙ্গে মিলালে যা অহরহ ধরা পড়ে)। যেমন মেশকাত শরীফ ও কানযুল উম্মালে এমনটা প্রচুর ধরা পড়ে। বর্তমানে প্রচলিত মাকতাবায়ে শামেলাতেও প্রচুর এমন ভুল-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। অথচ লেখক গবেষকদের দলীল-প্রমাণের টেক্সটগুলোর ওপর পূর্ণ নিশ্চয়তা অর্জন হওয়া আবশ্যক।

৮. অনেকেই মূল কিতাবের সাথে মতন না মিলিয়েই আরেকজনের বর্ণনা করা মতন নকল করে দেন, আর এভাবে নকল হতে হতে মতন কোথা থেকে কোথায় চলে যায়! এ সমস্যা অফলাইনেও হয়ে থাকে, তবে অনলাইনের সহজিয়া অঙ্গনে এটা খুব বেশি হয়ে থাকে। তাহলে শুধু অনলাইন নির্ভর ইলম দিয়ে কীভাবে নিশ্চিত পথ চলা সম্ভব?

৯. একটা সময় ছিল যখন গোটা দুনিয়ায় ইসলামী কিতাবপত্র ছিল দশ বিশটা, পঞ্চাশটা, একশ দু'শটা। তখন একজন লোকের পক্ষে সবগুলো কিতাব পাঠ করা এবং একই কিতাব বারবার পাঠ করে মুখস্থ বা আত্মস্থ করা সাধ্যের মধ্যে ছিল, সহজ ছিল। বলা যায় তখন আলেম ও পণ্ডিত হওয়া সহজ ছিল। তখন একজন সম্বন্ধে বলা সহজ ছিল যে, সব কিতাবপত্র তার পড়া আছে। কিন্তু কালক্রমে এখন ইসলামী বইপত্রের সংখ্যা লাখো লাখো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন একজন আলেমের পক্ষে সব ইসলামী বই আদ্যোপান্ত পাঠ করা এবং কোন বইতে কী আছে তা সব তাফসীলী মনে রাখা সম্ভবপর থাকেনি। এখন এতটুকু মনে রাখতে পারাই অনেক যে, অমুক বিষয়ের আলোচনা অমুক অমুক কিতাবে আছে, অমুক বিষয়ের আলোচনা অমুক অমুক কিতাবে আছে। প্রয়োজনের সময় সংশ্লিষ্ট কিতাবগুলো দেখে নেয়া। বর্তমান যুগে কেউ এতটুকু হতে পারলেই তিনি বড় আলেম বা বড় পণ্ডিত। কিন্তু অনলাইনে এখান থেকে ওখান থেকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের ছড়ানো ছেটানো তথ্য সংগ্রহ করে পণ্ডিত হতে চাইলে তেমনটাও হবে না। কেননা প্রয়োজনের সময় হয়তো সেসব ওয়েবসাইটের পাত্তাই পাওয়া যাবে না। তদুপরি এসব নেট ফেট কতদিন থাকবে বা কীভাবে থাকবে, ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে- সবই তো অনিশ্চিত।

www.maktabatulabrar.com

১০. অনলাইনে কিতাব বা উস্তাদ সেভাবে সামনে না থাকায় ইলমের প্রতি যে আজমত জাগ্রত হওয়া কাম্য তা হয় না। এটা দ্বীনী ইলমের জন্য অনুকূল নয়।

১১. মূল কিতাবপত্র ঘাঁটলে যে নজর পয়দা হয় অনলাইনে তথ্য ঘাঁটার দ্বারা সে নজর পয়দা হয় না। এ নজর হল মনের নজর একজন পাঠক চর্মচক্ষু বন্ধ করার পরও মনের চক্ষু দিয়ে যে পঠিত বিষয় এবং কোথায় কীভাবে লেখা তা দেখতে পায় সেই নজর।

১২. সবশেষে কথা হল অনলাইনে বহু রকম সংশয় সন্দেহ বিদ্যমান থাকায় অনলাইন থেকে অর্জিত জ্ঞানে মনের দৃঢ়তা আসে না। অথচ দ্বীনী ইলমের জন্য দৃঢ়তা আবশ্যক। আগেও বলেছি কোন রকম অস্পষ্টতা নিয়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা বিধিবদ্ধ নয়।

অনলাইনে দ্বীনী ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আরও বহু রকমের সমস্যা রয়েছে, এখানে বিশেষ বারটা সমস্যার কথা উল্লেখ করা হল। এখন কথা হল- সাধারণ মানুষ এতসব সমস্যার আবর্ত থেকে কীকরে গা বাঁচিয়ে সুষ্ঠভাবে দ্বীনী ইলম অর্জন করতে পারবে? এটা তো বহু পঙ্কিল পথ, বহু ঝামেলাপূর্ণ পথ। তাই বলছিলাম, দ্বীনী ইলম অর্জন অনলাইনে নয় অফলাইনেই শ্রেয়!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অবাধে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

"দ্বীনী ইলম অর্জন অনলাইনে নয় অফলাইনেই শ্রেয়"- এ শিরোনামে পূর্বে আমি একটা আর্টিকেল লিখেছি এবং অনলাইনে তা প্রচার করেছি। তাতে কিছুটা বিশদভাবে উল্লেখ করেছি অনলাইনে দ্বীনী ইলম তথা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করাতে কত ধরনের সমস্যা রয়েছে। সেসব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলে অনলাইনেও দ্বীনী ইলম অর্জন করা যেতে পারে। তবে তার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট যাচাই-বাছাই ও সতর্কতার। কিন্তু সে রকম যাচাই-বাছাইয়ের যোগ্যতা অনেকের মধ্যেই অনুপস্থিত। আবার সতর্কতার অভাবও রয়েছে অনেকের। ফলে যাচাই-বাছাই ছাড়া সতর্কহীনভাবে অবাধে নেট থেকে সব ধরনের দ্বীনী কথা গ্রহণ অনেকের জন্য বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে বিষয়টা লক্ষ করছি। অনেকটা অসহায়ের মত বিষয়টা লক্ষ করছি। উদ্বেগের কারণ তো স্পষ্ট।

www.maktabatulabrar.com

আর অসহায়ের মত এজন্য যে, নেটে যারা বলেন লেখেন তাদের মধ্যে প্রচুর এমন লোক রয়েছেন যারা প্রকৃতপক্ষে বলার বা লেখার যোগ্য নন। কিন্তু তারা বলে যাচ্ছেন লিখে যাচ্ছেন। তাদেরকে আঁটকে রাখা যাচ্ছে না। অফলাইনে অযোগ্যরা প্রতিষ্ঠা পায় না। তারা অফলাইনে বক্তব্য দিয়ে ময়দানে স্বীকৃতি না পেয়ে অনুৎসাহিত হয়। তাদের লেখাও সমাজ তেমন খায় না, ফলে তারা সে লাইন থেকেও পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু অনলাইনে যোগ্যতার দরকার হয় না। এখানে মোবাইল বা কম্পিউটার টিপে কিছু লিখে ছেড়ে দিলেই হয়। ঘরে বসে অডিও ভিডিও তৈরি করে ছেড়ে দিলেই হয়। তারপর ফ্রেন্ড ফলোয়ারদের দিয়ে শেয়ার করিয়ে কিংবা কিছু পয়সা খরচ করে বুস্ট করে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায়। আর এভাবে ব্যাপক পরিচিতিও ঘটে যায়। এভাবে অনেকে সেলিব্রেটিও হয়ে যায়। বিশেষত উপস্থাপন একটু সুন্দর হলে, কথার ফাঁকে ফাঁকে দু' চারটে ইংরেজি বাক্য ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলতে পারলে তো খুব দ্রুতই সেলিব্রেটি হয়ে যায়। তখন তাদের কথা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এভাবে গুরুত্বহীনরাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন তাদের কথা -যা তাহকীকী নয় তাও- তাহকীকী কথার মর্যাদা পেয়ে বসে। আর এভাবে দ্বীনী ইলমের অঙ্গনে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। এগুলো আমরা বন্ধ করতে পারছি না, কোনোভাবেই এ অঙ্গনে কাউকে লাগাম দিয়ে টেনে রাখা যাচ্ছে না। তাই অসহায়ের মত এসব তৎপরতা আর তার ফলে সৃষ্ট বহু মানুষের বিভ্রান্ত হওয়া শুধু লক্ষ করে যাচ্ছি আর পেরেশান হচ্ছি।

বস্তুত নেটে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর তাল-বেতালের অডিও, ভিডিও, আর্টিকেল ও পোস্ট রয়েছে। ঈমান আকীদা, ইসলামী চিন্তাধারা, সুন্নাত বেদআত, মাসআলা-মাসায়েল যাবতীয় বিষয়ে তাল-বেতালের বক্তব্য রয়েছে। একটা জিনিসকে তের জন চৌদ্দ রকমের করে বুঝাচ্ছেন। বাতিল-ভণ্ডের অভাব নেই, তারা একেকজন একেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। একটা সুস্পষ্ট না-হক জিনিসকেও অনেকে হক করে দেখানোর চেষ্টা করছেন। একটা পোস্টে নানান তালের কমেন্ট আসছে। এমনকি একজন গণ্যমান্য বিজ্ঞ আলেমের একটা কথা নিয়েও অযোগ্যদের পক্ষ থেকে নানান রকম ট্রল হচ্ছে। এখান থেকে এক কুঁচো চিংড়ি লাফ দিয়ে উঠছে, ওখান থেকে এক পুঁটিমাছ লাফ দিয়ে উঠছে, সেখান থেকে এক টাকিমাছ লাফ দিয়ে উঠছে! নানান তালের অপরিপক্ক ও ভুলভাল মন্তব্য

আসছে। কে কী বুঝাতে চায়, কার কী মতলব তা-ও অনেক সময় ঠাহর করা মুশকিল হচ্ছে। রীতিমত মাথা খারাপ করার অবস্থা। দিশেহারা হওয়ার অবস্থা। এতকিছুর মধ্য থেকে কোনটা প্রকৃতপক্ষে সঠিক তা বাছাই করে বের করা মজবুত আলেম ছাড়া অন্যদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ নেটে বিচরণকারীদের মধ্যে সাধারণ মানুষের তথা গর-আলেমদের সংখ্যাই বেশি। তারা এসব নানামুখী কথার মধ্য থেকে যার যেটা ভাল মনে হচ্ছে সেটা গ্রহণ করছে, যদিও সেটা প্রকৃতপক্ষে ভাল নয়, সঠিক নয়। এসব কিছুর প্রেক্ষিতে নেট থেকে দ্বীনী ইলম শিখতে আগ্রহী সাধারণ লোকদের উদ্দেশে বলতে হচ্ছে, সাবধান থাকবেন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অবাধে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ আপনাদেরকে যেন গোমরাহ করে না দেয়। নিজেদের দ্বীন রক্ষার স্বার্থে সাবধান থাকবেন, নতুবা আপনাদের দ্বীন বরবাদ হয়ে যেতে পারে। কেবল তাদের থেকেই দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করুন যারা নিশ্চিত হকপন্থী। এ ছাড়া অন্যদের থেকে কিছু গ্রহণের বেলায় যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করুন। এরূপ না করলে সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা গোমরাহ হওয়া মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। আল্লাহ সকলকে হেফাজত করেন।

পরিশেষে একটা পরামর্শ- যেসব সাধারণ মানুষ নেট থেকে দ্বীন শিখতে চান তারা বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার স্বার্থে অন্তত একটা কাজ অবশ্যই করুন। তা হল- একজন বিচক্ষণ পরহেযগার হক্কানী আলেমকে নিজের দ্বীনী মুরব্বী মেনে নিয়ে তার দিক-নির্দেশনা মোতাবেক দ্বীনী সবকিছু সম্পন্ন করুন। যে কোনো বিতর্কিত বিষয় বা ঝামেলাপূর্ণ বিষয় সামনে এলে কোনটা গ্রহণীয় তার থেকে দিক-নির্দশনা গ্রহণ করুন। তবে এই মুরব্বী নির্বাচনের বিষয়টা সম্পন্ন হওয়া চাই অত্যন্ত যাচাই-বাছাই পূর্বক ও সতর্কতার সঙ্গে। এমন যেন না হয় ভূত তাড়াতে যে সরিষা নিলেন তাতেই ভূত রয়ে গেল। খাঁটি মুরব্বী নির্বাচনের প্রয়োজনে ইস্তেখারাও করে নেয়া যেতে পারে। সেই সাথে হেদায়েত পাওয়া ও হেদায়েতের উপর অবিচল থাকতে পারার জন্য সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করা চাই। যেমন এইসব দুআ করা যেতে পারে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ

www.maktabatulabrar.com

الْوَهَّابُ.

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সব রকম গোমরাহী থেকে রক্ষা করো। আমাদেরকে সচেতনতা দান করো, বিচক্ষণতা দান করো। সিরাতে মুস্তাকীমে অটল থাকার তাওফীক দান করো। আমীন !

وما علينا إلا البلاغ.

ফেসবুক ও ইউটিউব: যেগুলোর তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন খুব বেশি

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

কথা বলার অনেক রকম প্লাটফর্ম রয়েছে। সব প্লাটফর্মেই কথা বলতে কিছু না কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে। বক্তৃতা মঞ্চে বক্তৃতা ভাষণ দিতে কিছু না কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে। ওয়াজ মাহফিলে বয়ান করতে কিছু না কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে। বইপত্র লিখতে, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ নিবন্ধ ফিচার ইত্যাদি লিখতে- সবকিছুর জন্যই কিছু না কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে। শুধু ফেসবুক এমন একটা প্লাটফর্ম যাতে কিছু বলতে বা লিখতে কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে না। যার যা বলতে বা লিখতে মনে চায়, যেভাবে বলতে বা লিখতে মনে চায় অবলীলায় সম্পন্ন করতে পারে। ফেসবুকের ন্যায় টুইটার ইউটিউব প্রভৃতি অনলাইনের সবগুলো প্লাটফর্মেরই এই একই অবস্থা। কোন যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে না বলে এসব প্লাটফর্মে যোগ্য লোকদের সাথে অযোগ্য লোকদেরও সমাবেশ ঘটেছে। বলা যায় বিপুল সমাবেশ ঘটেছে। অফলাইনের অবস্থা এমন নয়। সেখানে অযোগ্যরা যা ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা

www.maktabatulabrar.com

অবলীলায় বলতে পারে না। লেখার মাধ্যমেও তেমন পারে না, কারণ আযোগ্যদের লেখা বইপত্র বাজারে তেমন বিকোয় না। ওয়াজ-বক্তৃতার মাধ্যমেও তেমন পারে না, কারণ একেবারেই যোগ্যতা না থাকলে ওয়াজ-বক্তৃতার আসরে কথা বলার চান্সই জোটে না। পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি অভিমত প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমেও পারে না, কারণ অযোগ্য অখ্যাত লোকের বিবৃতি অভিমত মূল্যায়ন পায় না। পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ নিবন্ধ ইত্যাদি লিখেও পারে না, কারণ সম্পাদকরা অযোগ্য আনাড়িদের প্রবন্ধ নিবন্ধকে পাত্তাই দেয় না। তাই অফলাইনে অযোগ্যদের তেমন ঠাঁই হয় না। অফলাইনে যোগ্যতার বিচার কিছু না কিছু করা হয়েই থাকে। সেখানে কিছু বলে গেলাতে গেলে কম-বেশ যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি অনলাইনের প্লাটফর্মগুলো: সেখানে কোনো রকম যোগ্যতার আবশ্যকতা নেই। যোগ্যতা ছাড়াই সেখানে ঠাঁই করে নেয়া যায়। সেখানে বিচরণ করতে গেলে কারও মুখোমুখিও হতে হয় না যে, আবার কার কাছে কখন যোগ্যতা বা বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় ধরা পড়ে যেতে হয়, কিংবা কখন কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উত্তর দিতে না পেরে বেকুব সাজতে হয়। সেখানে শুধু মোবাইল বা কম্পিউটারে কিছু বাটন টিপে পোস্ট করলেই সারে। কিংবা কিছু ভিডিও করে আপলোড করে দিলেই সারে। বাইরে চেহারা দেখানোর মত সৎ সাহস বা কারও সম্মুখে দু'কথা বলার মত হিম্মত না থাকলেও চলে। নিজের ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থেকেই কিংবা অন্য কোনভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকেই সবকিছু সেরে নেয়া যায়। এজন্যই অনলাইনে অযোগ্য, অগ্রহণযোগ্য লোকের রয়েছে অবাধ বিচরণ। আবার তারা যা-ই বলুক বা লিখুক কিংবা যে ভিডিও-ই আপলোড করুক কিছু লোক বিশেষত তাদের আইডির তথাকথিত বন্ধুরা সেটা লাইক দিয়ে তাকে উৎসাহিতও করে থাকে, শেয়ার করে সেটার প্রসারও ঘটিয়ে থাকে। এভাবে তাদের বিচরণকে আরও গতিশীল ও বিস্তৃত পরিধী বিশিষ্ট করে তোলে।

অনলাইনে যোগ্য, শিক্ষিত, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিবেকবান লোকদের উপস্থিতি নেই তা বলছি না, তবে তাদের পাশিপাশি প্রচুর সংখ্যক এর বিপরীত ধরনের লোকের উপস্থিতিও রয়েছে এটাই বলা উদ্দেশ্য। এ যেন পুরোদস্তুর এক জগাখিচুড়ি সমাবেশ। বার থেকে জানা না থাকলে এই সমাবেশস্থল থেকে কে গ্রহণযোগ্য তা বেছে বের করা অনেক সময় কঠিন

হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে এ অঙ্গনে যাছাই-বাছাই ছাড়া কারও কথা গ্রহণ করলে অগ্রহণযোগ্য লোকের কথাই গ্রহণ হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়ে যায়। তাই সকলের উচিত ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য কি না তা ভালভাবে যাচাই-বাছাই করার পূর্বে এ অঙ্গনের কারও কোন লেখা বা বক্তব্য গ্রহণ না করা, লাইক না দেয়া, অন্যদের তা শেয়ার না করা। মনে রাখতে হবে কোন দ্বীনী বিষয়ই যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণ করা যায় না। তাতে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর কোন বিষয়ে লাইক দেয়াও নিষিদ্ধ, তার প্রচার-প্রসার ঘটানোও নিষিদ্ধ।

যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন অফলাইনেও রয়েছে, তবে অনলাইনে খুব বেশি রয়েছে। কারণ এখানে অগ্রহণযোগ্য লোকের সংখ্যা খুব বেশি, আবার তা ঠাহর করাও কঠিন। তাই এ অঙ্গনে কারও কোন কথা গ্রহণ করার পূর্বে ভরপুর ভেবে নিবেন অগ্রহণযোগ্য কিছু গ্রহণ করে বিভ্রান্ত কিংবা প্রতারিত হচ্ছেন না তো? কোন কিছুতে লাইক দেয়ার পূর্বে ভেবে নিবেন কোন অন্যায় কিছুতে লাইক দিয়ে অন্যায় সমর্থনকারীদের কাতারে শামিল হয়ে যাচ্ছেন না তো? কোন কিছু শেয়ার করার পূর্বে ভেবে নিবেন অন্যায় কিছু প্রচার করে পাপী হয়ে পড়ছেন না তো?

অনলাইনে যে প্রচুর সংখ্যক অযোগ্য অগ্রহণযোগ্য লোকের উপস্থিতি রয়েছে তা বুঝে আসে অনেকের বক্তব্যের বিষয়বস্তু, লেখার ভাষা, শব্দ চয়ন, উপস্থাপন, যুক্তি-তর্কের ধরন প্রভৃতি অনেক কিছু দেখে। শব্দাবলির বানানের কথা না হয় বাদই দিলাম। সেটা দেখলে তো অনেক ক্ষেত্রে ছেলেখেলা দেখার মত হাসির উদ্রেক করে। বস্তুত বক্তার শব্দ চয়ন, যুক্তি-তর্কের ধরন, বিষয়বস্তুর চয়ন প্রভৃতি থেকে তার যোগ্যতাসহ মন মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-বিবেচনা, অভিরুচি অনেক কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সারকথা, ফেসবুক টুইটার ইউটিউব প্রভৃতি যোগ্য-অযোগ্য, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য সব ধরনের লোকের সমাবেশ হওয়ায় এখানে কারও পরিবেশিত তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের অধিকতর সচেতন থাকার প্রয়োজন। আমরা যেন গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে না যাই। বিভ্রান্ত না হই। প্রতারিত না হই।

www.maktabatulabrar.com

ইউটিউবে ইসলামী ভিডিও: কত কিছুই ভিত্তিহীন

ইউটিউবে কত প্রকারের ভিডিও আপলোড করা হয় তার গণনা সাধ্যের বার। নাচ-গান, নাটক-সিনেমা, রং-তামাশা ইত্যাদি পাপের রকমারি ভিডিও যেমন আছে, তেমনি আছে ওয়াজ-নসীহত, দ্বীনী আলোচনা প্রভৃতি সুশিক্ষামূলক নেকির বহু রকমের ভিডিও। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার, রান্না-রান্না, চিকিৎসা, কারিগরী শিল্প প্রভৃতি আরও কত রকমের ভিডিও। এসব ভিডিওর মধ্যে সব ভিডিওই যে বস্তুনিষ্ঠ তা কিন্তু নয়, বরং প্রচুর ভিডিও এমন আছে যা ভিত্তিহীন, কৃত্রিম। যেগুলো এডোবি প্রিমিয়ার প্রো, এডোবি আফটার অ্যাফেক্ট প্রভৃতি সফটওয়ারের সাহায্যে অন্য কোন ভিডিও এডিট করে বা সম্পূর্ণ নতুন করে কৃত্রিমভাবে বানানো হয়। বিশেষত চিকিৎসামূলক ভিডিওগুলোতে যেসব হেলথ টিপস দেখানো হয় তার বহু কিছুই আছে ভুয়া কিংবা যা মেডিকেল সাইন্সে স্বীকৃত নয়। আবিষ্কারমূলক ভিডিওর মধ্যেও প্রচুর এমন আছে যা ঘরে বসে উপরোক্ত সফটওয়ারগুলোর সাহায্যে বানানো কৃত্রিম ও ভুয়া, আদৌ সেগুলো বিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়। সেগুলোর বিবরণ প্রদান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য শুধু এটা বর্ণনা করা যে, ইসলাম ও

ধর্মের আদলে যেসব ভিডিও ছাড়া হয় তার মধ্যেও প্রচুর ভিত্তিহীন ও কৃত্রিম ভিডিও রয়েছে। তাই ইউটিউবে (তদ্রুপ অনলাইনের অন্য কোন সোশ্যাল মিডিয়ায়) প্রদর্শিত ভিডিওতে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করে নিতে হবে এবং ধর্মীয় আবেগে সেটা অন্যকে শেয়ার করা আরম্ভ করে দিতে হবে এমন নয়। তাতে ভুয়া জিনিসে বিশ্বাস স্থাপনের বোকামি হবে, ভুয়া জিনিস প্রচারের দায় বর্তাবে।

ইসলাম ও ধর্মের আদলে যেসব ভিডিও ছাড়া হয় তার মধ্যে যে ভিত্তিহীন ও কৃত্রিম ভিডিও রয়েছে তার উদাহরণ প্রচুর। কয়েকটা উদাহরণ পেশ করছি।

১ বায়তুল্লাহ শরীফে ফেরেশতা অবতরণের ভিডিও। রওযায়ে আতহারে ফেরেশতাদের সালাম করার ভিডিও ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এসব ভিডিওতে দৃশ্য কারা কারা দেখেছে, প্রত্যক্ষদর্শী কারা তার কোন ডকুমেন্টারি বর্ণনা থাকে না, কিংবা নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রের উল্লেখ থাকে না। এ ধরনের ভিডিও যে ভুয়া তা স্পষ্ট এ কারণে যে, এ রকম ঘটনা যদি বাস্তবেই ঘটত এবং মানুষ তা দেখে ভিডিও করবে এমন প্রকাশ্যে ঘটত, তাহলে তা সারা বিশ্ব মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচার হত, বহু সূত্রে তা বর্ণিত হতো।

২ কবর থেকে বিভিন্ন মানুষের জীবিত হয়ে উঠে আসা এবং কথা বলার ভিডিও, দুধের শিশুর কথা বলার ভিডিও ইত্যাদি। এসব ভিডিও যে ভুয়া তার প্রমাণ ঐই যা পূর্বের এক নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩ কেউ কেউ এক ধরনের ভিডিও দিয়ে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর কেন্দ্র প্রমাণ করতে চান। নেটে এ জাতীয় প্রচুর ভিডিও দেখা যায়। এসব ভিডিওতে বিশেষ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে যা দেখানো হয় তাকে মোটামুটি এভাবে বর্ণনা করা যায় যেন পৃথিবীর গ্লোবকে ক্যামেরার সামনে রাখা হয়। গ্লোবের যেখানে বাইতুল্লাহ সেই বরাবর স্থানকে ক্যামেরার কেন্দ্র বরাবর রেখে ক্রমান্বয়ে গ্লোবকে বড় করা হয়। আর এক পর্যায়ে গিয়ে বাইতুল্লাহই চোখের সামনে বড় হয়ে শেষ হয়, আর মনে হয় এ-ই তো বাইতুল্লাহই পৃথিবীর মধ্যখান। এই ভিডিও-র জবাব হচ্ছে একটু চিন্তা করলেই যে কেউ বুঝবেন এই ভিডিও একটা ছেলেখেলা! এভাবে সলিমুদ্দীন কলিমুদ্দীনের গৃহ কিংবা কোন ফকির

www.maktabatulabrar.com

সন্ন্যাসীর আশ্রমকেও পৃথিবীর কেন্দ্র দেখানো সম্ভব। এখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। তা হল এই ভিডিও প্রদর্শনের সময় বলা হয়, দেখুন বিজ্ঞান বলছে, কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র। কিন্তু এখানে বিজ্ঞানের কী রয়েছে তা তো বোধগম্য নয়। বিজ্ঞান শব্দ ব্যবহার করলেই কি তা বিজ্ঞানসম্মত হয়ে যায়? কোন্ বৈজ্ঞানিক কী বলেছে তা তো তারা মোটেও উল্লেখ করেন না। আবার এই ভিডিও প্রদর্শনের সময় কখনও কখনও গোল্ডেন রেশিওর কথাও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু গোল্ডেন রেশিও আর কেন্দ্র কি এক জিনিস? কী দেখানো হয় আর কী দাবি করা হয়– এ তো সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলানো। উল্লেখ্য, গোল্ডেন রেশিও এবং গোল্ডেন রেশিওর ভিত্তিকে কা'বা শরীফকে প্রথিবীর কেন্দ্র দেখানোর যে প্রচেষ্টা সে সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য নেটে আমার লেখা 'গোল্ডেন রেশিও এবং কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি কি না এ প্রসঙ্গ' দেখে নেয়া যেতে পারে।

৪ বর্তমানে নেটে জূদী পর্বতের পাশে মাটিতে দেবে থাকা একটি বড় আকারের নৌকার ছবি প্রদর্শন করে বলা হয় এটি নূহ (আ.)-এর নৌকা এবং বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কেউই পূর্ণাঙ্গ নৌকার এমন চিত্র বা অবস্থা আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূগোলবিদ, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কেউ কেউ স্যাটেলাইটের মাধ্যমেও দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউই স্পষ্টত এমন নৌকা দেখেছেন তা বলেননি। কেউ কেউ মাটির তলে নৌকার ভগ্নাবশেষ বা ভাংগা ভাংগা কিছু কাঠের টুকরো থাকার বা পাওয়ার দাবি করলেও এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সম্ভাব্য নূহ (আ.)-এর যুগের হওয়ার দাবি করলেও অন্য অনেকে তা অস্বীকার করেছেন। বস্তুত নেটে প্রদর্শিত নূহ (আ.)-এর নৌকার পূর্ণাঙ্গ ছবি কাল্পনিক এবং কৃত্রিমভাবে বানানো ছবি।

এ রকম আরও বহু ভিত্তিহীন ভিডিও নেটের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যায়। বস্তুত এগুলো মানুষের সস্তা ধর্মীয় আবেগ কুড়ানোর চেষ্টা বৈ আর কিছু বলা যায় না। আর ধর্মীয় এই সস্তা আবেগ থেকেই এ জাতীয় কথা ও ভিডিও-র বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই-বাছাই ছাড়াই একজন থেকে আরেকজন অবলীলায় প্রচার করে যাচ্ছে। আর সহজ সরল বহু মানুষ তা দ্বারা আপ্লুত হচ্ছে। এভাবে আপ্লুত ও ভক্ত

হওয়ার পর ভবিষ্যতে যদি কোনদিন সত্যিকারভাবেই শক্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এর ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয় তাহলে তখন কী হবে? তখন কি একথা প্রমাণিত হবে না যে, মুসলমানরা ভুয়া আবেগে পরিচালিত হয়। ইসলামের শত্রুরা এমনতর উদ্দেশ্যেও অনেক কিছু প্রচার করে থাকে। তাছাড়া ভুয়া ভিডিও প্রচার ও তাতে বিশ্বাসের প্রবণতাকে অমুসলিমরা হাস্যকর অন্ধবিশ্বাস হিসেবে দেখিয়ে অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের বিরোধী করে তোলে। মুসলমানদের এ বিষয়গুলো মাথায় রেখেই সব ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া উচিত। যাচাই-বাছাই ছাড়া অবলীলায় এগুলো বিশ্বাস না করা উচিত। অন্যকে শেয়ার না করা উচিত।

www.maktabatulabrar.com

ফেসবুকে নামডাক: আহামরি কিছু নয়

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

নামডাক অনেক কারণে ছড়াতে পারে। ভাল কিছু করার সুবাদেও ছড়াতে পারে, মন্দ কিছু করার কারণেও ছড়াতে পারে। ভাল কিছু করেও সাড়া জাগানো যায়, মন্দ কিছু করলেও অনেক সময় সাড়া জাগে। এখানে ভাল কিছু করার সুবাদে নামডাক ছড়ানো বা ভাল সাড়া জাগানো প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

মন্দ ছড়ানোর সূত্র যেমন অনেক, ভাল নামডাক ছড়ানোর সূত্রও আছে তেমনি বহুবিধ। ভাল নামডাক লোকমুখেও ছড়াতে পারে, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে, বইপত্রে বিবরণ আসার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে, রেডিও-টেলিভিশনে সংবাদে এসে যাওয়ার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। আরও কতভাবে ছড়াতে পারে। ইদানিং কোন কিছু ছড়ানোর নামকরা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি অনলাইন মিডিয়াগুলো। এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু এসে গেলে সেটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। উপযুক্ত কারণ থাকুক বা না থাকুক ভাইরালও হয়ে যেতে পারে। তা সেটা সুনামের বিষয় হোক বা দুর্নামের বিষয়।

এখন রয়ে গেল নামডাক কোন মাধ্যমে ছড়ালে তা গ্রহণযোগ্য আর কোন মাধ্যমে ছড়ালে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা নির্ভর করে যে তথ্যের ভিত্তিতে নামডাক ছড়িয়েছে সে তথ্য কতটা ফিল্টারিং তথা বিশোধন করা হয়েছে তার উপর। তথ্য যত বেশি ফিল্টারিং হবে তথা যত বেশি বিশোধিত হবে ততবেশি গ্রহণযোগ্য হবে। একজন নির্ভরযোগ্য লেখক যখন যাচাই-বাছাই ও তাহকীক পূর্বক কোন তথ্য তার পুস্তকে পরিবেশন করেন, সেটা গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা নির্ভরযোগ্য লেখকের যাচাই-বাছাই ও তাহকীক হচ্ছে ফিল্টারিং। কোন নিরপেক্ষ নির্ভরযোগ্য সাংবাদিক যখন নির্ভরযোগ্য সূত্রে কিংবা উপযুক্ত যাচাই-বাছাই পূর্বক পত্র-পত্রিকায় বা রেডিও টেলিভিশনে কোন সংবাদ পরিবেশন করেন, তখন সেটা গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা নির্ভরযোগ্য সূত্র বা গ্রহণযোগ্য লোকের যাচাই-বাছাই-এর মাধ্যমে তথ্যের ফিল্টারিং হয়েছে। এবার চিন্তা করুন যেহেতু ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতিতে যার যা ইচ্ছা পোস্ট করার অবাধ অবকাশ রয়েছে এবং সেই অবকাশের সুবাদে যার যা ইচ্ছা অবাধে পোস্ট করেও থাকে, আবার ফেসবুক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও তথ্য ফিল্টারিংয়ের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তাই যদি এগুলোতে কিছু পোস্ট করা হয় আর তা কে পোস্ট করল তার সম্বন্ধে যদি কিছুই জানা না থাকে, কিংবা শুধু নাম পরিচয় জানা থাকলেও তার নির্ভরযোগ্যতা যদি প্রমাণিত না থাকে, তাহলে তার পোস্টকৃত বিষয়গুলোর ফিল্টারিং হয়েছে বলে ধরে নেয়ার কোন ভিত্তি নেই। অতএব কেবল ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতিতে পোস্ট করা তথ্যের ভিত্তিতে কারও নামডাক ছড়িয়ে পড়াই তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ নয়। তার গ্রহণযোগ্যতার জন্য ভিন্ন উপাত্ত চাই। সত্য বলতে কি ফেসবুক ইউটিউবের মাধ্যমে ভুয়া নামডাকও ছড়িয়ে থাকে। এগুলোতে নামডাক ছড়ানোর পেছনে অনেক রকম কেরামতিও থাকে, অনেক রকম কৃত্রিম কৌশলও অবলম্বন করা হয়ে থাকে। তাই ফেসবুকে নামডাক আহামরি কিছু নয়। প্রকৃত বিষয়ের সন্ধানে থাকা চাই।

ফেসবুক ইউটিউবের মাধ্যমে নামডাক ছড়ানোর পেছনে যে অনেক রকম কেরামতিও থাকে উদাহরণ স্বরূপ তেমন কয়েকটা কেরামতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

কেরামতি এক: ফেসবুকে ইচ্ছা করলে একজন লোকই বিভিন্ন নাম পরিচয়ে যত ইচ্ছা আইডি খুলতে পারে। আবার প্রত্যেকটা আইডিতে পাঁচ

www.maktabatulabrar.com

হাজার করে বন্ধু বানাতে পারে। এভাবে একজন লোকই বহুজন হয়ে কোন একটা বিষয়কে যত ইচ্ছা লাইক দিয়ে শেয়ার করে আবার বন্ধুদের দ্বারা তা করিয়ে তার নামডাক ছড়িয়ে দিতে পারে। এভাবে একজন লোকই নামডাক ছড়ানোর জন্য যথেষ্ঠ। সমমনা একাধিক লোক বা সমমনা একাধিক গ্রুপ হলে তো কথাই নেই। এটা হল নামডাক ছড়ানোর জন্য গৃহীত এক ধরনের কৃত্রিম কৌশল। কৃত্রিম কৌশল আরও বহু রকমের হতে পারে। ফেসবুক বোদ্ধাদের তা অজানা নয়।

কেরামতি দুই: নির্ভরযোগ্য সূত্রে শুনেছি ঢাকার গুলিস্তানে একটা স্টুডিও আছে। স্টুডিওর ভেতর দেয়ালে ওয়াজ মাহফিলের দৃশ্য আঁকা আছে। তার সামনে একজন দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে বয়ান করবে আর ভিডিও হতে থাকবে। ভিডিওতে বক্তার সামনে প্রচুর শ্রোতার সমাগমের দৃশ্যও যোগ করে দেয়া হবে। মাঝেমধ্যে শ্রোতারা বলছে ঠি - - - ক! কখনও শ্লোগান দিচ্ছে নারায়ে তাকবীর, মারহাবা- ইত্যাদি সাউন্ডও ভিডিওতে যোগ করে দেয়া হবে। হয়ে গেল ওয়াজের একটা আকর্ষণীয় ভিডিও। এরপর নতুন করে একাধিক ভিডিও আগের মত বানানো যায় বা আগেরটার মধ্যেই এডিট করে একাধিক ভিডিও বানানো যায়। যেভাবেই হোক এরকম একাধিক ভিডিও ফেসবুক ইউটিউবে ছেড়ে দেয়া হয়। অনেক লাইক পড়ে, শেয়ার হয়। ফেসবুকে একজনের পাঁচ হাজার বন্ধু থাকতে পারে। সেই বন্ধুদের অনেকে সেসব ভিডিও যার যার আইডিতে বা পেজে পোস্ট করে। বিভিন্ন গ্রুপেও পোস্ট করা হয়। বিশেষভাবে যেসব গ্রুপে পোস্ট করতে এডমিনদের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা রাখা হয় না। এভাবে এক সময় ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি অনলাইন মিডিয়াতে সেই তথাকথিত বক্তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা ভাবতে শুরু করে অমুক হুজুরের খুব নামডাক, তার ওয়াজ বয়ান ফেসবুকে প্রচুর সাড়া জাগিয়েছে। ব্যস বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে তার দাওয়াত আসতে শুরু করে। তবে এরকম ঘটনা যে খুব বেশি নয় তা তো স্পষ্ট। ঢালাওভাবে সকলকে এক পাল্লায় মাপা ঠিক নয়, বিনা দলিলে নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে দোষারোপ করা ঠিক নয়- এ বিষয়গুলোও মনে রাখা চাই, আবার সচেতনতাও থাকা চাই।

কেরামতি তিন: ফেসবুক ইউটিউবে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের ভিডিও দেখা যায়। আমি ইসলামী প্রশ্নোত্তর বিষয়ক ভিডিওর কথাই বোঝাতে

চাচ্ছি। ভিডিওগুলোতে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে কিংবা বিভিন্ন প্রশ্ন লেখা চির কুট পড়া হয় আর একজন গড়গড় করে সেগুলোর উত্তর দিয়ে যেতে থাকেন। দেখলে শুনলে মনে হয় উত্তরদাতা অনেক জ্ঞানী, অনেক উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন, অনেক হাজির জওয়াব। কিন্তু এখানেও ব্যাপারটার ভিন্ন রকম রহস্য থাকতে পারে। আসল কেরামতি এরকম থাকতে পারে যে, সব প্রশ্নকারীই উত্তরদাতার সাজানো লোক, যারা সাজানো প্রশ্নগুলোই মঞ্চস্থ করে কিংবা সব প্রশ্নই উত্তরদাতার নিজের বানানো বা নিজের নির্বাচিত আর এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আগেই হোমওয়ার্ক করে নেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইদানিং এডোবি প্রিমিয়ার প্রো, এডোবি আফটার অ্যাফেক্ট প্রভৃতি সফটওয়ারের মাধ্যমে একটা ভিডিও এডিট করে কিংবা শুরু থেকেই নতুন করে এমন ভিডিও তৈরি করা যায় যাতে দেখানো হবে নতুন নতুন লোক প্রশ্ন করছে, নতুন নতুন প্রশ্নোত্তর মজলিস।

এসব প্রশ্নোত্তর মজলিসে আগে থেকেই যে হোমওয়ার্ক করে বা রিহার্সাল (Rehearsal) দিয়ে আসা হতে পারে তার একটা বড় লক্ষণ হল উত্তরদাতা কোনো প্রশ্নের উত্তরেই আঁটকায় না, তা প্রশ্ন যত জটিল কিংবা আন-কমনই হোক না কেন। আবার জটিল জটিল ও আন-কমন আন-কমন প্রশ্ন হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর উত্তর গড়গড় করে দিয়ে যাওয়া হয় এবং বক্তব্যও হয় অত্যন্ত সুবিন্যস্ত, পরিপাটি। এগুলো আগ থেকে রিহার্সাল দিয়ে আসা ছাড়া হতে পারে না- এটাই স্বাভাবিক বাস্তবতা। আবার তথ্যের বরাত দিতে গিয়ে পাঁচ দশটি গ্রন্থের নাম বলা, তা আবার আয়াত নম্বর, হাদীছ নম্বর, শ্লোক নম্বর, অধ্যায়ের নাম, পরিচ্ছেদের নাম, পৃষ্ঠা নম্বর ও লাইন নম্বরসহ, এবং প্রতিপক্ষের দলীলাদির বিষয়গুলোও অনুরূপভাবে গড়গড় করে বলে যাওয়া- এগুলো পূর্ব রিহার্সাল ছাড়া সম্ভব নয়- এটাই স্বাভাবিক বাস্তবতা। কিন্তু শ্রোতা দর্শকরা স্থুল দৃষ্টিতে এসব ভিডিও দেখে শুনে উত্তরদাতাকে নিশ্চতভাবেই মহা জ্ঞানী ভেবে বসে, লাইক দেয়, শেয়ার করে। এভাবে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। বহু লোক তাকে নিজের যিন্দেগির জন্য গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। আমি একজন লোক সম্পর্কে জানতাম যিনি এক টেলিভিশন চ্যানেলের ইসলামী আলোচক ছিলেন। তার আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকত। প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য তার বেশ খ্যাতিও ছড়িয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম

www.maktabatulabrar.com

আলোচনার পূর্বে তিনি কার থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর শিখে কীভাবে রিহার্সাল দিয়ে যেতেন। যাহোক এমনতর উদাহরণ আরও বহু দেয়া যায়। সারকথা হল- শুধু ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি অনলাইনে নামডাক হওয়ার পেছনে কৃত্রিমতাও থাকতে পারে। (থাকেই তা বলছি না।) তাই শুধু এসব অনলাইন মিডিয়াতে কারো নামডাক দেখেই তাকে সেভাবে গ্রহণ করতে হলে বা তার ফলোয়ার হতে চাইলে বা তাকে দ্বীনী মুরব্বী হিসেবে গ্রহণ করতে হলে সতর্কতা হল তার সম্বন্ধে অধিকতর যাচাই-বাছাই করে নেয়া। তবে অনলাইনের বাইরে ভিন্নভাবে যদি তার প্রকৃত জ্ঞানী-গুণী হওয়ার কথা জানা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। মনে রাখতে হবে কাউকে নিজের যিন্দেগির জন্য দ্বীনী গাইড হিসেবে তথা দ্বীনী মুরব্বী হিসেবে গ্রহণ করা একটা অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা নিষ্পন্ন হওয়া চাই যথেষ্ঠ সাবধানতার সাথে, যথেষ্ঠ যাচাই-বাছাই পূর্বক। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আমার আর একটি লেখায়। সে লেখাটিও পোস্ট করা হয়েছে। তার শিরোনাম: কারও ফলোয়ার হতে চাইলে তার কী দেখে নেয়া চাই?

আল্লাহ্ আমাদেরকে দ্বীনী বিষয়ে সচেতন সাবধানী হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!

وما علينا إلا البلاغ.

ফেসবুকে কিছু ভাইরাল হওয়া সত্য হওয়ার প্রমাণ নয়

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد: فقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم.

ভাইরাল (Viral) শব্দটির উৎপত্তি 'ভাইরাস'(Virus) শব্দ থেকে। ভাইরাস (Virus) শব্দটিকে বিশেষ্য (Noun) ধরে এটির গুণবাচক শব্দ বা বিশেষণ (Adjective) হিসেবে ব্যবহার করা হয় ভাইরাল (Viral)। ভাইরাস শব্দটি যেহেতু দূষণ, জীবাণু বা বিষাক্ত এ ধরনের অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ভাইরাস যেহেতু খুব দ্রুতই ভয়ংকরভাবে ছড়িয়ে পড়ে বা বিস্তার লাভ করে, তাই হঠাৎ সমাজে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া কোনো বিষয় বা ইস্যুকেই 'ভাইরাল' বলে ব্যক্ত করা হয়।

ইদানিং ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি অনলাইন মিডিয়াগুলো কোন কিছু ছড়ানোর নামকরা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন সংবাদ এসে গেলে সেটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি উপযুক্ত কারণ থাকুক বা না থাকুক ভাইরাল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছু মানুষ কীভাবে সেটা ভাইরাল হল, আদৌ তার বাস্তবতা

www.maktabatulabrar.com

বা সত্যতা আছে কি না- তা যাচাই-বাছাই না করেই শুধু ভাইরাল হয়েছে- এতটুকুর ভিত্তিতেই তা বিশ্বাস করে নেয় এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করে দেয়- অন্যকে তা শেয়ার করতে শুরু করে, খারাপ কিছু হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কুধারণা পোষণ করতে শুরু করে, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আবার ভাল কিছু হলে তার ফলোয়ার পর্যন্ত হয়ে যায়, তার ভক্ত মুরীদ পর্যন্ত হয়ে বসে ইত্যাদি। অথচ এসব মিডিয়ায় কিছু এসে যাওয়া এমনকি ভাইরাল হয়ে যাওয়াও সেটা সত্য হওয়ার প্রমাণ নয়। কেননা এসব মিডিয়ায় ভুয়া ও ভিত্তিহীন অনেক কিছু পোস্ট হয়ে থাকে এবং হুজুগে বা কৃত্রিম কৌশলে তা ভাইরালও হয়ে যায়। পরে প্রমাণিত হয় মূল পোস্টটাই ছিল ভুয়া। যেমন কেউ কারও ব্যাপারে পরকিয়া করার একটা পোস্ট দিল, বা কেউ আরেকজনের বউ নিয়ে ভেগেছে বলে পোস্ট দিল, বা কেউ অত নম্বর বিয়ে করেছে বলে পোস্ট দিল। আর এসব পোস্ট দিতে না দিতেই হুহু করে বাতাসের মত ছড়িয়ে পড়ল। একজন থেকে আরেকজন মজা নিয়ে শেয়ার করতে থাকল, ভাইরাল হয়ে গেল। অথচ পরে প্রমাণিত হল মূল পোস্টটাই ছিল ভুয়া।

ফেসবুকে অনেক তথ্য কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই নিছক হুজুগের ঠেলায় ভাইরাল হয়ে থাকে। অনেক তথ্য কৃত্রিমভাবেও ভাইরাল করা যায়। কেননা ফেসবুকে ইচ্ছা করলে একজন লোকই বিভিন্ন নাম পরিচয়ে যত ইচ্ছা আইডি খুলতে পারে। আবার প্রত্যেকটা আইডিতে পাঁচ হাজার করে ফ্রেন্ড বানাতে পারে। এভাবে একজন লোকই বহুজন হয়ে কোন একটা বিষয়কে যত ইচ্ছা লাইক দিয়ে শেয়ার করে আবার ফ্রেন্ডদের দ্বারা তা করিয়ে নিয়ে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে, এভাবে ভিত্তিহীন বিষয়ও ভাইরাল হয়ে যেতে পারে।

ফেসবুকে ভুয়া কিছুরও যে নামডাক হতে পারে, ভিত্তিহীন বিষয়ও যে ভাইরাল হতে পারে- এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমি একটি ব্লগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, যার শিরোনাম 'ফেসবুকে নামডাক: আহামরি কিছু নয়'। কেউ চাইলে আমার আইডি কিংবা মাকতাবাতুল আবরারের আইডি ও ওয়েবসাইটে দেখে নিতে পারবেন।

সারকথা, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি অনলাইন মিডিয়াগুলোতে কিছু ভাইরাল হতে দেখলেই তার বাস্তবতা আছে- এরূপ বিশ্বাস করা এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করে দেয়া-

অন্যকে তা শেয়ার করতে শুরু করা, খারাপ কিছু হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কুধারণা পোষণ করতে শুরু করা, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, আবার ভাল কিছু হলে তার ফলোয়ার পর্যন্ত হয়ে যাওয়া, তার ভক্ত মুরীদ পর্যন্ত হয়ে বসা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা চাই, যতক্ষণ না তার সত্যতা যাচাই করে নেয়া হয়। কেননা এগুলোতে কিছু ভাইরাল হওয়া আদৌ সত্য হওয়ার প্রমাণ নয়। আর কোন বিষয় নিশ্চিত সত্য বলে জানার আগ পর্যন্ত তার পিছে পড়া নিষেধ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

ولا تقف ما ليس لك به علم.

অর্থাৎ, যে ব্যাপারে তোমার নিশ্চিত জানা নেই (বা যথাযথ জ্ঞান নেই) তার পেছনে পড়ো না। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬)

আল্লাহ্ আমাদের সচেতনতা দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

www.maktabatulabrar.com

গ্রন্থ পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি।

ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি সকলের জন্য এক নয়। ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যে তাতে পার্থক্য থাকবে। একজন সাধারণ পাঠক সাধারণ জ্ঞান অর্জন করার জন্য যে নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে গ্রন্থ পাঠ করবেন একজন আলেমের পাঠ তা থেকে ব্যতিক্রম হবে বৈ কি? একজন ছাত্রের পাঠও সাধারণ মানুষ ও আলেমের পাঠ থেকে ব্যতিক্রম হবে।

ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যে গ্রন্থ পাঠের নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতিকে আমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা পেশ করছি। যথা: (১) সাধারণ মানুষের জন্য ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি (২) ছাত্রদের জন্য ক্লাসিক্যাল গ্রন্থাদি পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি (৩) আলেমদের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থাদি পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি।

সাধারণ মানুষের জন্য ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি

সাধারণ মানুষ বলতে যারা আলেম নন- এমন লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে। এরূপ লোক ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি মেনে চলবেন।

১. সাধারণ মানুষ ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করবেন শুধু তথ্য জানার জন্য, মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান বোঝার জন্য। মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানের দলীল-প্রমাণ জানার পেছনে পড়া তাদের উচিত নয়। যদি গ্রন্থে মোটা ধরনের কোন দলীলের উল্লেখ থাকে আর তা সহজে বুঝে আসে তাহলে ততটুকু জেনে রাখা ঠিক আছে। কিন্তু যে বিষয়ের দলীল উল্লেখ নেই কিংবা যে দলীল সুক্ষ্ম বা জটিল তার পেছনে পড়া তাদের জন্য মোটেই ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে একেতো মাসায়েলের দলীল জানা তাদের জন্য আবশ্যক নয়। আবার সুক্ষ্ম ও জটিল দলীল বোঝার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতাও তাদের নেই। ফলে সে জাতীয় দলীল বুঝতে গিয়ে তারা বিভ্রান্তির শিকারও হতে পারেন। তাই তাদের পক্ষে সাধারণ দলীলের পেছনে পড়া হচ্ছে একটা অনাবশ্যক কাজের পেছনে পড়া, আর সুক্ষ্ম ও জটিল দলীল বুঝার পশ্চাতে পড়া হচ্ছে একটা অনাবশ্যক কাজের পেছনে পড়ার সাথে সাথে একটা আশংকাজনক পথে পা বাড়ানো। আশা করি এ বক্তব্যে সাধারণ মানুষ মনক্ষুন্ন হবেন না এই চিন্তা করে যে, তাদেরকে না-বুঝ ঠাওরানো হল। আসলে সব ব্যাপারে বুঝমান তো কেউই নয়। যে আলেমগণ কুরআন-হাদীছের ব্যাপারে বুঝমান তারাও তো আরও অনেক শাস্ত্র রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে না-বুঝ থাকতে পারেন। এর বিপরীত সাধারণ মানুষ কুরআন-হাদীছ শাস্ত্রে কিছু না-বুঝ হলেও অন্য অনেক এমন শাস্ত্র রয়েছে যেগুলোতে তারা আলেমদের চেয়ে বেশি বুঝমান থাকতে পারেন। বস্তুত একজন এক বিষয়ে বুঝমান হলেও অন্য অনেক বিষয়ে না-বুঝ থাকতে পারে- এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই আলেম নন- এমন কোন লোককে ধর্মীয় শাস্ত্রে না-বুঝ বলা হলে তাতে তার মনক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু নেই।

২. সাধারণ মানুষ কোন দ্বীনী বিষয় পাঠ করার সময় কিছু বুঝে না আসলে সে ব্যাপারে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের স্মরণাপন্ন হবেন, তাদের থেকে বিষয়টা ভাল করে বুঝে নিবেন। নিজের খেয়াল-খুশিমত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। বিশেষত কোন আকীদগত বিষয় হলে কিংবা কোন জটিল বা তাত্ত্বিক বিষয় হলে আর সে ক্ষেত্রে নিজের খেয়াল-খুশিমত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তা মারাত্মক বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। মনে রাখতে হবে কোন শাস্ত্রেরই সব বিষয় নিজে নিজে ভাল করে বুঝা যায়

www.maktabatulabrar.com

না, কিছু বিষয় এমন থাকেই যে ব্যাপারে উস্তাদের সহযোগিতা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে।

৩. সাধারণ মানুষ কোন গ্রন্থ পাঠ করতে গিয়ে কোন মাসআলা নিজেদের মাযহাব বিরোধী পেলে সেটা বর্জন করবেন, অর্থাৎ সে অনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত থাকবেন। আমল করবেন নিজেদের মাযহাব অনুসারে। নিজেদের মাযহাবের বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে বা প্রয়োজনীয় কিছু বুঝার থাকলে সে ব্যাপারে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের স্মরণাপন্ন হবেন, তাদের থেকে বিষয়টা ভাল করে বুঝে নিবেন। মনে রাখতে হবে চার মাযহাবের সবটিই হক, তবে সব ব্যাপারে আমল এক মাযহাব অনুসারেই হতে হবে, তা সে মাযহাব যেটিই হোক। এক এক ব্যাপারে এক এক মাযহাবের অনুসরণ কোন আলেমের মতেই সহীহ নয়।

ছাত্রদের জন্য ক্লাসিক্যাল গ্রন্থাদি পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি

এখানে ছাত্র বলতে আমি বিশেষভাবে মাদরাসার ছাত্র তথা তালিবে ইলমদের বোঝাতে চাচ্ছি। এখানকার আলোচনা মূলত তাদেরকে লক্ষ্য করেই। (যদিও স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও আলোচনা থেকে মৌলিক নির্দেশনা লাভ করতে পারবে।) তালিবে ইলমরা যে ক্লাসিক্যাল গ্রন্থাদি (দরসী কিতাবাদি) পাঠ করে সেগুলোর পাঠ-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে তাদের যোগ্য আলেম হওয়া না হওয়ার বিষয়টা। বস্তুত যোগ্য আলেম হওয়ার জন্য তাদেরকে দরসী কিতাবাদি যে নিয়ম-পদ্ধতি মেনে পাঠ করা চাই তা হল-

১. দরসী কিতাবাদি যেহেতু ইলমের হাতিয়ার বা উপকরণ স্বরূপ, দরসী কিতাবাদি থেকে অর্জিত বিদ্যা দিয়েই তাদেরকে অন্য কিতাবাদি বুঝতে হবে, দরসী কিতাবাদিই অন্যান্য কিতাব বুঝার যোগ্যতা তৈরি করবে, দরসী কিতাবাদি বুঝাই হল অন্য কিতাবাদি বুঝার বুনিয়াদ বা ভিত্তি, তাই দরসী কিতাবাদি বুঝার ক্ষেত্রে কোনোরূপ অস্পষ্টতা থাকলে চলবে না। কেউ যোগ্য আলেম হতে চাইলে অবশ্যই তাকে এই প্রতীজ্ঞা নিয়ে চলতে হবে যে, সে কোনো সবক (পাঠ) অস্পষ্ট রেখে বা ঝাপসা রেখে সামনে অগ্রসর হবে না। কোন সবক যতক্ষণ পূর্ণ স্পষ্ট না হবে ততক্ষণ তার পেছনে মেহনত চালিয়ে যেতে থাকবে। তাদেরকে মনে রাখতে

হবে ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে ইনশিরাহ-এর নাম তথা পরিষ্কারভাবে জানার নাম। অতএব যতক্ষণ কোন বিষয় পরিষ্কারভাবে জানা না হল, অস্পষ্টতা রয়ে গেল, ততক্ষণ সেটা ইলম নয়। বরং এরূপ অস্পষ্টতা এক ধরনের জাহালত বা অজ্ঞতা। আর গোড়ায় অজ্ঞতা রেখে আগায় গিয়ে বিজ্ঞতা লাভের আশা করা যায় না।

২. মুতালা বা অধ্যয়ন হতে হবে পূর্ণ ফিকিরের সাথে। যোগ্য আলেম হওয়ার জন্য, গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেম হওয়ার জন্য মুতালা হওয়া চাই ফিকিরের সাথে। বাক্যে বাক্যে নয়, শব্দে শব্দে নয়, হরফে হরফে ফিকির করে মুতালা করা চাই। ভাসাভাসা মুতালা দ্বারা ইলমে গভীরতা আসে না। গভীরতা আসে ফিকিরের সাথে মুতালা দ্বারা। কীভাবে ফিকিরের সাথে মুতালা করতে হয় তার একটি ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি দেওবন্দ মাদরাসার প্রখ্যাত উস্তাদ ইমামুল মা'কূলাত হযরত মাওলানা ইবরাহীম বলইয়াবী রহ.-এর। তিনি হারিকেন নয়, লম্প নয়, মোমবাতি নয়, বরং তিনি মুতালা করতেন দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে। একটা কাঠি জ্বালিয়ে যতক্ষণ তা জ্বলত কোন কিতাবের ইবারত পড়তেন। কাঠিটি নিভে গেলে শুয়ে পড়তেন আর চিন্তা করতে থাকতেন এই ইবারত দ্বারা মুসান্নিফের কী উদ্দশ্য? এই উদ্দেশ্য বোঝাতে গিয়ে অমুক অমুক শব্দও ব্যবহার করা যেত, ক্রিয়ার সঙ্গে অমুক অমুক সিলাও ব্যবহার করা যেত, তা না করে এই এই শব্দ এই এই সিলা কেন ব্যবহার করেছেন, এর মধ্যে কী রহস্য থাকতে পারে? এই এই হরফে মাআনী কেন ব্যবহার করেছেন, অন্যটাও তো করা যেত, এর মধ্যে কী রহস্য থাকতে পারে? এভাবে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করার পর যখন মুসান্নিফের ব্যবহৃত ইবারতের আদ্যোপান্ত রহস্য পূর্ণ উদঘাটিত হত তখন উঠে আর একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে আবার শুরু করতেন। এভাবেই চলত ফিকিরের সাথে তার মুতালা। এভাবে ফিকিরের সাথে মুতালা করেই তিনি গভীর সুক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী হতে পেরেছেন, জটিল সব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হতে সক্ষম হয়েছেন।

কীভাবে শব্দে শব্দে ও হরফে হরফে ফিকির করে মুতালা করতে হয় হাতে কলমে তার একটা উদাহরণ পেশ করছি। ধরুন আপনি بسم الله الرحمن الرحيم এর তরজমা শিখতে চান। এখন কোথাও দেখলেন তার

www.maktabatulabrar.com

তরজমা লেখা হয়েছে শুরু করছি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। ব্যস কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়া আপনি তরজমাটুকু মুখস্থ করে নিলেন। তাহলে এভাবে শিখে আপনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবেন না। আপনি ভেবে দেখুন ঐ তরজমা সঠিক হয়েছে কি না। 'আর-রহমান' ও 'আর-রহীম'- উভয় শব্দেই মুবালাগার অর্থ রয়েছে এবং 'আর-রহমান-য়ে মুবালাগা বেশি রয়েছে। সেমতে আপনি ভেবে দেখুন তরজমা সেভাবে হয়েছে কি না। দেখা যাবে ঐ তরজমায় পরম করুণাময় শব্দে মুবালাগা ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু দয়ালু শব্দে কোন মুবালাগা ব্যক্ত হয়নি। তাহলে তরজমা যথার্থ হয়নি। যদি তরজমা এভাবে করা হয়- পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে তাহলে উভয় শব্দের অর্থে মুবালাগা ব্যক্ত হয় ঠিক কিন্তু একটাতে মুবালাগা বেশি ব্যক্ত হওয়ার যে কথা ছিল তা হয় না। এখন ভেবে-চিন্তে যদি এভাবে তরজমা করা হয়- অত্যন্ত দয়ালু অতি মেহেরবান আল্লাহর নামে তাহলে উভয় স্থানে মুবালাগাও হয় আবার একটিতে মুবালাগা বেশিও হয়। অতি-এর চেয়ে অত্যন্ত-এর মধ্যে মুবালাগা বেশি। কেননা অত্যন্ত শব্দটি গঠিত হয়েছে অতি ও অন্ত যোগে (অতি+অন্ত=অত্যন্ত)। আর অতি ও অন্ত-উভয় শব্দেই মুবালাগা রয়েছে। এ গেল শব্দে শব্দে চিন্তা করে বুঝা। এবার হরফে হরফে চিন্তা করুন। بسم الله (বিসমিল্লাহ) শব্দের বা (ب) বর্ণটি কী অর্থে? মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, الباء للاستعانة অর্থাৎ বা বর্ণটি এখানে ইস্তিআনাত তথা সাহায্য কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে "আল্লাহর নামে"-এরূপ তরজমা করলে তো ইস্তিআনাত-এর অর্থ আদায় হয় না, বরং তা হয় মুসাহাবাত-এর অর্থ। অনেক সময় 'নামে' কথাটি 'উদ্দেশ্যে' অর্থও জ্ঞাপন করে। যেমন বলা হয় পিতা মাতার নামে দান করো, অমুকের নামে সদকা করো। তাহলে "আল্লাহর নামে"-এরূপ তরজমা করলে 'নামে' শব্দটি কী অর্থ জ্ঞাপন করল তাইতো অস্পষ্ট হয়ে গেল। এবার চিন্তা করে যদি এরূপ তরজমা করা হয়- "আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে", তাহলে ইস্তিআনাত-এর অর্থ যথার্থই আদায় হবে। এভাবে পূরো بسم الله الرحمن الرحيم -এর তরজমা দাঁড়াবে- (শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে। এরূপ শব্দে শব্দে ও হরফে হরফে চিন্তা করতে পারলে জ্ঞানের গভীরতা আসবে।

৩. মুহাক্কিক আলেম হতে চাইলে প্রত্যেকটা বিষয় দলীল সহকারে বুঝতে হবে। যিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে কুরআন-হাদীছের বিষয়াদি জানেন বোঝেন তিনি হলেন আলেম। আর প্রত্যেকটা বিষয় দলীলাদি সহকারে জানলে তিনি মুহাক্কিক আলেম। আর সেই দলীলাদি সম্বন্ধেও বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে পারলে তিনি মুহাক্কিক মুদাক্কিক আলেম। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট করছি। "কুরআন-হাদীছের ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয"- এ কথাটুকু জানা হচ্ছে ইলম, যিনি জানেন তিনি এতটুকুর আলেম। এর সঙ্গে এ বিষয়ের দলীল যদি জানেন যে, এর দলীল হল ইবনে মাজায় বর্ণিত হাদীছ طلب العلم فريضة على كل مسلم, তাহলে তিনি এতটুকুর ক্ষেত্রে মুহাক্কিক। এরপর এই দলীল সম্বন্ধে তথা এই হাদীছ সম্বন্ধে যদি বিস্তারিত জানেন যে, হাদীছটি জয়ীফ হলেও تعدد طرق তথা বহু সনদ থাকার কারণে হাসান দরজার, তাই এটি গ্রহণযোগ্য এবং আরও জানেন যে, এ হাদীছের مسلم শব্দটি পুরুষবাচক (যার অর্থ মুসলমান পুরুষ) হলেও এর হুকুমে মুসলমান নারীগণও অন্তর্ভুক্ত। তবে কেউ কেউ যে হাদীছটি এভাবে বলে থাকে- طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة -এভাবে কোন গ্রহণযোগ্য সনদে হাদীছটি বর্ণিত হয়নি, তাই সেভাবে বর্ণনা করা সহীহ নয়। এভাবে জানলে তিনি এ ব্যাপারে মুদাক্কিক হবেন।তদ্রূপ কোন ছাত্র যদি এভাবে প্রত্যেকটা বিষয় দলীলসহ এবং সেই দলীল সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞানসহ অগ্রসর হতে থাকে তাহলেই সে হতে পারবে মুহাক্কিক মুদাক্কিক আলেম।

৪. বিজ্ঞ আলেম হতে চাইলে প্রতিটি বুনিয়াদী শাস্ত্রের একটি করে কিতাব মুখস্থ করা বিশেষ উপকারী। ইবারত মুখস্থ না হলেও অন্তত বিষয়গুলো অবশ্যই পূর্ণ আত্মস্থ করে নিতে হবে। যেমতে নাহু, সরফ, বালাগাত, উসূলে ফেকাহ, উসূলে তাফসীর ও উসূলে হাদীস- অন্তত এই কয়টি শাস্ত্রের একটি করে কিতাব মুখস্থ/আত্মস্থ করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে মুখস্থ করার জন্য যে কিতাবটি নির্বাচন করতে হবে তা হওয়া চাই বিশুদ্ধ ও ব্যাপক মর্মবিশিষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত।

আলেমদের জন্য ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি

এখানে আলেম বলতে আমি এমন আলেমদের বুঝিয়েছি যারা ইসলামী তথ্যাবলির সহীহ গায়র সহীহ, ভাল-মন্দ ও হক বাতিলের মাঝে

www.maktabatulabrar.com

পার্থক্য করতে সক্ষম, অর্থাৎ যারা বিজ্ঞ আলেম, যারা অনুসরণীয়, অন্যরা যাদের কথা অনুসরণ করে চলে। তারা যখন কোন ইসলামী গ্রন্থ পাঠ করবেন তখন শুধু বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করেই ক্ষান্ত দিতে পারবেন না। সেটা সহীহ কি গায়র সহীহ তা যাচাইয়ের কাজটিও তাদেরকে সেরে নিতে হবে। তাদেরকে প্রত্যেকটা কথা দুইবার পাঠ করতে হবে। একবার মর্মোদ্ধারের জন্য, আরেকবার যাচাই-বাছাইয়ের জন্য। অবশ্য একবারের পাঠেই যদি দুই বারের কাজ সেরে নেয়া সম্ভব হয় তাতেও চলবে। মূলকথা হল তারা প্রত্যেকটা তথ্য যাচাই-বাছাই করে, বাছ-বিচার করে তারপর তা গ্রহণ করবেন। কেননা তারা যা আহরণ করবেন তা পরবর্তীতে অন্যদের সামনেও পরিবেশন করবেন এবং অন্যরা বিজ্ঞ আলেমের পরিবেশিত তথ্য বিবেচনায় বিনা যাচাইয়েই তা গ্রহণ করবে। এখন তারা যদি সে তথ্য যাচাইয়ের কাজটি সম্পন্ন না করে থাকেন আর তাদের দ্বারা গলত কিছু পরিবেশিত হয়ে যায় এবং তার ফলে অন্যরা বিভ্রান্তির শিকার হয় তাহলে সেই বিভ্রান্তির দায় তারা এড়াতে পারবেন না। এজন্য আলেমদের ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ হওয়া চাই খুব মনোযোগের সাথে, খুব সতর্কতার সাথে, খুব যাচাই-বাছাই ও বাছ-বিচারের সাথে। যেন কোনোভাবেই তাদের মনে কোন গলত তথ্য সঠিক তথ্যের স্থানে জায়গা করে নিতে না পারে। বস্তুত সাধারণ মানুষের অধ্যয়ন মুখ্যত তাদের নিজেদের জন্য, পক্ষান্তরে উলামায়ে কেরামের অধ্যয়ন তাদের নিজেদের জন্যও অন্যদের জন্যও।

অধ্যয়নের জন্য বিষয় ও গ্রন্থ নির্বাচন করার পদ্ধতি

জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি কার পক্ষে কখন কোন্ বিষয়ের গ্রন্থ পাঠ করা উচিত, আবার সেই বিষয়ের গ্রন্থাবলির মধ্যে পাঠ করার জন্য কোন্ লেখকের কোন্ গ্রন্থ নির্বাচন করা চাই- এ বিষয়দু'টো জানার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। আমি বক্ষমান প্রবন্ধে এ দু'টো বিষয় নিয়েই আলোকপাত করতে যাচ্ছি। তথা: এক. কী বিষয়ে গ্রন্থ পাঠ করা চাই সেই বিষয় নির্বাচন করার পদ্ধতি। দুই. সেই বিষয়ে কোন্ গ্রন্থ নির্বাচন করা চাই তার পদ্ধতি।

বিষয় নির্বাচন করার পদ্ধতি

১. জ্ঞান অর্জনের নিয়ত জাগ্রত হওয়ার পর সর্বপ্রথম নির্বাচন করা চাই প্রথমে কোন্ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তারপর কোন্ বিষয়ে, তারপর কোন্ বিষয়ে। জ্ঞান অর্জনের বিষয়াদিতেও একটা ধারাবাহিকতার ব্যাপার রয়েছে। এমনটা নয় যে, একটা বিষয়ে আমার পড়াশোনা করতে মনে চাইল আর অমনি সে বিষয়ে পড়াশোনা ও চর্চা আরম্ভ করে দিলাম। অথচ তার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবাই হল না। স্পষ্ট কথা যে, ফরয পর্যায়ের বিদ্যা বাদ দিয়ে নফল পর্যায়ের বিদ্যায় মশগুল হওয়া না শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থিত না যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আমাদের অনেককে এমনটাই করতে দেখা যায়। ঠিক যেন সতর ঢাকা হল কি না সে চিন্তা বাদ দিয়ে পাগড়ির চিন্তায় মশগুল হওয়া।

www.maktabatulabrar.com

ইসলামে গুরুত্বের বিচারে সর্বাগ্রে স্থান হল ঈমান-আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের, তারপর ইবাদত ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞানের, তারপর ইসলামী মুআমালা তথা লেনদেন ও কায়কারবার সম্পর্কিত জ্ঞানের, তারপর মুআশারা তথা পারস্পরিক আচার-ব্যবহার ও মানবাধিকার সংক্রান্ত জ্ঞানের এবং এসবের সাথে সাথে আখলাক-চরিত্র ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি বিষয়ক জ্ঞানের । কিন্তু অনেককে দেখা যায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঈমান বিষয়ক জ্ঞানের খবর নেই, ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের অন্তত ফরয কয়টা তার পর্যন্ত খবর নেই অথচ তিনি কুরআন-হাদীছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি কি বলা হয়েছে তা নিয়ে চর্চা গবেষণায় বিভোর। এটা হল ফরয বাদ দিয়ে নফল নিয়ে টানাটানির মত। কেউ জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চান করুন, ইসলামের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করতে চান করুন, ইসলামের রাজনীতি ও খেলাফত বিষয়ে পড়াশোনা করতে চান করুন, ইসলামের সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চান করুন, কুরআন হাদীছের তরজমা তাফসীর পড়তে চান পড়ুন, কিন্তু আপনার জন্য এগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী রয়েছে এবং সে বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন সম্পন্ন হয়েছে কি না তা ভেবে দেখা উচিত। সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন সম্পন্ন হওয়ার পর ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে যাওয়াই স্বভাবসম্মত নীতি। মনে রাখতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়, যেগুলোর সঙ্গে তার জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, সেগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন। طلب العلم فريضة على كل مسلم "প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিদ্যা শিক্ষা ফরয"- এ প্রসিদ্ধ হাদীছে এই ফরযে আইন পর্যায়ের বিদ্যার কথাই বলা হয়েছে। আর ফরযে আইন পর্যায়ের বিদ্যা ছেড়ে নফল পর্যায়ের বিদ্যা চর্চায় মাশগুল হওয়া নীতিসম্মত নয়।

২. অধ্যয়নের জন্য যে কোনো বিষয় নির্বাচনের সময় নিজের জ্ঞানের স্তর ও নিজের ধারণ-ক্ষমতার লেভেল বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। নিজের জ্ঞানের স্তর বিবেচনায় রেখে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে অগ্রসর হওয়া চাই। উলামায়ে কেরাম ইসলামী শিক্ষানীতির মধ্যে

একটা নীতি এই বলেছেন, تعلموا صغار العلم قبل كبارها অর্থাৎ বড় বড় বিষয়ের আগে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা কর। নিচের থেকে ধীরে ধীরে পর্যাক্রমে উপরের দিকে অগ্রসর হওয়ার এই নীতি কুরআনের "كونوا ربانيين" বাক্য দ্বারা প্রমাণিত। অতএব আপনি যদি ইসলামী বিষয়াদির জ্ঞানে প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তি হন তাহলে অবশ্যই এখনই উচুঁ স্তরের বিষয়াদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে লিপ্ত হবেন না। জেনারেল শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় সকলেই বিষয়টা বোঝেন। তাই প্রাইমারির ছাত্র কলেজ ভার্সিটি লেভেলের বিষয়াদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইলে তা কেউ সমর্থন করে না। যে ব্যক্তি যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ বোঝে না সে সরল অংক বুঝতে চাইলে তাকে নির্বোধ ঠাওরানো হয়। কারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ বুঝা ছাড়া সরল অংক বুঝা যায় না। কিন্তু ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়টা অনেকেই বুঝতে চান না। এখানে যেন উচুঁ স্তরের বিষয়াদি বোঝার জন্য প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান থাকার কোনোই আবশ্যকতা নেই। তাই দেখা যায় সরাসরি কুরআন-হাদীছ থেকে মাসআলা-মাসায়েল চয়ন করার জন্য আরবি ব্যাকরণ, আরবি শব্দ প্রকরণ, উসূলে ফিকহ, উসূলে হাদীছ, উসূলে তাফসীর প্রভৃতি যেসব প্রাথমিক শাস্ত্র জানার আবশ্যকতা রয়েছে সেগুলো না জানা সত্ত্বেও অনেকেই কুরআন হাদীছ অধ্যয়ন শুরু করেন সরাসরি কুরআন-হাদীছ থেকে মাসআলা-মাসায়েল চয়ন করার জন্য। এমনকি আরবি বুঝতে সক্ষম না হওয়ায় অনুবাদ দিয়েই কাজটা চালিয়ে নিতে চান। এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের জ্ঞানের স্তর ও ধারণ-ক্ষমতার লেভেল বিবেচনায় রাখতে চান না। আমি এ কথা বলছি না যে, তাহলে আলেম নন- এরূপ ব্যক্তিরা আদৌ কুরআন-হাদীছের তর্জমা ও তাফসীর শরাহ পাঠ করতে পারবেন না। পাঠ করতে পারবেন, তবে নসীহতের জন্য, মোটামোটা কথাগুলো বুঝার জন্য, গবেষণার জন্য নয় কিম্বা সরাসরি মাসআলা-মাসায়েল চয়ন করার জন্য নয়। তাই কুরআন মাজীদ বা হাদীছ শরীফের অনুবাদ ব্যাখ্যা পাঠ করার সময় স্থূল দৃষ্টিতে কোন মাসআলা বা কোন বিধান আলেমদের বাতানো মাসআলা বা বিধান থেকে ভিন্ন রকম মনে হলে তারা নিজেদের থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে বিজ্ঞ আলেমদের স্মরণাপন্ন হবেন।

www.maktabatulabrar.com

৩. আপনি যদি বিশেষজ্ঞ হতে চান অর্থাৎ তাখাসসুস বা ডক্টরেট করতে চান তাহলে প্রথমে নির্ধারণ করুন আপনি কোন বিষয়ে তথা কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হতে চান, কোন বিষয়ে তথা কোন শাস্ত্রে তাখাসসুস বা ডক্টরেট করতে চান। সেই বিষয় তথা সেই শাস্ত্র কীভাবে নির্বাচন করবেন সেটাও বুঝার রয়েছে। আপনার পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজন কোন্ শাস্ত্রে তাখাসসুস বা ডক্টরেট করতে বলে সেটা মুখ্যত আমলে নেয়ার নয় বরং যে শাস্ত্রের সাথে আপনার তবয়ী মুনাসাবাত তথা স্বভাবগত মিল রয়েছে সেই শাস্ত্রকেই তাখাসসুস বা ডক্টরেট করার জন্য নির্বাচন করুন। আর কোন্ শাস্ত্রের সাথে আপনার স্বভাবগত মিল রয়েছে কিংবা বলা যায় কোন শাস্ত্র আপনার স্বভাবসম্মত তা বুঝার উপায় হল- যে শাস্ত্রের বিষয়াদি পড়তে আপনার ভাল লাগে, যে শাস্ত্রের বিষয়াদি আপনার ভাল বুঝে আসে, যে শাস্ত্রের বিষয়াদি আপনার ভাল মনে থাকে সে শাস্ত্রই আপনার স্বভাবসম্মত। সে শাস্ত্রেই আপনি বিশেষজ্ঞ হতে পারবেন। কেননা কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হতে গেলে সেই শাস্ত্র নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করা চাই, সেই শাস্ত্রের বিষয়াদি ভাল করে বুঝা চাই এবং ভালভাবে মনে রাখা চাই। আর যে শাস্ত্রের সাথে স্বভাবগত মিল থাকে তার বিষয়াদি পড়তে ভাল লাগার কারণে তা নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করা সম্ভব এবং তার বিষয়াদি ভাল বুঝে আসার কারণে সেগুলো ভালভাবে মনে রাখা সম্ভব। তাই স্বভাবসম্মত শাস্ত্রকেই তাখাসসুস বা ডক্টরেট করার জন্য নির্বাচন করা চাই।

গ্রন্থ নির্বাচন করার পদ্ধতি

যেকোনো বিষয়ে গ্রন্থ পাঠ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গ্রন্থ নির্বাচনের বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থ হচ্ছে জ্ঞানের উস্তাদ ও জ্ঞানদাতা। তাই গ্রন্থ নির্বাচন শুদ্ধ না হলে সে গ্রন্থ থেকে অর্জিত জ্ঞানও শুদ্ধ হবে না। ঠিক যেমন কোন উস্তাদ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী না হলে তার থেকে জ্ঞান অর্জনকারী ছাত্রের জ্ঞানও সঠিক হয় না। অতএব যেকোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে সে বিষয়ের গ্রন্থ নির্বাচন হতে হবে সঠিক। এমন যেন না হয় শুধু আকর্ষণীয় প্রচারে মুগ্ধ হয়েই কোন গ্রন্থ পাঠের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হল। এটা গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়। কিম্বা কোন গ্রন্থের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ দেখেই সেটা সংগ্রহ করা ও পাঠ

করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হল। এটাও গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়। অথবা কোন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করা হল অমুক বিষয়ে কোন গ্রন্থ পাঠ করা যায়, আর দোকানী কোন একটা গ্রন্থ ধরিয়ে দিল, ব্যস সেটাই পাঠ করার জন্য নির্বাচন করা হল। এটাও গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়। মনে রাখতে হবে সাধারণত প্রত্যেক দোকানী সেই বইটিই ধরিয়ে দেয় যাতে তার ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকে। তা হোক না সে বইটি অনির্ভরযোগ্য বা অসুন্দর। অনেক সময় ব্যবসায়ী তার ব্যবসার স্বার্থে নিজের থেকেই কোন বইয়ের গুণগান করে সেটা ক্রেতাকে ধরিয়ে দেয়। এটাকে বলে পুশিং সেল। এ পদ্ধতিতে ক্রেতার হাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্ভরযোগ্য ও সুন্দর বই নাও আসতে পারে। তাই এটাও গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়। সম্প্রতি অনেকে একটা বিষয়ে জানার আগ্রহ জন্মালে সে বিষয়ে কোন বই পাঠ করা যায় তা জানার জন্য ফেসবুকে আবেদন জানিয়ে একটা পোস্ট ছাড়ে যে, অমুক বিষয়ে কোন কোন বই-কিতাব পাঠ করা যায়? তখন দেখা যায় একেকজন নিজ নিজ পছন্দের, নিজ নিজ মতবাদের অনুকূলের বইপত্রের সাজেস্ট করতে থাকে (যদিও সে মতবাদ ভ্রান্ত), পাবলিশাররা ব্যবসায়িক স্বার্থে তাদের প্রকাশিত বইপত্রেরই সাজেস্ট করতে থাকে (যদিও তাদের প্রকাশিত সে বইপত্র গ্রহণযোগ্য নয় বা সুন্দর নয়)। এভাবে হয়তো সে সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে যে বই ভাল তার নাম উঠে আসে না, বরং যেটা ভাল নয় বা ক্ষতিকর এমন কোন বইয়ের নাম উঠে আসে আর আবেদনকারী সে বই সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা প্রতারিত হয় বা বিভ্রান্ত হওয়ার যোগাড় করে। বস্তুত একটা বিষয়ে কি কি বই লেখা হয়েছে, তার মধ্যে কোন কোনটা বিশুদ্ধ ও ভাল সে সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়া যার তার কাজ নয়। এর জন্য যথেষ্ট জ্ঞান, যথেষ্ট লেখাপড়া ও যথেষ্ট খোঁজ-খবর থাকা চাই। তদুপরি পরামর্শ দেয়ার মত বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীও থাকা চাই। হাদীছে এসেছে- المستشار مؤتمن। অর্থাৎ, যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তার উপর আমানতদারী এসে যায়। সুতরাং ফেসবুকে এভাবে আবেদন জানিয়ে যার তার থেকে বইপত্রের ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার পথ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। এটাও গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়।

সারকথা- আকর্ষণীয় প্রচারে মুগ্ধ হয়ে গ্রন্থ নির্বাচন, আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ দেখে গ্রন্থ নির্বাচন, দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে গ্রন্থ নির্বাচন,

www.maktabatulabrar.com

দোকানীর পুশিং সেল-এর শিকার হয়ে গ্রন্থ নির্বাচন, ফেসবুকে পোস্ট ছেড়ে যার তার থেকে পরামর্শ নিয়ে বা এমনিতেই যার তার থেকে পরামর্শ নিয়ে সে মোতাবেক গ্রন্থ নির্বাচন- এগুলো গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়।

গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতির পর্যায়ে যে কয়টি কাজ করণীয় তা হচ্ছে-

১. কোন দ্বীন-ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ নির্বাচন করতে হলে সর্বাগ্রে যাচাই করে নিতে হয় গ্রন্থটির লেখক হকপন্থী লোক কি না, তিনি যোগ্য আলেম কি না, ইলম অনুযায়ী তার আমল আছে কি না, তিনি আদর্শবান ব্যক্তি কি না, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কি না, আলেম না হলে কোন নির্ভরযোগ্য আলেম বা নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাতে সবকিছু লিখেছেন কি না ইত্যাদি। (কুরআন-সুন্নাহর বাইরের কোন বিষয়ের গ্রন্থ হলেও লেখক নির্ভরযোগ্য সূত্রে সবকিছু বলেছেন কি না তা দেখা চাই।) এসব বিষয় যাচাই না করে যার তার লেখা গ্রন্থ পাঠ করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি সেরূপ গ্রন্থ থেকে কোন তথ্য প্রচার করাও ঠিক নয়। তাতে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী এসে যেতে পারে, হেদায়েত প্রচারের পরিবর্তে গোমরাহী প্রচার হয়ে যেতে পারে। বস্তুত দ্বীনী শিক্ষার বিষয়টি খুবই নাজুক, এ ক্ষেত্রে সাবধানী না হলে, কার থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে তা বিবেচনায় না রাখলে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। এজন্যই প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত ইবনে সিরীন রহ. বলেছেন, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم অর্থাৎ, ইলম হচ্ছে একটি দ্বীনী বিষয়। অতএব লক্ষ্য রেখো কার থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

উল্লেখ্য, কেউ বলতে পারেন, আমরা কোন গ্রন্থ পাঠ করে তার ভালটি গ্রহণ করব আর মন্দটা গ্রহণ করব না তাহলেই তো চলে? এ ক্ষেত্রে কথা হল আপনি যদি ভাল-মন্দ যাচাই-বাছাই করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন, তাহলে তো সেটা ঠিক আছে। নতুবা অনুরূপ যোগ্যতার অভাব থাকায় আপনি মন্দটাকেই ভাল বুঝে গ্রহণ করে নিতে পারেন। তাহলে আপনি বিভ্রান্তির শিকার হবেন। এ কারণেই সাধারণ লোকদের জন্য নীতি হল তারা কোন গ্রন্থ নির্বাচন করতে চাইলে সর্বাগ্রে তার লেখক সম্বন্ধে যাচাই করে নিবেন।

২. সাধারণ লোক (অর্থাৎ যারা ধর্মীয় বিষয়ে বিজ্ঞ নন তারা) কোন বাতিলপন্থী লোকের বই বা তাওরাত, ইঞ্জীল, বেদ, উপনিষদ, পূরাণ, ত্রিপিটক প্রভৃতি বিধর্মীদের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা থেকে বিরত থাকবেন। তাদের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ পাঠ বিভ্রান্তির আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় কথা হল আপনি যদি ভাল-মন্দ যাচাই বাছাই করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন, তাহলে তো আপনি এ ধরনের গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। নতুবা অনুরূপ যোগ্যতার অভাব থাকায় মন্দটাকেই ভাল বুঝে গ্রহণ করে নিলে আপনি নির্ঘাত বিভ্রান্তির শিকার হবেন। এ কারণেই সাধারণ লোকদের জন্য নীতি হল তারা কোন বাতিলপন্থীর লেখা গ্রন্থ বা ভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা থেকে বিরত থাকবেন।

৩. ফিকহী মাসআলা-মাসায়েল বিষয়ক কিতাবপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীতি হল- যারা নিজেদের মাযহাবের মাসায়েল ও তার দালায়েল (দলীল-প্রমাণ) সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকেফহাল নন তারা ভিন্ন মাযহাবের লোকদের লেখা মাসআলা-মাসায়েল বিষয়ক কিতাবপত্র পাঠ করা থেকে বিরত থাকবেন। অন্যথায় নিজেদের মাযহাবের মাসআলার দলীল-প্রমাণ জানা না থাকার কারণে ভিন্ন মাযহাবের মাসআলাই সহীহ এবং নিজেদের মাযহাবের মাসআলা গলত মনে হওয়ায় বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। অনেককে এরূপ বিভ্রান্ত হয়ে কোন কোন মাসআলায় ভিন্ন মাযহাব অনুসরণ করতেও দেখা যায়। মনে রাখতে হবে চার মাযহাবের প্রত্যেকটিই সঠিক কিন্তু একেক মাসআলায় একেক মাযহাবের অনুসরণ কোন শ্রেণীর আলেমের নিকটই সঠিক নয়। মাযহাব অনুসরণের ক্ষেত্রে যেকোন একটিরই সর্বতোভাবে অনুসরণ হতে হবে। একই কারণে কোন গ্রন্থের কোন মাসআলা বা কোন বর্ণনা যদি নিজেদের মাযহাবের খেলাফ মনে হয় তাহলে সে অনুযায়ী আমল করা যাবে না, আমল করতে হবে নিজেদের মাযহাব অনুযায়ী। প্রয়োজন বোধ হলে নিজেদের মাযহাবের বিস্তারিত সবকিছু বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে নিতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

যে কোন গ্রন্থ পাঠ করার পূর্বে তার লেখক সম্বন্ধে যা জেনে নেয়া চাই

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

যেকোনো দ্বীনী গ্রন্থ পাঠ করার পূর্বে গ্রন্থটির লেখক সম্বন্ধে কিছু বিষয় জেনে নেয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ঐ গ্রন্থের লেখক হবেন পাঠকারির উস্তাদ। পাঠকারী হবে তার ছাত্র। আর কোন উস্তাদ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী না হলে তার থেকে জ্ঞান অর্জনকারী ছাত্রের জ্ঞানও সঠিক হয় না। উস্তাদ সঠিক চিন্তাধারার অধিকারী না হলে ছাত্রের মাঝে তার প্রভাব পড়তে পারে। তাই যেকোনো গ্রন্থ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে তার লেখক সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই জেনে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে দ্বীনী শিক্ষার বিষয়টি খুবই নাজুক, এ ক্ষেত্রে সাবধানী না হলে, কার থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে তা বিবেচনায় না রাখলে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। এজন্যই প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত ইবনে সিরীন রহ. বলেছেন, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم অর্থাৎ, ইলম হচ্ছে একটি দ্বীনী বিষয়। অতএব লক্ষ্য রেখো কার থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

অতএব যার গ্রন্থ পাঠ করা হবে তার ব্যাপারে সাবধানী হতে হবে। এ পর্যায়ে যে বিষয়গুলো যাচাই করে নিতে হবে সেগুলো হচ্ছে-

১. কোন দ্বীন-ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ নির্বাচন করতে হলে সর্বাগ্রে যাচাই করে নিতে হয় গ্রন্থটির লেখক হকপন্থী লোক কি না। হকপন্থী নাহলে তার লেখা গ্রন্থ পাঠ করা যাবে না। কারণ লেখক বাতিলপন্থী হওয়ায় সে নিজে গোমরাহ, অন্যদের গোমরাহির কারণ, সে নিজে খেয়াল খুশি মত চলে, সে নিজে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। অতএব তার কথার অনুসরণ করা যাবে না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.

অর্থাৎ, তোমরা ঐসব লোকের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না যারা ইতিপূর্বে নিজেরা গোমরাহ হয়েছে, অন্য অনেককে গোমরাহ করেছে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। (সূরা মায়েদা: ৭৭)

অতএব সাধারণ লোক (অর্থাৎ যারা ধর্মীয় বিষয়ে বিজ্ঞ নন তারা) কোন বাতিলপন্থী লোকের বই তদ্রূপ তাওরাত, ইঞ্জীল, বেদ, উপনিষদ, পূরাণ, ত্রিপিটক প্রভৃতি বিধর্মীদের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা থেকে বিরত থাকবেন। তাদের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ পাঠ বিভ্রান্তির আশংকা থেকে মুক্ত নয়।

কেউ বলতে পারেন আমরা ভালটি গ্রহণ করব মন্দটা গ্রহণ করব না, তাহলে তো চলে। এ ক্ষেত্রে কথা হল আপনি যদি ভাল-মন্দ যাচাই বাছাই করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন, তাহলে ঠিক আছে- আপনি এ ধরনের গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। নতুবা ভাল মন্দ যাচাই করার যোগ্যতায় অভাব থাকার কারণে মন্দটাকেই ভাল বুঝে গ্রহণ করে নিলে আপনি নির্ঘাত বিভ্রান্তির শিকার হবেন। এ কারণেই সাধারণ লোকদের জন্য নীতি হল তারা কোন বাতিলপন্থীর লেখা গ্রন্থ বা ভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা থেকে বিরত থাকবে।

২. লেখক যোগ্য আলেম ও নির্ভরযোগ্য কি না জেনে নিতে হবে। যোগ্য আলেম না হলে তার লেখা গ্রন্থ পাঠ করা যাবে না। লেখক আলেম না হলে যদি কোন নির্ভরযোগ্য আলেম বা নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাতে সবকিছু লিখে থাকেন তাহলেও চলতে পারে। লেখক আলেম না হলে বা আলেমের তত্ত্বাবধানে না লিখলে তার লেখা জাহালাত থেকে মুক্ত হবে না। আর সেই জাহালাতের অনুসরণ গোমরাহির কারণ হয়ে

www.maktabatulabrar.com

দাঁড়াতে পারে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই একটি হাদীছে এসেছে-

فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.

অর্থাৎ, তাদেরকে (দ্বীনী বিষয়াদি সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হবে আর তারা ইলম ছাড়াই সমাধান বলে দিবে। ফল এই দাঁড়াবে যে, তারা (নিজেরা তো) গোমরাহ রয়েছে (অন্যদেরকেও) গোমরাহ করল। (বোখারী ও মুসলিম)

৩. লেখকের মধ্যে ইলম অনুযায়ী আমল আছে কি না, লেখক আদর্শবান ব্যক্তি কি না দেখে নিতে হবে। বে-আমল আলেম ও আদর্শহীন ব্যক্তি তার বে-আমলী ও আদর্শহীনতা ঢাকা দেয়ার জন্য যে বিষয়ে তার আমল নেই বা যে বিষয়ে তার আদর্শ ঠিক নেই সে বিষয়ের বর্ণনায় বিকৃতির পথ ধরতে পারে। ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। তাই লেখকের মধ্যে ইলম অনুযায়ী আমল আছে কি না, লেখক আদর্শবান ব্যক্তি কি না দেখে নেয়ার মধ্যেই সতর্কতা। তবে কোন লেখা যদি আমল বা আদর্শের সাথে সম্পর্কিত না হয়, নিছক ইলমী তাহকীক বিষয়ক হয়, সেক্ষেত্রে আমল না থাকার বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ায় এরূপ ক্ষতির দিক নেই।

গ্রন্থের লেখক সম্বন্ধে যেসব বিষয় যাচাই করা প্রয়োজন সেগুলো যাচাই না করে সে গ্রন্থ পাঠ করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি সেরূপ গ্রন্থ থেকে কোন তথ্য প্রচার করাও ঠিক নয়। তাতে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী এসে যেতে পারে, হেদায়েত প্রচারের পরিবর্তে গোমরাহী প্রচার হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহর কাছে আমরা সব ক্ষেত্রে তাওফীক কামনা করি। আমীন!

দ্বীনী গ্রন্থ অধ্যয়ন: কোন বিষয়ের আগে কোন বিষয়ের পরে হওয়া চাই

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

জ্ঞান অর্জনের জন্য অধ্যয়নের নিয়ত জাগ্রত হওয়ার পর সর্বপ্রথম নির্বাচন করা চাই প্রথমে কোন্ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তারপর কোন্ বিষয়ে, তারপর কোন্ বিষয়ে ... । জ্ঞান অর্জনের বিষয়াদিতে এমন একটা ধারাবাহিকতার ব্যাপার রয়েছে। এমনটা নয় যে, একটা বিষয়ে আমার পড়াশোনা করতে মনে চাইল আর অমনি সে বিষয়ে পড়াশোনা ও চর্চা আরম্ভ করে দিলাম, অথচ তার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবাই হল না। স্পষ্ট কথা যে, ফরয পর্যায়ের বিদ্যা বাদ দিয়ে নফল পর্যায়ের বিদ্যায় মশগুল হওয়া না শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থিত না যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আমাদের অনেককে এমনটাই করতে দেখা যায়। ঠিক যেন সতর ঢাকা হল কি না সে চিন্তা বাদ দিয়ে পাগড়ির চিন্তায় মশগুল হওয়া।

ইসলামে গুরুত্বের বিচারে সর্বাগ্রে স্থান হল ঈমান-আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের, তারপর ইবাদত ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞানের, তারপর ইসলামী মুআমালা তথা লেনদেন ও কায়কারবার সম্পর্কিত জ্ঞানের, তারপর মুআশারা তথা পারস্পরিক আচার-ব্যবহার ও

www.maktabatulabrar.com

মানবাধিকার সংক্রান্ত জ্ঞানের এবং এসবের সাথে সাথে আখলাক-চরিত্র ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি বিষয়ক জ্ঞানের । কিন্তু অনেককে দেখা যায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঈমান বিষয়ক জ্ঞানের খবর নেই, ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের অন্তত ফরয কয়টা তার পর্যন্ত খবর নেই অথচ তিনি কুরআন-হাদীছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি কি বলা হয়েছে তা নিয়ে চর্চা-গবেষণায় বিভোর। মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েলের দলীল-প্রমাণ ঘাঁটাঘাঁটিতে ব্যস্ত। এটা হল ফরয বাদ দিয়ে নফল নিয়ে টানাটানির মত। কেউ জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চান করুন, ইসলামের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করতে চান করুন, ইসলামের রাজনীতি ও খেলাফত বিষয়ে পড়াশোনা করতে চান করুন, ইসলামের সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চান করুন, কুরআন হাদীছের তরজমা তাফসীর পড়তে চান পড়ুন, কিন্তু আপনার জন্য এগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী রয়েছে এবং সে বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন সম্পন্ন হয়েছে কি না তা ভেবে দেখা উচিত। সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন সম্পন্ন হওয়ার পর ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে যাওয়াই স্বভাবসম্মত নীতি। মনে রাখতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়, যেগুলোর সঙ্গে তার জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, সেগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন। طلب العلم فريضة على كل مسلم "প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিদ্যা শিক্ষা ফরয"- এ প্রসিদ্ধ হাদীছে এই ফরযে আইন পর্যায়ের বিদ্যার কথাই বলা হয়েছে। আর ফরযে আইন পর্যায়ের বিদ্যা উপেক্ষা করে নফল পর্যায়ের বিদ্যা চর্চায় মাশগুল হওয়া নীতিসম্মত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, ফরযে আইন পর্যায়ের বিদ্যা অর্জন সম্পন্ন করার পূর্বে অন্য বিদ্যাতে মোটেই টাচ করা যাবে না। বরং বোঝানো হচ্ছে ফরযে আইন পর্যায়ের বিদ্যা অর্জনকে অগ্রাধিকার দেয়া চাই।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিক বুঝ ও সঠিক আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন!

অধ্যয়নের জন্য কীভাবে গ্রন্থ নির্বাচন করবেন?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

আপনি কোন একটা বিষয়ে পড়াশোনা করতে চান, সেই বিষয়ে অনেক লেখকের লেখা বইপত্র রয়েছে। বাজারে এখন বইপত্রের অভাব নেই। একই বিষয়ে অনেক লেখকের বই রয়েছে। এখন আপনি কার লেখা বই পাঠ করার জন্য নির্বাচন করবেন? এ ব্যাপারে অবশ্যই আপনার কিছু সাবধানতা অবলম্বন করার রয়েছে। এ পর্যায়ে যেগুলো গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয় সেগুলো থেকে বিরত থাকুন। যেগুলো গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি সেগুলো অবলম্বন করুন। যেগুলো গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয় তার মধ্যে রয়েছে:

১. শুধু আকর্ষণীয় প্রচারে মুগ্ধ হয়েই কোন গ্রন্থ পাঠের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া। এটা গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়।

২. কোন গ্রন্থের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ দেখেই সেটা সংগ্রহ করা ও পাঠ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া। এটাও গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়।

৩. কোন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করা হল অমুক বিষয়ে কোন গ্রন্থ পাঠ করা যায়, আর দোকানী কোন একটা গ্রন্থ ধরিয়ে দিল, ব্যস সেটাই পাঠ করার জন্য নির্বাচন করা হল। এটাও গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়। মনে রাখতে হবে সাধারণত প্রত্যেক দোকানী সেই বইটিই ধরিয়ে দেয় যাতে তার ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকে। তা হোক না সে বইটি অনির্ভরযোগ্য বা অসুন্দর।

www.maktabatulabrar.com

৪. অনেক সময় ব্যবসায়ী তার ব্যবসার স্বার্থে নিজের থেকেই কোন বইয়ের গুণগান করে সেটা ক্রেতাকে ধরিয়ে দেয়। এটাকে বলে পুশিং সেল। এ পদ্ধতিতে ক্রেতার হাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্ভরযোগ্য ও সুন্দর বই নাও আসতে পারে। তাই এটাও গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়।

৫. সম্প্রতি অনেকে একটা বিষয়ে জানার আগ্রহ জন্মালে সে বিষয়ে কোন বই পাঠ করা যায় তা জানার জন্য ফেসবুকে আবেদন জানিয়ে একটা পোস্ট ছাড়ে যে, অমুক বিষয়ে কোন কোন বই-কিতাব পাঠ করা যায়? তখন দেখা যায় একেকজন নিজ নিজ পছন্দের, নিজ নিজ মতবাদের অনুকূলের বইপত্রের সাজেস্ট করতে থাকে (যদিও সে মতবাদ ভ্রান্ত), পাবলিশাররা ব্যবসায়িক স্বার্থে তাদের প্রকাশিত বইপত্রেরই সাজেস্ট করতে থাকে (যদিও তাদের প্রকাশিত সে বইপত্র গ্রহণযোগ্য নয় বা সুন্দর নয়)। এভাবে হয়তো সে সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে যে বই ভাল তার নাম উঠে আসে না, বরং যেটা ভাল নয় বা ক্ষতিকর এমন কোন বইয়ের নাম উঠে আসে আর আবেদনকারী সে বই সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা প্রতারিত হয় বা বিভ্রান্ত হওয়ার যোগাড় করে। বাস্তবেও আমরা এভাবে বহু লোককে ভ্রান্তির শিকার হতে দেখছি। বিশেষ করে ফেসবুকে কেউ কোন বিষয়ে বইয়ের সাজেস্ট চাইলে দেখা যায় এলোপাতাড়ি সাজেস্ট পড়তে থাকে। যার মধ্যে অনেকটাই বিভ্রান্তিমূলক সাজেস্ট। এ ব্যাপারে কোন লেখক বিশেষের বা গ্রন্থ বিশেষের নাম উল্লেখ করে অন্তহীন ঝগড়ার দ্বার অবারিত করতে চাই না।

বস্তুত একটা বিষয়ে কি কি বই লেখা হয়েছে, তার মধ্যে কোন কোনটি বিশুদ্ধ ও ভাল বা কোনটি সবচেয়ে ভাল সে সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়া যার তার কাজ নয়। এর জন্য যথেষ্ট জ্ঞান, যথেষ্ট লেখাপড়া ও যথেষ্ট খোঁজ-খবর থাকা চাই। তদুপরি পরামর্শ দেয়ার মত বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীও থাকা চাই। হাদীছে এসেছে- المستشار مؤتمن. অর্থাৎ, যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তার উপর আমানতদারী এসে যায়। (তিরিমযী) সুতরাং ফেসবুকে এভাবে আবেদন জানিয়ে যার তার থেকে বইপত্রের ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার পথ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। এটাও গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়।

সারকথা- আকর্ষণীয় প্রচারে মুগ্ধ হয়ে গ্রন্থ নির্বাচন, আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ দেখে গ্রন্থ নির্বাচন, দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে গ্রন্থ নির্বাচন, দোকানীর পুশিং সেল-এর শিকার হয়ে গ্রন্থ নির্বাচন, ফেসবুকে পোস্ট ছেড়ে যার তার থেকে পরামর্শ নিয়ে বা এমনিতেই যার তার থেকে পরামর্শ নিয়ে সে মোতাবেক গ্রন্থ নির্বাচন- এগুলো গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়।

গ্রন্থ নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতির পর্যায়ে যে কয়টি কাজ করণীয় তা হচ্ছে-

১. কোন দ্বীন-ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ নির্বাচন করতে হলে সর্বাগ্রে যাচাই করে নিতে হয় গ্রন্থটির লেখক হকপন্থী লোক কি না, তিনি যোগ্য আলেম কি না, ইলম অনুযায়ী তার আমল আছে কি না, তিনি আদর্শবান ব্যক্তি কি না, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কি না, আলেম না হলে কোন নির্ভরযোগ্য আলেম বা নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাতে সবকিছু লিখেছেন কি না ইত্যাদি। এসব বিষয় যাচাই না করে যার তার লেখা গ্রন্থ পাঠ করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি সেরূপ গ্রন্থ থেকে কোন তথ্য প্রচার করাও ঠিক নয়। তাতে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী এসে যেতে পারে, হেদায়েত প্রচারের পরিবর্তে গোমরাহী প্রচার হয়ে যেতে পারে। বস্তুত দ্বীনী শিক্ষার বিষয়টি খুবই নাজুক, এ ক্ষেত্রে সাবধানী না হলে, কার থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে তা বিবেচনায় না রাখলে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। এজন্যই প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত ইবনে সিরীন রহ. বলেছেন, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. অর্থাৎ, ইলম হচ্ছে একটি দ্বীনী বিষয়। অতএব লক্ষ্য রেখো কার থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

উল্লেখ্য, কেউ বলতে পারেন, আমরা কোন গ্রন্থ পাঠ করে তার ভালটি গ্রহণ করব আর মন্দটা গ্রহণ করব না তাহলেই তো চলে? এ ক্ষেত্রে কথা হল আপনি যদি ভাল-মন্দ যাচাই-বাছাই করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন, তাহলে তো সেটা ঠিক আছে। নতুবা অনুরূপ যোগ্যতার অভাব থাকায় আপনি মন্দটাকেই ভাল বুঝে গ্রহণ করে নিতে পারেন। তাহলে আপনি বিভ্রান্তির শিকার হবেন। এ কারণেই সাধারণ লোকদের জন্য নীতি হল তারা কোন গ্রন্থ নির্বাচন করতে চাইলে সর্বাগ্রে তার লেখক সম্বন্ধে যাচাই করে নিবেন।

www.maktabatulabrar.com

২. সাধারণ লোক (অর্থাৎ যারা ধর্মীয় বিষয়ে বিজ্ঞ নন তারা) কোন বাতিলপন্থী লোকের বই বা তাওরাত, ইঞ্জীল, বেদ, উপনিষদ, পূরাণ, ত্রিপিটক প্রভৃতি বিধর্মীদের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা থেকে বিরত থাকবেন। তাদের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ পাঠ বিভ্রান্তির আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় কথা হল আপনি যদি ভাল-মন্দ যাচাই বাছাই করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন, তাহলে তো আপনি এ ধরনের গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। নতুবা অনুরূপ যোগ্যতার অভাব থাকায় মন্দটাকেই ভাল বুঝে গ্রহণ করে নিলে আপনি নির্ঘাত বিভ্রান্তির শিকার হবেন। এ কারণেই সাধারণ লোকদের জন্য নীতি হল তারা কোন বাতিলপন্থীর লেখা গ্রন্থ বা ভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা থেকে বিরত থাকবেন।

৩. ফিকহী মাসআলা-মাসায়েল বিষয়ক কিতাবপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীতি হল- যারা নিজেদের মাযহাবের মাসায়েল ও তার দালায়েল (দলীল-প্রমাণ) সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকেফহাল নন তারা ভিন্ন মাযহাবের লোকদের লেখা মাসআলা-মাসায়েল বিষয়ক কিতাবপত্র পাঠ করা থেকে বিরত থাকবেন। (অন্য মাযহাবের লোকদের থেকে মাসায়েলও শুনবে না।) অন্যথায় নিজেদের মাযহাবের মাসআলার দলীল-প্রমাণ জানা না থাকার কারণে ভিন্ন মাযহাবের মাসআলাই সহীহ এবং নিজেদের মাযহাবের মাসআলা গলত মনে হওয়ায় বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। অনেককে এরূপ বিভ্রান্ত হয়ে কোন কোন মাসআলায় ভিন্ন মাযহাব অনুসরণ করতেও দেখা যায়। মনে রাখতে হবে চার মাযহাবের প্রত্যেকটিই সঠিক কিন্তু একেক মাসআলায় একেক মাযহাবের অনুসরণ কোন শ্রেণীর আলেমের নিকটই সঠিক নয়। মাযহাব অনুসরণের ক্ষেত্রে যেকোন একটিরই সর্বতোভাবে অনুসরণ হতে হবে। একই কারণে কোন গ্রন্থের কোন মাসআলা বা কোন বর্ণনা যদি নিজেদের মাযহাবের খেলাফ মনে হয় তাহলে সে অনুযায়ী আমল করা যাবে না, আমল করতে হবে নিজেদের মাযহাব অনুযায়ী। প্রয়োজন বোধ হলে নিজেদের মাযহাবের বিস্তারিত সবকিছু বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে নিতে হবে।

وما علينا إلا البلاغ.

কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিউ: পদ্ধতি ও মাসায়েল

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد: فقد قال الله تعالى: يايها الذين آمنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط.

রিভিউ (Review) শব্দের অর্থ পুনরায় দর্শন, পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন। বিচার বিভাগে কোন রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন করা হলে রিভিউ-এর অর্থ হয় পুনঃবিচার। গ্রন্থের রিভিউ হলে তার অর্থ হয় গ্রন্থ-সমালোচনা। আমরা এখানে গ্রন্থের রিভিউ (বুক রিভিউ/Book Review) তথা গ্রন্থ সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু কথা আলোচনা করতে চাই। গ্রন্থ-সমালোচনার অর্থ গ্রন্থের শুধু মন্দ দিকগুলো আলোচনা নয়, সমালোচনা শব্দের প্রসিদ্ধ ব্যবহার থেকে যা অনুমিত হতে পারে। বরং গ্রন্থের ভাল বা মন্দ যেটা যতটুকু আছে ন্যায্যভাবে সবটা তুলে ধরাই হচ্ছে গ্রন্থ সমালোচনা।

গ্রন্থের রিভিউ সম্পর্কিত আলোচনা দুই ধরনের। যথা:

এক. রিভিউপত্র সাজানোর পদ্ধতি। এতে প্রথমে রিভিউকারী নিজের পুরো নাম ঠিকানা লিখবে। তারপর যে গ্রন্থের রিভিউ করছে তার নাম ও লেখকের পরিচয় লিখবে। গ্রন্থের ধরন (মৌলিক রচনা/অনুবাদ)

www.maktabatulabrar.com

লিখবে।গ্রন্থের বিষয় (যেমন: ইতিহাস নাকি ভূগোল নাকি উপন্যাস নাকি রম্যরচনা নাকি মাসায়েল নাকি ফাযায়েল ইত্যাদি) লিখবে। তারপর থাকবে গ্রন্থটির প্রকাশক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় ও গ্রন্থটির মূল্য-এর উল্লেখ। তারপর থাকবে রিভিউ-এর মূল বিষয় তথা গ্রন্থটির মান সম্পর্কিত আলোচনা ও গ্রন্থটি সম্বন্ধে রিভিউকারীর একান্ত মন্তব্য বা ব্যক্তিগত অভিমত। সবশেষে রিভিউকারীর স্বাক্ষর। রিভিউপত্র সাজানোর এ পদ্ধতিতে কিছু আগপিছ বা উনিশ-বিশও হতে পারে, তাতে শরয়ী কোন অসুবিধা নেই।

দুই. রিভিউয়ের মূল আলোচ্য বিষয়। রিভিউ-এর আলোচ্য বিষয়াদির মূল হল গ্রন্থটির মান নিয়ে আলোচনা তথা গ্রন্থটির ভালো দিক বা খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা। এ পর্যায়ে থাকবে গ্রন্থটির ভাষা ও বিষয়বস্তু নিয়ে পর্যালোচনা, গ্রন্থটির বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গ, কেন গ্রন্থটি পাঠকদের পড়া উচিৎ বা উচিৎ নয় তার সুচিন্তিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

এ পর্যায়ে কয়েকটা জরুরি নীতি ও মাসআলা হল-

১. কোন গ্রন্থের ভাষা, বিষয়বস্তু ও মান সম্বন্ধে রিভিউ দিতে হলে সেই গ্রন্থের লেখকের চেয়েও বেশি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নিদেনপক্ষে রিভিউকারির পর্যাপ্ত জ্ঞানী ও যোগ্য হওয়া তো অবশ্যই শর্ত। অযোগ্য ব্যক্তি কোন গ্রন্থের রিভিউ দিতে পারে না। এটা একটা মোটা কথা যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

২. কোন গ্রন্থের মান সম্বন্ধে বক্তব্য প্রদান তথা রিভিউ ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান। অতএব সাক্ষ্য যেমন হওয়া চাই ইনসাফের সাথে, ব্যক্তিস্বার্থের একপেশে চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ চেতনা থেকে ও বাস্তবসম্মত, রিভিউও হওয়া চাই তদ্রূপ। সাক্ষ্যের ব্যাপারে কুরআনে কারীমের নির্দেশ অনুরূপ। ইরশাদ হয়েছে,

يايها الذين آمنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط.لله.

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর জন্য খুব দণ্ডায়মান, ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদাতা। (সূরা মায়েদা: ৮)

৩. রিভিউ হওয়া চাই আমানতদারির সাথে। কেননা রিভিউয়ের মধ্যে মাশওয়ারার অংশও থাকে। আর কারও কাছে কোন বিষয়ে মাশওয়ারা চাওয়া হলে তার ওপর আমানতদারি এসে যায়। হাদীছে এসেছে-

المستشار مؤتمن.

অর্থাৎ যার কাছে মাশওয়ারা চাওয়া হয় তার ওপর আমানতদারি এসে যায়। (তিরমিযী)

৪. রিভিউয়ের মধ্যে রিভিউকারির নিজস্ব অভিমতও থাকে, তাই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত ভাল করে বুঝে পাঠ করার আগে রিভিউ প্রদান করা যাবে না। কেননা অভিমত হচ্ছে এক ধরনের মন্তব্য। আর কোন গ্রন্থ আদ্যোপান্ত ভাল করে বুঝে পাঠ করার আগে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করলে তা বাস্তবসম্মত হয় না। শুধু অভিমত ও মন্তব্যের জন্য নয় পর্যালোচনার জন্যও গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত ভাল করে বুঝে পাঠ করা জরুরি।

৫. কোন গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়িক স্বার্থে বা অন্য কোন হীন স্বার্থে সেটাকে নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন বলে রিভিউ দেয়া হলে সেটা হবে ধোঁকা ও প্রতারণা। আর ধোঁকা ও প্রতারণা হচ্ছে কবীরা গোনাহ। হাদীছে এসেছে- من غشنا فليس منا

অর্থাৎ যে আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সে আমাদের আদর্শভুক্ত নয়। (মুসলিম)

৬. গ্রন্থের সমালোচনায় ভারসাম্য থাকা চাই। ঢালাও সমালোচনা না হওয়া চাই। প্রয়োজনে কোন গ্রন্থের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে হলেও এমনভাবে আলোচনা না করা যেন অনুমিত হয় গোটা গ্রন্থই দোষে ভরা, তার মধ্যে বুঝি ভাল কোন দিকই নেই। বরং তার মধ্যে বিশেষ ভাল কোন দিক উল্লেখ করার মত থাকলে তাও উল্লেখ করা চাই। যাতে তার বিশেষ ভালটি থেকে উপকার লাভ করা যায়। একটা উদাহরণ দেই। মনে করুন আপনি কোন একটা গ্রন্থের একটা দু'টো ভুল-বিচ্যুতি উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছেন। অথচ সে গ্রন্থটিতে উল্লেখ করার মত বহু উপকারী ও ভাল বিষয়ও রয়েছে যেগুলো দ্বারা মানুষের প্রচুর ফায়দা হচ্ছে বা হতে পারে। তাহলে সমালোচনার বিষয়গুলো তুলে ধরার সাথে সাথে সে গ্রন্থটির ভাল দিকগুলোও ব্যক্ত করা চাই। অন্যথায় গ্রন্থটির প্রতি অবিচার করা হবে, ভারসাম্য নষ্ট হবে। গ্রন্থটির বিষয় বিশেষের সমালোচনা করতে হলেও তার উল্লেখযোগ্য ভাল দিকগুলোও বর্ণনা করা চাই, তাহলেই ভারসাম্য রক্ষা হবে, তাহলেই গ্রন্থটির প্রতি অবিচার থেকে বিরত থাকা হবে। অন্যথায় মানুষের লেখা কোন গ্রন্থই এমন নেই

www.maktabatulabrar.com

যা সম্পূর্ণই ভুল-বিচ্যুতি মুক্ত। এখন কোন গ্রন্থের শুধু কয়েকটা ভুল তুলে ধরে সে গ্রন্থটিকে ঢালাওভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে দেখানোর নীতি গ্রহণ করা হলে মানুষের লেখা সব গ্রন্থকেই অগ্রহণযোগ্য বলে দেখানো যাবে। যেমন ধরুন বুখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ শরাহ গ্রন্থ ইবনে হাজার আসকালানী রচিত ফাতহুল বারী। বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ও অনন্য শরাহ গ্রন্থ হিসেবে এবং রেফারেন্স বুক হিসেবে সকলেই এটিকে গ্রহণ করেছেন। অথচ এতে যে ভুল-বিচ্যুতি বা সমালোচনার মত কোনো বিষয় একেবারেই নেই তা নয়। আল্লামা আইনী উমদাতুল কারী গ্রন্থে ফাতহুল বারির অনেক বিষয় নিয়ে সমালোচনা করেছেন, তার বহু ভুল তুলে ধরেছেন। আরও অনেকে ফাতহুল বারির দু'চারটে ভুল ধরেছেন। এখন কেউ যদি ফাতহুল বারী গ্রন্থের ভাল ও গ্রহণযোগ্যতার দিকগুলো সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে শুধু এ রকম বিশ পঞ্চাশটা ভুল একত্র করে সেগুলোর সমালোচনা করতে গিয়ে সেগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন মনে হয় এ গ্রন্থটি তাহলে অসংখ্য ভুলে ভরা, অতএব এ গ্রন্থটি বর্জনযোগ্য, তাহলে সেটা হবে ভারসাম্যহীন সমালোচনা। সেটা হবে ফাতহুল বারির প্রতি অবিচার। তবে হাঁ কোন গ্রন্থ যদি লেখাই হয়ে থাকে কোন বাতিল মতাদর্শ প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তাহলে তার ভাল দিকগুলো তুলে ধরে কাউকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা সংগত নয়। কেননা সার্বিকভাবে সে গ্রন্থটা বিভ্রান্তিরই সহায়ক।

উল্লেখ্য, রিভিউ বা গ্রন্থ সমালোচনাও এক ধরনের সমালোচনা। আর ইসলামে সমালোচনার বিস্তারিত নীতিমালা রয়েছে। গ্রন্থ রিভিউকারীকে রিভিওকর্ম সমালোচনার গোটা নীতিমালা সামনে রেখেই সম্পন্ন করতে হবে। 'সমালোচনার নীতিমালা' শীর্ষক একটি লেখা ইতিপূর্বে পোস্ট করা হয়েছে।

সারকথা কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিউ দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত যোগ্যতার প্রয়োজন। অথচ আজকাল পর্যাপ্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনেকে বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিও দিচ্ছে। রিভিউ দেয়া কোন ছেলেখেলা নয় যে, কারও মনে চাইলেই সে যে কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিউ দিতে পারে চাই তার যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক। বস্তুত একটা গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিউ দিতে হলে সেই গ্রন্থের লেখকের চেয়েও বেশি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তদুপরি কোন ব্যক্তিস্বার্থের একপেশে চেতনা থেকে নয় বরং নিরপেক্ষ চেতনা থেকে,

আমানতদারির চেতনা থেকে রিভিউ হওয়া চাই। কিন্তু আজকালকার রিভিউগুলো বিশেষত ফেসবুকের রিভিউগুলো কি এমন হচ্ছে? স্বয়ং প্রকাশকরাই ব্যবসায়িক স্বার্থে নিজেদের প্রকাশিত বইপত্রের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রশংসা করে রিভিউ ছাড়ছে। এটাকে রিভিউ নয় বরং ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাবলিসিটি বলা যায়। এমনও দেখা যাচ্ছে কোন প্রকাশক তার প্রকাশিত কোন বইয়ের ব্যাপারে যার রিভিও ভাল হবে পুরস্কার ঘোষণা করল, ব্যাস রিভিও দেয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এবং বইটি ভাল না হওয়া সত্ত্বেও নিছক পুরস্কার লাভের আশায় অনেকেই বইটি সম্বন্ধে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে খুব ভাল বলে রিভিও দিয়ে দিল। কারণ তাদেরকে তো পুরস্কার পেতে হবে। আর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভাল না বললে যে পুরস্কার হাতানো যাবে না। এ ধরনের রিভিউকে রিভিউ নয় বরং হীন স্বার্থে পাবলিককে প্রতারিত করার অপচেষ্টা আখ্যায়িত করা উচিত।

وما علينا إلا البلاغ.

www.maktabatulabrar.com

চালু হয়েছে রিভিউ বেচাকেনা: উপার্জনের এক সহজ পদ্ধতি

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

সরলমতি পাঠকদের প্রতারণার এক অভিনব কৌশল। বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে হাইফাই রিভিউ দেয়া হচ্ছে। রিভিউ পড়লেই পাঠক চমৎকৃত হবে। অনন্য সাধারণ গ্রন্থ, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, অত্যন্ত উপকারী, অত্যন্ত যুগোপযোগী। আকর্ষণীয় অনুবাদ, চমৎকার উপস্থাপন- এরকম রিভিউ দেখে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। রিভিউ যেই দেখবে গ্রন্থটি পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। সেটি সংগ্রহ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে। ব্যস প্রকাশকের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সফল। যদিও রিভিউ দেয়া হয়েছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বা অমূলক। প্রকাশক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রিভিউ দিয়েছে তার ব্যবসায়িক স্বার্থে আর রিভিউকারী ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রিভিউ দিয়েছে তার রিভিউ দ্বারা পুরস্কার পাওয়ার স্বার্থে কিংবা বলা যায় তার রিভিউ যেন ভাল দামে বিক্রি হয় এই চিন্তায়। তাই রিভিউ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তো দিতেই হবে। এভাবে চলছে রিভিউ-বাণিজ্য, রিভিউ-এর বিকিকিনি। জনগণ যতদিন সচেতন না হয় এভাবে রিভিউ লিখে অনেকেই বেশ সহজে কিছু কামিয়ে নিতে পারবে।

সহজে এজন্য যে, রিভিউ-এর বিষয়গুলো কীভাবে সাজাতে হয় তার একটা রেডিমেড ফর্ম তৈরি করে রাখলেই হবে। যাতে থাকবে প্রথমে রিভিউকারির পুরো নাম: ...। তারপর যে গ্রন্থের রিভিউ করা হল তার নাম: ... তারপর লেখকের পরিচয়: ...। তারপর গ্রন্থের ধরন (মৌলিক রচনা/অনুবাদ): ...। গ্রন্থের বিষয় (যেমন: ইতিহাস নাকি ভূগোল নাকি উপন্যাস নাকি রম্যরচনা নাকি মাসায়েল নাকি ফাযায়েল ইত্যাদি): ...। তারপর থাকবে গ্রন্থটির প্রকাশক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়: ... ও গ্রন্থটির মূল্য: ...। এঘরগুলো পূরণ করা হবে। তারপর গ্রন্থটির প্রশংসায় কিছু কথা। সবশেষে রিভিউকারির স্বাক্ষর। ব্যস রিভিউ হয়ে গেল।

ইদানিং প্রকাশকরা ফেসবুকে তাদের বিভিন্ন প্রকাশনার অনুকূলে রিভিউ আহ্বান করছে, শ্রেষ্ঠ রিভিউ-এর জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করছে। ব্যস কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিউ দিতে হলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, যে নিয়ম-নীতি অনুসরণের প্রয়োজন, সেই যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও, সেই নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করেই শুধু পুরস্কার লাভের আশায় অনেকেই রিভিউ দিতে এগিয়ে আসছে। গ্রন্থ সম্বন্ধে যার রিভিউ সবচেয়ে ভাল হবে সে-ই পুরস্কার পাবে। অতএব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হলেও আমার রিভিউ যেন সবচেয়ে ভাল হয় তার জন্য রিভিউকারীদের কসরতের শেষ নেই। এমনও দেখা যাচ্ছে একই লেখকের কোন গ্রন্থ (অনূদিত) একাধিক লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেক লাইব্রেরি থেকেই রিভিউ আহ্বান করা হয়েছে। এখন কোন রিভিউকারী একই রিভিউ সব লাইব্রেরির গ্রন্থের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। শুধু রিভিউ-ফর্মে লাইব্রেরির নাম, অনুবাদকের নাম আর গ্রন্থটির প্রশংসায় কথিত শব্দগুলোর দু' একটা পাল্টে দিলেই হল। যেমন একটার বেলায় হয়তো লিখেছিল অনুবাদ আকর্ষণীয় হয়েছে, তো আরেকটার বেলায় একটা শব্দ বাড়িয়ে লিখে দিল অনুবাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে। তাহলে তৃতীয় আর এক লাইব্রেরির বেলায় কী শব্দ বাড়াবে? পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। তখন বাড়াবে- খোদার কসম অনুবাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে। একটা কাহিনী শোনাই। আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন আমি মালিবাগ জামেয়ার ছাত্র। তখন ঢাকা থেকে স্বল্প দূর পাল্লার যে লোকাল সার্ভিস বাস মিনিবাসগুলো ছেড়ে যেত, সেগুলোতে সিটের অতিরিক্ত লোক যেমন নেয়া হত তেমনি যত্রতত্র থামিয়ে লোক ওঠা-নামা করানোও চলত অহরহ। মানুষ সার্ভিসগুলোর

www.maktabatulabrar.com

প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। তখন মানুষের বিতৃষ্ণা কাটানোর জন্য বাস মিনিবাসগুলোর গায়ে লেখা শুরু হল 'এক্সপ্রেস সার্ভিস'। কিছু দিন একটু ব্যতিক্রমই চলল। তারপর ঐ আগের মতোই অবস্থা। তখন লেখা শুরু হল সিটিং সার্ভিস। এক পর্যায়ে সিটিং সার্ভিসেও আস্থা রইল না। তখন লেখা শুরু হল গেটলক। এতেও যখন আস্থা রইল না, তখন কী লেখা যায়? তখন সম্ভবত দৈনিক ইত্তেফাক বা দৈনিক ইনকিলাব-এর কৌতুক বিভাগে একজন লিখেছিল- একজন পরিবহন বিশেষজ্ঞের কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করল- ওস্তাদ! লোকাল সার্ভিস-এর গায়ে আমরা এক্সপ্রেস সার্ভিস লিখে কিছুদিন তো ভালই চালালাম। তারপর এক সময় এক্সপ্রেস সার্ভিস কথাটায় আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাল্টে আমরা সিটিং সার্ভিস লিখলাম। তাতেও আস্থা উঠে যাওয়ায় গেটলক লিখলাম। এখন গেটলকেও আস্থা উঠে গেছে। এখন কী লিখব? তখন ঐ বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিল এখন লিখবে- খোদার কসম গেটলক!

বস্তুত কোন গ্রন্থের রিভিউ দেয়ার জন্য যেমন যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বেশকিছু নিয়ম-নীতি ও মাসায়েল। সেসব নিয়ম-নীতি ও মাসায়েল অনুসরণ না করে রিভিউ প্রদান করা অন্যায়, ক্ষেত্র বিশেষে গোনাহেরও। আর যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও রিভিউ দেয়া হচ্ছে অনধিকার চর্চা।

সবশেষে লাইব্রেরি মালিক ও প্রকাশকদের কাছে আবেদন যার তার থেকে রিভিউ নিয়ে রিভিউকে ছেলেখেলায় পরিণত করবেন না। কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে অমূলক রিভিউ দিয়ে প্রতারণার দায় কাঁধে চাপাবেন না। আর যারা রিভিউ দেন তাদের প্রতি আবেদন রিভিউ দেয়ার আগে নিজেকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখবেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থটির রিভিউ দেয়ার যোগ্যতা আপনার আছে কি না, রিভিউ দেয়ার জন্য গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত পাঠ করে ভালভাবে বুঝে নেওয়ার শর্ত আপনার দ্বারা পূরণ হয়েছে কি না, রিভিউ দেয়ার পদ্ধতি ও রিভিউ সংক্রান্ত মাসায়েল আপনার জানা আছে কি না।

وما علينا إلا البلاغ.

যে কোন বিষয় অধ্যয়নের পূর্বে আপনার জ্ঞান কোন স্তরের তা বিবেচনায় রাখুন

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

অধ্যয়নের জন্য যে কোনো বিষয় নির্বাচনের সময় নিজের জ্ঞানের স্তর ও নিজের ধারণ-ক্ষমতার লেভেল বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। নিজের জ্ঞানের স্তর বিবেচনায় রেখে নিচের দিক থেকে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে অগ্রসর হওয়া চাই। উলামায়ে কেরাম ইসলামী শিক্ষানীতির মধ্যে একটা নীতি এই বলেছেন, **تعلموا صغار العلم قبل كبارها** অর্থাৎ বড় বড় বিষয়ের আগে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা কর। নিচের থেকে ধীরে ধীরে পর্যাক্রমে উপরের দিকে অগ্রসর হওয়ার এই নীতি কুরআনের "كونوا ربانيين " বাক্য দ্বারা প্রমাণিত। (এটি সূরা আলে ইমরানের ৭৯ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।)

অতএব আপনি যদি ইসলামী বিষয়াদির জ্ঞানে প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তি হন তাহলে অবশ্যই এখনই উঁচু স্তরের বিষয়াদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে লিপ্ত হবেন না। জেনারেল শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় সকলেই বিষয়টা বোঝেন। তাই প্রাইমারির ছাত্র কলেজ ভার্সিটি লেভেলের বিষয়াদি নিয়ে

www.maktabatulabrar.com

ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইলে তা কেউ সমর্থন করে না। যে ব্যক্তি যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ বোঝে না সে সরল অংক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলে তাকে নির্বোধ ঠাওরানো হয়। কারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ বুঝা ছাড়া সরল অংক বুঝা যায় না। কিন্তু ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়টা অনেকেই বুঝতে চান না। এখানে যেন উঁচু স্তরের বিষয়াদি বোঝার জন্য প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান থাকার কোনোই আবশ্যকতা নেই। তাই দেখা যায় কেউ কেউ জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরে থাকা সত্ত্বেও জটিল ও বিতর্কিত মাসআলা মাসায়েলের দলীল-প্রমাণ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেন । বেচারাগণ হয়তো দলীল-প্রমাণ বোঝার জন্য কতটুকু যোগ্যতার প্রয়োজন তা-ও বোঝেন না। কেউ কেউ জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরে থাকা সত্ত্বেও তাসাওউফের উঁচু স্তরের বিষয়াদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেন। অনেকেই সরাসরি কুরআন-হাদীছ থেকে মাসআলা-মাসায়েল চয়ন করার জন্য নাহু (আরবি ব্যাকরণ), সরফ (আরবি শব্দ প্রকরণ), উসূলে ফিকহ, উসূলে হাদীছ, উসূলে তাফসীর প্রভৃতি যেসব প্রাথমিক শাস্ত্র জানার আবশ্যকতা রয়েছে সেগুলো না জানা সত্ত্বেও কুরআন হাদীছ অধ্যয়ন শুরু করেন সরাসরি কুরআন-হাদীছ থেকে মাসআলা-মাসায়েল চয়ন করার জন্য। এমনকি আরবি বুঝতে সক্ষম না হওয়ায় অনুবাদ দিয়েই কাজটা চালিয়ে নিতে চান। এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের জ্ঞানের স্তর ও ধারণ-ক্ষমতার লেভেল বিবেচনায় রাখতে চান না। আমি এ কথা বলছি না যে, তাহলে আলেম নন- এরূপ ব্যক্তিরা আদৌ কুরআন-হাদীছের তর্জমা ও তাফসীর শরাহ পাঠ করতে পারবেন না। পাঠ করতে পারবেন, তবে নসীহতের জন্য, মোটামোটা কথাগুলো বুঝার জন্য, গবেষণার জন্য নয়, সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য নয়, কিম্বা সরাসরি মাসআলা-মাসায়েল চয়ন করার জন্য নয়। তাই কুরআন মাজীদ বা হাদীছ শরীফের অনুবাদ ব্যাখ্যা পাঠ করার সময় স্থুল দৃষ্টিতে কোন মাসআলা বা কোন বিধান আলেমদের বাতানো মাসআলা বা বিধান থেকে ভিন্ন রকম মনে হলে তারা নিজেদের থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে বিজ্ঞ আলেমদের স্মরণাপন্ন হবেন।

জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরে থাকা সত্ত্বেও উঁচু স্তরের বিষয়াদি নিয়ে পড়াশোনা করলে পঠিত বিষয় ভালভাবে বুঝে আসে না, অস্পষ্টতা থেকে যায়। আবার সেই অস্পষ্টতার দরুণ ভুল বোঝাবুঝির ও বিভ্রান্তির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

তাই সর্বশেষ কথা হল- আপনি যে কোনো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইলে আপনি সেই বিষয় ভালভাবে বোঝার স্তরে উন্নীত হয়েছেন কি না তা বিবেচনায় রাখুন। যারা কাউকে কোন গ্রন্থ বা কোন বিষয় অধ্যয়নের পরামর্শ দিবেন তারাও বিবেচনায় রাখবেন সেই গ্রন্থ বা সেই বিষয় ভালোভাবে বুঝার যোগ্যতা তার আছে কি না। মনে রাখবেন নিচের থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে ওঠা- এটাই হচ্ছে স্বভাবসম্মত রীতি, এটাই যুক্তিসম্মত রীতি, এটাই সঠিক রীতি।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সবক্ষেত্রে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

www.maktabatulabrar.com

কারও ফলোয়ার হতে চাইলে তার কী দেখে নেয়া চাই?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد: فقد قال الله تعالى : واتبع سبيل من اناب الي.

ইদানিং দেখা যাচ্ছে (বিশেষভাবে ফেসবুকে) আমি অমুক হুজুরের ফলোয়ার, আমি অমুক আলেমের ফলোয়ার, আমি অমুক খেলোয়াড়ের ফলোয়ার, আমি অমুকের ফলোয়ার তমুকের ফলোয়ার- এ রকম বিভিন্ন জনের ফলোয়ার হওয়ার একটা হিড়িক পড়ে গেছে। বিভিন্ন জনের ফলোয়ারদের গ্রুপ হচ্ছে, তাতে অন্যদের জোড়ানোর তোড়জোড় চলছে- জয়েন্ট হওয়ার জন্য ইনভাইট (Invite) চলছে, পুশিং চলছে । বুঝে হোক না বুঝে হোক, ভেবে-চিন্তে হোক বা হুজুগে হোক বিভিন্ন জনের ফলোয়ার হওয়ার একটা প্রবাহ চলছে। তাই কারও ফলোয়ার হতে চাইলে তার কী দেখে নেয়া চাই- এ সম্বন্ধে কিছু কথা বলার প্রয়োজন বোধ হল।

ফলোয়ার (Follower) অর্থ অনুসারী, অনুগামী। শব্দ দু'টো বিশেষণ (Adjective)। অনুসারী শব্দটি অনু+সরণ থেকে আর অনুগামী

শব্দটি অনু+গমন থেকে গঠিত। 'অনু' অর্থ পেছনে আর 'সরণ' অর্থ চলা। সে হিসেবে অনুসরণ অর্থ পেছনে পেছনে চলা। আর অনুগমন অর্থ পেছনে পেছনে গমন করা বা পেছনে পেছনে যাওয়া। এক শব্দে পশ্চাদগমন। কেউ আপনার গমনাগমন তথা আপনার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আপনার পেছনে পেছনে চললে আপনি বলেন, লোকটা আমাকে ফলো করছে বা লোকটা আমাকে অনুসরণ করছে। এ হলো অনুসরণ-এর শব্দমূলীয় অর্থে তথা যথাযথ প্রকৃত অর্থে ব্যবহারের উদাহরণ। অনুসরণ শব্দের অর্থে ব্যাপকতা এনে কারও অনুরূপ আচরণ করা বা অনুকরণ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই বলা হয়, সে অমুক নেতার অনুসারী বা সে অমুক আলেমের অনুসারী। এখানে অনুসরণ প্রথম অর্থে নয় যে, সেই নেতা বা আলেম যখনই রাস্তায় চলাচল করে সে তার পিছু নেয়। বরং এ অর্থে যে, সেই নেতা বা আলেম যা করে সেও অনুরূপ করে, সেই নেতা বা আলেমের আদর্শ সে অনুকরণ করে, সেই নেতা বা আলেমের ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনা-সবকিছুই সে গ্রহণ করে। সংক্ষেপে সেই নেতা বা আলেমকে সে নিজের জীবনের গাইড তথা মুরব্বী বানিয়ে নেয়।

সারকথা দাঁড়াল- কারও ফলোয়ার হওয়ার অর্থ তাকে নিজের জীবনের গাইড তথা মুরব্বী বানানো। তাহলে দ্বীনের লাইনে কারও ফলোয়ার হওয়ার অর্থ নিজের যিন্দেগির জন্য তাকে দ্বীনী গাইড হিসেবে তথা দ্বীনী মুরব্বী হিসেবে গ্রহণ করা। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা দ্বীনী ব্যাপারে তার ফলোয়ার হওয়ার অর্থ তার ঈমান-আকীদার অনুসরণ করা হবে, তার ইলম তথা বিদ্যা-বুদ্ধির অনুসরণ করা হবে, তার চিন্তাধারার অনুসরণ করা হবে, তার তাকওয়া-পরহেযগারির অনুসরণ করা হবে, তার আমল ও ইবাদত-বন্দেগির অনুসরণ করা হবে। তাহলে কারও ফলোয়ার হতে চাইলে তার ঈমান-আকীদা, তার ইলম, তার চিন্তাধারা, তার তাকওয়া-পরহেযগারী, তার আমল ও ইবাদত-বন্দেগী সবকিছু যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে তার ফলোয়ার হওয়া যাবে, অন্যথায় নয়। কুরআনে কারীমে কেমন লোকের অনুসরণ করতে হবে তার বর্ণনা করতে গিয়ে এমনই বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

واتبع سبيل من اناب الي.

অর্থ: তুমি অনুসরণ কর সেই ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে রুজূ হয়।

www.maktabatulabrar.com

(সূরা লুকমান: ১৫) বলা বাহুল্য, রুজূ হওয়া বলতে আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক সব ব্যাপারেই রুজূ হওয়া বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সব ব্যাপারে যে আল্লাহর দিকে রুজূ হয় তথা সব ব্যাপারে যে পারফেক্ট তারই অনুসরণ করা যাবে, তারই ফলোয়ার হওয়া যাবে।

অতএব এই যেখানে অবস্থা যে, দ্বীনী ব্যাপারে কারও ফলোয়ার হওয়ার বিষয়টা নিষ্পন্ন হওয়া চাই অনেক কিছু যাচাই-বাছাই পূর্বক- আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক সবকিছু দেখে, যথেষ্ঠ সাবধানতার সাথে, সেখানে কেউ যদি কারও শুধু একটা বয়ান ভাষণ শুনেই বা কাউকে মুনাজাতে কাঁদতে দেখেই, বা কারও বয়ানে তর্জন-গর্জন শুনেই মুগ্ধ হয়ে বলে, আমি অমুক হুজুরের ফলোয়ার, তাহলে সে ভুল করবে। কারণ কারও ফলোয়ার হওয়ার আগে তার অনেক কিছুই যাচাই-বাছাই করার ছিল যা সে করেনি। একটা খণ্ডিত বিষয় দেখে সামগ্রিক সঠিকতার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিংবা কাউকে দু'চারটে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে সক্ষম দেখে, বা কারও বাহারী টুপি-পাগড়ি দেখে, বাহারী জুব্বা-আলখাল্লা দেখে, সুন্দর চেহারা দেখে, সুললিত কণ্ঠ শুনে, স্মার্টনেস দেখে, কথায় কথায় ইংরেজি বলতে পারার সক্ষমতা দেখে, কথায় কথায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলতে পারার সক্ষমতা দেখে, ভক্ত মুরীদের সংখ্যা বেশি দেখে- ইত্যাদি কোন একটা কিছু দেখেই তার ফলোয়ার হয়ে যায় তাহলে সে ভুল করবে। কারণ এগুলো কারও ফলোয়ার হওয়ার ভিত্তিই নয়।

এখানে আরও একটা কথা বলতে চাই। তা হল- কোন পাপির মধ্যেও ভাল কিছু একটা দেখলে তা গ্রহণ করা যায়। কারও থেকে একটা দু'টো ভাল কিছু গ্রহণ করতে গেলে সামগ্রিকভাবে তার ভাল হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু কারও ফলোয়ার বা অনুসারী হতে গেলে সামগ্রিকভাবে তার পারফেক্ট হওয়া জরুরী। কেননা ফলো (Follow) বা অনুসরণ কথাটা সামগ্রিক বিষয়ে অনুকরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন- যদি এমন হয় যে, কেউ মুখে ফলো বা অনুসরণ শব্দ বলল কিন্তু নিয়ত রাখল খণ্ডিত কোন একটা বিষয়ে অনুকরণ, তাহলে নিয়তের বিচারে হয়তো সে পার পেয়ে যাবে, তবে মনে রাখতে হবে শব্দের কারণেও পাকড়াও হতে পারে। মুখের কথায় কেউ ফেঁসে যেতে পারে। তাই শব্দের ব্যবহারেও সাবধানতা চাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলতেন,

إن الْبلَاء مُوكل بالْقَوْل. (شرح السنة للبغوي).

অর্থাৎ, মুখের কথায় মুসীবত চেপে বসে। (শরহুস সুন্নাহ)

সবশেষে বলতে চাই- মনে রাখতে হবে অনুসারী আর অনুগতদের হাশর হবে একসাথে। অতএব আপনি কারও খণ্ডিত একটা বিষয় দেখেই তার ফলোয়ার তথা অনুসারী হয়ে গেলেন অথচ অন্য যেসব বিষয় যাচাই করার ছিল -যা আপনি করেননি- তার মধ্য হয়তো মারাত্মক গলদ রয়ে গেল আর আপনি ফলোয়ার হওয়ায় সেই গলদ লোকের সঙ্গেই আপনার হাশর হল, সেটা কি আপনার জন্য অশুভ পরিণাম বয়ে আনতে পারে না? বস্তুত কারও ফলোয়ার হওয়া ছেলেখেলার মত কোন বিষয় নয়। ভেবে নিবেন, বুঝে নিবেন।

وما علينا إلا البلاغ

www.maktabatulabrar.com

আলেম ও বুযুর্গদের প্রতি ভক্তির ভিত্তি কী হওয়া চাই

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

দ্বীনের চিন্তা-চেতনা লাভ, দ্বীনের সহীহ দিক-নির্দেশনা লাভ ও দ্বীনের সহীহ বুঝ লাভের জন্য উলামা ও সুলাহা তথা আলেম ও বুযুর্গদের প্রতি ভক্তি একটি জরুরি বিষয়। উলামা ও সুলাহা থেকেই মানুষ দ্বীনের কথা শোনে শেখে এবং তদনুযায়ী আমল করে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের কামিয়াবী অর্জন করতে সক্ষম হয়। উলামা ও সুলাহার প্রতি ভক্তি না থাকলে তাদের থেকে তারা কিছু শিখতে উদ্বুদ্ধ হবে না। তাদের কথায় তাদের আমলের স্পৃহা জাগবে না। ফলে তারা দ্বীন ও ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে। তারা হবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত।

এখন রয়ে গেল কী দেখে আলেম-উলামা ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি ভক্তি দাঁড় করাতে হবে, ভক্তির ভিত্তি কী হওয়া চাই? এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ বহু রকম বিভ্রান্তির শিকার। যেগুলো ভক্তি স্থাপনের ভিত্তি নয়, সেগুলোকেই তারা ভক্তি স্থাপনের ভিত্তি বানিয়ে অজায়গায় ভক্তি স্থাপন

করে প্রতারণার জালে ফেঁসে যাচ্ছে, বিভ্রান্তির জালে ফেঁসে যাচ্ছে। বস্তুত ভক্তির প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে সঠিক ঈমান-আকীদা, সঠিক চিন্তাধারা, সঠিক ইলম ও সঠিক আমল। যার ঈমান-আকীদা সঠিক নয় তার প্রতি ভক্তি স্থাপন করা যাবে না। যার চিন্তাধারা সঠিক নয় তার প্রতি ভক্তি স্থাপন করা যাবে না। যার ইলম সঠিক নয় তার প্রতি ভক্তি স্থাপন করা যাবে না। যার আমল সঠিক নয় তার প্রতি ভক্তি স্থাপন করা যাবে না।

সঠিক ঈমান-আকীদা, সঠিক চিন্তাধারা, সঠিক ইলম ও সঠিক আমল- এই চারটি হল ভক্তির ভিত্তি। এর বাইরে অন্য কোন কিছু ভক্তির ভিত্তি নয়, হতে পারে না। বড় বড় লকব-উপাধি ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না, কারণ অনেক অযোগ্য ব্যক্তিও বড় বড় লকব-উপাধি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কারও থেকে কাশফ কারামত বা অলৌকিক কিছু দেখাও ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না, কারণ অদ্ভুত অলৌকিক ধরনের কিছু জাদু-টোনা ও তুকতাকের মাধ্যমেও দেখানো যেতে পারে। কারও তাবিজ-তুমারে ভাল ফল হওয়াও ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না, কারণ ফাসেক-ফাজেরের তাবীজ-তুমারেও কাজ হতে পারে। বস্তুত তাবীজ হল দুআর মত। আর দুআ কখনও বুযুর্গেরটা কবূল হবে না, ফাসেকেরটা হবে- এমনও তো হতে পারে। কারও নূরানী চেহারাও ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না, কারণ ফাসেক-ফাজেরের চেহারাও সুন্দর হয়ে থাকে। সেই সুন্দর চেহারাকে উর্দূ অভিব্যক্তিতে 'নূরানী চেহারা' আখ্যায়িত করা যায়। সুললিত কণ্ঠও ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না, কত গায়ক-গায়িকার সুললিত কণ্ঠ থাকে। বাহারি টুপি-পাগড়ি, বাহারি জুব্বা-আলখাল্লাও ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না, এগুলো তো বাজার থেকে কিনে যে কেউ গায়ে জড়াতে পারে। ওয়াজ-বয়ানের ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজি বলতে পারাও ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না, কারণ ইংরেজি জানা কুরআন হাদীছের জ্ঞান সঠিক থাকার, চিন্তাধারা সঠিক থাকার ও ঈমান-আমল সঠিক থাকার দলীল নয়। ওয়াজ-বয়ানের ফাঁকে ফাঁকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলতে পারাও ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তো নাস্তিক বেঈমানরাও বলে থাকে। কারও ভক্ত-মুরীদের সংখ্যা বেশি হওয়াও ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না। ভক্ত-মুরীদের সংখ্যা বেশি হওয়া তো হক হওয়ারও দলীল নয়। ইতিহাসে দেখা যায় বহু হকপন্থী লোকের অনুসারীরা সংখ্যায় কম ছিল, পক্ষান্তরে বহু ভণ্ড-বাতিলের অনুসারীরা সংখ্যায় বেশি ছিল।

www.maktabatulabrar.com

কারও বয়ান-ভাষণের ব্যাপারে ফেসবুক টুইটার প্রভৃতিতে বেশি লাইক পড়া বা কারও বয়ান-ভাষণ বেশি শেয়ার হওয়াও ভক্তির ভিত্তি হতে পারে না, কারণ ফেসবুক টুইটারে যারা লাইক শেয়ার করে তাদের কয়জন মানোত্তীর্ণ তা-ই তো বিবেচ্য। ফেসবুক টুইটার প্রভৃতিতে না-বুঝ ও হুজুগে লোকের সংখ্যা একেবারে কম নয়। অনেককে দেখা যায় তারা যে বিষয়টা বেশি পছন্দ করেন, যে বিষয়ের প্রতি তাদের ঝোঁক বেশি সেই বিষয়টা যে আলেম বেশি বলেন সেই আলেমকে তারা ভক্তি করেন, অন্যদের প্রতি তাদের ভক্তি থাকে না। যেমন: একজন রাজনীতির প্রতি বেশি ঝোঁক রাখেন, এখন যে আলেম রাজনীতি নিয়ে বেশি আলোচনা করেন তাকে তিনি ভক্তি করেন, যারা রাজনীতি নিয়ে তেমন আলোচনা করেন না তাদেরকে তিনি ভক্তি করেন না। কিংবা যেমন জেহাদের প্রতি একজনের ঝোঁক বেশি, এখন যে আলেম জেহাদ নিয়ে গরম গরম আলোচনা করেন তাকে তিনি ভক্তি করেন, যারা তেমন করেন না তাদেরকে তিনি ভক্তি করেন না। অথবা মনে করুন কেউ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের প্রতি বেশি ঝোঁক রাখেন, এখন যে আলেম বেশি বেশি তাবলীগী বয়ান রাখেন বা তাবলীগে সময় লাগান তাকে তিনি ভক্তি করেন, যারা তেমন করেন না তাদেরকে তিনি ভক্তি করেন না। এভাবে নিজস্ব ঝোঁক-প্রবণতার আনুকূল্য বিবেচনায় কারও প্রতি ভক্তি স্থাপন হল নিজের অভিরুচিকে ভক্তির ভিত্তি বানানো। এমনটা ভক্তির সামগ্রিক ভিত্তি বিবেচিত হবে না। দ্বীনের কোন একটা খাস বিষয়ে নিজের মনমত পেলে ভক্তি অন্যথায় ভক্তি নয়- এটা ভক্তির সামগ্রিক ভিত্তি নয়। ভক্তির সামগ্রিক ভিত্তি দ্বীনের বিশেষ কোন এক সাইড নয়, বরং দ্বীনের সামগ্রিক সাইড। সেমতে যে আলেম বুযুর্গের মধ্যে ভক্তির পূর্ববর্ণিত ভিত্তি চতুষ্টয় পাওয়া যাবে তার প্রতিই ভক্তি স্থাপন করতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সঠিক ও সুন্দর পন্থায় কায়েম রাখুন। আমীন!

وما علينا إلا البلاغ.

প্রসঙ্গ: আল্লামা ও বিশেষজ্ঞ

আল্লামা ও বিশেষজ্ঞ শব্দ দু'টো নিয়ে কিছু কথা বলার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। ইদানিং ব্যাপকহারে শব্দ দু'টোর অপব্যবহারই এই আবশ্যকতা দেখা দেয়ার কারণ। শব্দ দু'টোর এমন অপব্যবহার শুরু হয়েছে যে, শব্দ দু'টো তার আপন মর্যাদার উঁচু স্তর থেকে অধঃপতিত হয়ে রীতিমত ধুলোয় পদদলিত হচ্ছে। শব্দ দু'টো নিয়ে সংক্ষেপে পৃথক পৃথক আলোচনা পেশ করা গেল।

প্রসঙ্গ: আল্লামা

'আল্লামা' (علامة) শব্দটি আরবী মুবালাগা-এর সীগা (অর্থাৎ আধিক্য জ্ঞাপক শব্দ)। তাও সিঙ্গল মুবালাগা নয়, ডবল মুবালাগা। কেননা শব্দটির علام (আল্লাম)- এতটুকুই মুবালাগার সীগা, আবার তার সঙ্গে যুক্ত ة (গোল তা)ও মুবালাগাহ-এর অর্থ জ্ঞাপনের জন্য।

وفي المعجم المناهي اللفظية : صيغة علام صيغة مبالغة. وفي مختار الصحاح لمحمد الرازي وجمهرة اللغة لابن دريد : رجل علامة أي : عالم جدا والهاء للمبالغة

আল্লামা শব্দটি মুবালাগার সীগা হিসেবে তার অর্থ কি হবে সে ব্যাপারে বিভিন্ন অভিধানের বর্ণনা ও উলামায়ে কেরামের ভাষ্য এরূপ- كثير

www.maktabatulabrar.com

العلم/غزير العلم (অনেক জ্ঞানী) واسع العلم (ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী/বিশাল পাণ্ডিত্বের অধিকারী) عالم كبير (বড় আলেম) عالم جدا (খুব জ্ঞানী) متبحر في العلوم (গভীর জ্ঞানের অধিকারী/জ্ঞানের সমুদ্র) এসব অভিব্যক্তিতে সিঙ্গল মুবালাগার অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং ডবল মুবালাগা হিসেবে আল্লামা শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে অনেক অনেক জ্ঞানী, অত্যন্ত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, বিরাট বড় আলেম, জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র।

আল্লামা-এর পরিচয়ে পেশকৃত এসব বর্ণনা সামনে রাখলে কোনক্রমেই একজন সাধারণ আলেমকে আল্লামা আখ্যায়িত করার অবকাশ বের হয়ে আসে না। যদিও অনেক অনেক জ্ঞানী কথাটির মধ্যকার 'অনেক' বলতে ঠিক পরিমাণ কতটা তার পরিমাপ নির্দিষ্ট করা কঠিন, এমনিভাবে বড় জ্ঞানী কথাটির মধ্যকার 'বড়' বলতে ঠিক কি সাইজের তা দৈর্ঘ প্রস্থ এঁটে বলা কঠিন, তবে 'অনেক' বলতে সাধারণ পরিমাণের চেয়ে যে বেশি তা তো স্পষ্টই। এমনিভাবে 'বড়' শব্দ থেকেও সাধারণ মাপের যে নয় তা তো স্পষ্টই। আবার এটাও স্পষ্ট যে, জ্ঞানের পরিমাণ একটু বেশি হলেই তিনি আল্লামা আখ্যায়িত হবেন না, অনেক অনেক বেশি হতে হবে। কারণ আল্লামা অর্থ অনেক জ্ঞানী নয়, অনেক অনেক জ্ঞানী। অতএব ঢালাওভাবে সর্বস্তরের সব আলেমকে আল্লামা আখ্যায়িত করার অবকাশ যে কোনক্রমেই বের হবে না তা স্পষ্ট হতে আর বাকি রইল কোথায়। এখন রয়ে গেল তাহলে আল্লামা-র পরিচয়ে উক্ত এই অনেক অনেক জ্ঞানী, অত্যন্ত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, বিরাট বড়, জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র- এ বিশেষণগুলো কোন পর্যায়ের আলেমের ব্যাপারে প্রযোজ্য? তো কেউ কেউ বলেছেন, যিনি جامع المعقول والمنقول (জামিল মা'কূল ওয়াল মানকূল) তার ব্যাপারে প্রযোজ্য। আরবী এ কথাটির ব্যাখ্যা হল যার মধ্যে কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, ফেকাহ প্রভৃতি বর্ণনাজাত শাস্ত্র তথা অহী নির্ভর শাস্ত্র এবং এ শাস্ত্রগুলো বোঝার জন্য আবশ্যক আনুষঙ্গিক বুদ্ধিজাত শাস্ত্রসমূহ- সবটার জ্ঞান রয়েছে তার ব্যাপারে আলেম আখ্যাটি প্রযোজ্য।

এই যেখানে 'আল্লামা' উপাধির মোটামুটি পরিচয়, সেখানে সম্প্রতি ছোট বড় নির্বিশেষে ঢালাওভাবে সব আলেমকেই আল্লামা উপাধিতে ভূষিত করার যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটাকে কী বলা যায়? সেটাকে বলা যায় মূর্খতা প্রসূত তৎপরতা, বিচার বিবেচনাহীন তৎপরতা। কঠিনভাবে

বললে সেটা মিথ্যাচারিতাও। কঠিনভাবে বললে সেটা প্রতারণাও বটে। কারণ এরূপ বলায় অনেক বড় না হওয়া সত্ত্বেও বহু লোক তাকে অনেক বড় ভেবে এবং সেভাবে তার কথাকে মূল্যায়ন করে প্রতারিত হবে। অতএব যারা প্রকৃত আল্লামা না হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ অনেক অনেক জ্ঞানী না হওয়া সত্ত্বেও, বিরাট বড় আলেম না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের নামের সঙ্গে আল্লামা খেতাব জুড়ে দেন, তারা মিথ্যাচারিতা ও প্রতারণার দায় এড়াতে পারেন না। তদুপরি আল্লামা না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে আল্লামা দাবি করা হচ্ছে নিজের যে গুণ-গরিমা নেই তা দাবি করা। আর হাদীছে এসেছে- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار অর্থাৎ যে নিজের জন্য দাবি করবে এমন গুণ-গরিমা প্রভৃতির কথা যা তার নেই সে আমাদের আদর্শভুক্ত নয়। সে যেন তার আসন জাহান্নামে স্থির করে নেয়। (মুসলিম)

এতক্ষণের আলোচনায় স্পষ্ট হল, আল্লামা না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে আল্লামা দাবি করার মধ্যে রয়েছে বহুবিধ পাপ। এক পাপে বহু পাপ অন্তর্ভুক্ত। অতএব তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, তাতে জড়িত হওয়া গোনাহে কাবীরা। এটা যে গোনাহে কাবীরা তা বুঝে আসে উপরোক্ত হাদীছে ব্যাক্ত জাহান্নামের ধমক থেকে। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনামতে কোন গোনাহের ব্যাপারে জাহান্নামের ধমক বা শাস্তির ধমক আসা সেই গোনাহের গোনাহে কাবীরা হওয়া বোঝায়।

যদি এমন হয় যে, কোন আলেম আল্লামা নন আর তিনি নিজে নিজেকে আল্লামা বলে পরিচয়ও দিচ্ছেন না কিন্তু অন্যরা সেরূপ বলছে আর তিনি তা থেকে বাধা না দেয়ার মাধ্যমে কার্যত তার সমর্থন করে যাচ্ছেন, তাহলেও পাপকে সমর্থন করা পাপ- এর আওতা থেকে তিনি বের হতে পারবেন না।

হাস্যকর ব্যাপার হল- ইদানিং এমন অনেককেও আল্লামা আখ্যায়িত করতে শোনা যাচ্ছে যারা যের জবর ছাড়া আরবী ইবারত শুদ্ধভাবে পড়তে পর্যন্ত সক্ষম নয়, যাদের কুরআন হাদীছ বিশুদ্ধভাবে বোঝার জন্য আবশ্যক নাহু সরফ প্রভৃতি শাস্ত্রের পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্ঞানও নেই। এ সমস্ত লোকদের কি নিজেদের এভাবে পরিচয় দিতে কিংবা তার সমর্থন করতে একটুও বাধে না? সামান্য জ্ঞান নিয়ে কীভাবে তারা

www.maktabatulabrar.com

নিজেদেরকে আল্লামা তথা বিরাট বড় আলেম বা জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র বলে পরিচয় দিতে পারেন বা সেরকম পরিচয় দেয়াকে সমর্থন করতে পারেন! এটা যে বোদ্ধাদের কাছে হাস্যকর মনে হয় তাও কি তারা আঁচ করতে পারেন না? তাদের উচিত নিজেদের কলবকে জিজ্ঞেস করা আসলেই কি তারা আল্লামা। তাদের কলব ঠিকই তাদেরকে প্রকৃত উত্তরটা দিয়ে দেবে। হাদীছের ভাষায় বলা যায়, استفت قلبك (তুমি তোমার কলবকে জিজ্ঞেস করে দেখো।)

বর্তমানে কেউ কেউ গণহারে আল্লামা উপাধি ব্যবহারের পক্ষে এরূপ একটা কথার অবতারণা করেছেন যে, একজন আলেম প্রসিদ্ধ হলেই তাকে আল্লামা বলা যায়। অর্থাৎ একজন আলেমের নাম-শোহরত হয়ে গেলেই তাকে আল্লামা উপাধি দেয়া যায়। কিন্তু এটা স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা। আল্লামা শব্দের সীগা ও ধাতুমূল এমনটা বলে না। আল্লামা শব্দের সীগা ও ধাতুমূলে জ্ঞানের আধিক্যের বিষয় রয়েছে নাম শোহরতের আধিক্যের নয়।

প্রসঙ্গ: বিশেষজ্ঞ

'আল্লামা'-এর ন্যায় 'বিশেষজ্ঞ' শব্দেরও ঢালাও প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে متخصص (মুতাখাসসিস) আর ইংরেজি প্রতিশব্দ Specialist (স্পেশ্যালিস্ট)।

ইদানিং অনেকে একটা শাস্ত্রের ছিটেফোঁটা দু'চারটে কথা শিখেই নিজেকে সেই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ (বা ইংরেজিতে স্পেশ্যালিস্ট) বলে পরিচয় দিচ্ছেন, অথচ তাদের জন্য 'বিশেষজ্ঞ' উপাধি প্রযোজ্য নয়। কেননা বিশেষজ্ঞ শব্দটি গঠিত হয়েছে 'বিশেষ' ও 'জ্ঞ' যোগে (বিশেষ+জ্ঞ=বিশেষজ্ঞ)। আর অভিধানের বর্ণনা মোতাবেক বিশেষ শব্দে আধিক্য ও অসাধারণত্বের অর্থ রয়েছে আর 'জ্ঞ' জ্ঞান অর্থ প্রদান করে। সেমতে কোন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ তিনি যিনি ঐ শাস্ত্রে অধিক ও অসাধারণ জ্ঞান রাখেন। এজন্যই অভিধানে বলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞ শব্দটি বিশেষণ, যার অর্থ সুপণ্ডিত, কোন বিষয়ে যিনি উত্তমরূপে জানেন। এখানেও লক্ষ্যণীয় শুধু পণ্ডিত বলা হয়নি বলা হয়েছে সুপণ্ডিত এবং কোন বিষয়ে যিনি জানেন বলা হয়নি উত্তমরূপে জানেন বলা হয়েছে।

অতএব একটা শাস্ত্রে সাধারণত মানুষের যতটুকু জ্ঞান থাকে তার চেয়ে অধিক জ্ঞান না থাকলে, সেই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হলে, সেই শাস্ত্র উত্তমরূপে না জানলে কাউকে সেই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে না। তাহলে কেউ একটা শাস্ত্রের ছিটেফোঁটা কিছু শিখেই কীভাবে নিজেকে সেই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করতে পারেন বা কেউ তাকে সেরূপ আখ্যায়িত করলে তিনি তা সমর্থন করতে পারেন?

পূর্বে ভুয়া আল্লামা দাবি করলে কী কী খারাবী দেখা দেয় সে পর্যায়ে যে কথাগুলো বলা হয়েছে এখানেও সেগুলো প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করা মিথ্যাচারিতা ও প্রতারণা। আর সেরূপ দাবিকে সমর্থন করে যাওয়া পাপের সমর্থন হিসেবে পাপ। তদুপরি বিশেষজ্ঞ না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বিশেষজ্ঞ দাবি করা হচ্ছে নিজের যে গুণ-গরিমা নেই তা দাবি করা, পূর্বে বর্ণিত হাদীছের আলোকে যা কঠিন পাপ।

আল্লামা ও বিশেষজ্ঞ প্রসঙ্গে এতটুকুই। এর চেয়ে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।
আল্লাহ আমাদেরকে ভারসাম্য দান করুন।

www.maktabatulabrar.com

কেউ ডক্টর: তার মানে কি তিনি সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ?

بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

যারা ডক্টরেট ডিগ্রীর ধারক তাদেরকে বলা হয় ডক্টর। আর ডক্টরেট হল বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের উঁচু মানের ডিগ্রি। কেউ বিশেষ কোন বিষয়ে গবেষণাপূর্বক পাণ্ডিত্য অর্জন করলে তাকে এই ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এই ডিগ্রীর ধারকগণ তাদের গবেষণা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হন। আরবিতে ডক্টরেটকে বলা হয় তাখাসসুস (تخصص) তথা বিশেষজ্ঞ হওয়া, আর যিনি তাখাসসুস বা ডক্টরেট করেন তাকে বলা হয় মুতাখাসসিস (متخصص) তথা বিশেষজ্ঞ।

লক্ষ্যণীয় যে, যিনি যে বিষয়ে ডক্টরেট বা তাখাসসুস করেন অর্থাৎ যে বিষয়ে গবেষণা করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তিনি সে বিষয়েই পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হন, অন্য বিষয়ে নয়। এ কথা নয় যে, কেউ এক বিষয়ে ডক্টরেট করলেই তিনি সব বিষয়ে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে

বিবেচিত হবেন। যেমন ধরুন কেউ হাদীছ শাস্ত্রে ডক্টরেট করলেন তাহলে তিনি হাদীছ শাস্ত্রে যতটুকু হোক পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ বিবেচিত হবেন। কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে ডক্টর হয়েছেন বলে তাফসীর, ফেকাহ, ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রেও ডক্টর হয়ে গিয়েছেন তা নয়। সেসব শাস্ত্রে তিনি কাঁচাও থাকতে পারেন। অথবা মনে করুন কেউ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাহলে তিনি মাসআলা-মাসায়েলেও বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছেন তা নয়। সে ক্ষেত্রে তিনি কাঁচা থাকতে পারেন। যেমন: কেউ রান্নাবান্নায় দক্ষ হলে হাল চাষ, রিক্সাচালানোতেও দক্ষ হবে তা জরুরি নয়। সাইকেল চালনায় দক্ষ হলে প্রাইভেট কার চালানোতেও দক্ষ হবে তা জরুরী নয়। কম্পিউটার ভাল চালাতে পারলে এয়ারক্রাফটও ভাল চালাতে পারবে তা জরুরী নয়। সারকথা- কেউ এক বিষয়ে দক্ষ হলে অন্য বিষয়েও দক্ষ হবে তা জরুরি নয়। অতএব কেউ এক বিষয়ে ডক্টর: তার মানে তিনি সব বিষয়ে ডক্টর বা বিশেষজ্ঞ তা নয়। বরং যে বিষয়ে তিনি ডক্টরেট করেছেন সে বিষয়েই তিনি ডক্টর অন্য বিষয়ে নয়। এটা একটা মোটা কথা যা বেশি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু আমাদের অনেকেই বিষয়টা এরকম সরলভাবে বোঝেন না বা চিন্তা করে দেখেন না। তারা এক শাস্ত্রে কেউ বিশেষজ্ঞ হলেই সব শাস্ত্রেই যেন তিনি বিশেষজ্ঞ এ হিসেবে তার সব শাস্ত্রের সব ধরনের কথা ও মতামতকে মূল্যায়ন করে থাকেন। ফলে তারা বিভ্রান্তও হন। কেননা এক শাস্ত্রে কেউ বিশেষজ্ঞ না হওয়া সত্ত্বেও সেই শাস্ত্রে তাকে বিশেষজ্ঞ ভেবে সেভাবে তার কথা ও মতামতকে মূল্যায়ন করলে বিভ্রান্তি আসতে পারে বৈ কি। উদাহরণ স্বরূপ কেউ একটা ভাষা বা ইতিহাস সম্বন্ধে ডক্টরেট করেছেন, ফেকাহ শাস্ত্রে তার ডক্টরেট করা নেই। এখন ভাষা বা ইতিহাসে ডক্টর বলে ফেকাহ শাস্ত্রেও তাকে ডক্টর মনে করে ফেকাহ সম্পর্কিত তার মতামতকে সেভাবে মূল্যায়ন করলে এবং অন্য বিজ্ঞ ফকীহের মতকে অগ্রাহ্য করে তার মতকে প্রাধান্য দিলে সেটা হবে ভুল, এমন ভুল যা বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। এমন বিভ্রান্তি আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। তার কারণ বহু মানুষ কোন একজন ডক্টরের যেকোনো সাবজেক্টের উপর বলা কথা শুনলেই মনে করছে উনি একজন ডক্টর, তাই উনি যা-ই বলবেন তা তো একজন ডক্টরেরই কথা। কিন্তু ভেবে দেখছে না তার ডক্টরেট সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টের বাইরে যে তিনি ডক্টর নন।

www.maktabatulabrar.com

যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেননি এমনিতেই বিশেষ কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাদের বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য যে, যে বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ সে বিষয়েই তিনি বিশেষজ্ঞ হওয়ার মর্যাদা পাবেন অন্য বিষয়ে নয়।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করার পদ্ধতি চালু হওয়ার আগের যুগের বেলায়ও এ আলোচনা প্রযোজ্য। আগের যুগের মনীষীদের মধ্যেও একজন কোন এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ প্রমাণিত হলে তার ফলে এটা সাব্যস্ত হবে না যে, তিনি সব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। বরং হতে পারে এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও অন্য অনেক শাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ নন। যেমন উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক ইমাম গাজালির কথা। তিনি একজন বড় মাপের মনীষী। তিনি দর্শন ও তাসাওউফ শাস্ত্রে উঁচু পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে সে রকম ছিলেন না। সেমতে দর্শন ও তাসাওউফ বিষয়ে ইমাম গাজালির কোন মতামতকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হবে হাদীছ শাস্ত্রের কোন বিষয়ে তার মতামতকে সেভাবে মূল্যায়ন করা হবে না। এখানে এটা বলার অবকাশ নেই যে, তাহলে তো ইমাম গাজালিকে খাটো করা হল। কেননা এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, একজন কোন এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ তার মানে এই নয় যে, তিনি সব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। বরং হতে পারে এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও অন্য অনেক শাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ নন। এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পর অন্য কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ না হওয়া দোষের কিছু নয়। একজন লোক সব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হবেন তা আদৌ জরুরী নয়। অতএব যে শাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ সে শাস্ত্রে তাকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হবে অন্য যে শাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ নন সে শাস্ত্রে তাকে সেভাবে মূল্যায়ন করা হবে না- এটাই যুক্তির কথা, এটাই বাস্তবতার দাবি। এটা কাউকে খাটো করার প্রয়াস নয়। যে ক্ষেত্রে যিনি যে পর্যায়ের সে ক্ষেত্রে তাকে সে পর্যায়ে রাখাই ইসলামের শিক্ষা। এক হাদীছে এসেছে-

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أَنْ نُنْزِلَ الناسَ منازِلَهم. ذكره مسلم في أول صحيحه (جـ١صـ٦) تعليقاً. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث صـ ٤٩.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন- আমরা যেন

লোকদেরকে তাদের নিজ নিজ স্থানে রাখি। (মুসলিম ও মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ) প্রত্যেককে তার নিজ নিজ স্থানে রাখা কথাটির মর্ম অনেক ব্যাপক। এর মধ্যে প্রত্যেকের শান অনুযায়ী তাকে মর্যাদা প্রদান এবং প্রত্যেকের জ্ঞান-গরিমা ও গুণাগুণ অনুসারে তাকে মূল্যায়ন সবই অন্তর্ভুক্ত।

والله أعلم.

www.maktabatulabrar.com

সমালোচনার নীতিমালা

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

সমালোচনা (ইংরেজি Criticism) প্রসঙ্গে কিছু কথা বলার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। ইদানিং ব্যাপকহারে দেখা যাচ্ছে (বিশেষভাবে ফেসবুকে) যার যেমন ইচ্ছা যে ব্যক্তি নিয়ে ইচ্ছা বা যে বিষয় নিয়ে ইচ্ছা সমালোচনা করে যাচ্ছেন। তা সমালোচনাকারীর মধ্যে সমালোচনা করার মত যোগ্যতা না-ই বা থাকল এবং সমালোচনার স্বতসিদ্ধ নীতিমালার কোন তোয়াক্কা না-ই বা করা হল। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে সমালোচনা কর্মে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বুঝি কোনোই যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে না, এ ব্যাপারে বুঝি কোন নীতিমালা নেই, যে কারও মনে চাইলেই সে যেকোনো বিষয় সম্বন্ধে বা যেকোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন ইচ্ছা সমালোচনা করতে পারে। অথচ ব্যাপারটা এমন নয়। সমালোচনার জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে। রয়েছে বেশ কিছু শর্ত, বেশ কিছু নীতি। সেই শর্তাবলি ও নীতিমালা লঙ্ঘন করে সমালোচনা কর্মে প্রবৃত্ত হলে সেরূপ সমালোচনা দ্বারা ফায়দা হয় না, নুকসান হয়। সেটা হয় পাপকর্ম। অতএব সেরূপ সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়, কাম্য নয়। কিন্তু সেরূপ সমালোচনা চলছে

অবাধে, বল্গাহীনভাবে। সমালোচনার অঙ্গনে বিরাজমান এই অবাধ ও বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতা এবং সমালোচনার আদলে এই অগ্রহণযোগ্য তৎপরতার কারণেই সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছু কথা বলার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

'সমালোচনা' শব্দটি গঠিত হয়েছে সম ও আলোচনা- দু'টো শব্দের সন্ধি যোগে (সম+আলোচনা=সমালোচনা)। 'সম' শব্দের মূল অর্থ সমান, তুল্য, যোগ্য। আর আলোচনার অর্থ তো সুবিদিত। তাই শব্দের গঠন বিবেচনায় কোন আলোচনা বাস্তবতার সমান (তথা বাস্তবসম্মত) বা যথাযোগ্য হলেই তা সমালোচনা। অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে কোন কিছুর ইতিবাচক নেতিবাচক সব ধরনের আলোচনাকেই -যদি তা বাস্তবসম্মত হয়- সমালোচনা বলা যায়। তবে শব্দটি নেতিবাচক আলোচনার ক্ষেত্রেই বহুল ব্যবহৃত। সে হিসেবেই অভিধানে সমালোচনার অর্থ লেখা হয়েছে- ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা। এ অর্থে উল্লেখিত 'প্রদর্শনপূর্বক' শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। এতে বোঝানো হয়েছে শুধু কোন কিছুর ত্রুটি-বিচ্যুতি বললেই তা যথাযথ সমালোচনা আখ্যায়িত হবে না, ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়েও দিতে হবে অর্থাৎ তার দলীল-প্রমাণ দেখিয়ে দিতে হবে। অতএব কোন ত্রুটি-বিচ্যুতিমূলক আলোচনা যদি বাস্তবসম্মত না হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য সমালোচনা নয় (বরং সেটা মিথ্যা আখ্যায়িত হবে)। এমনিভাবে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ক আলোচনায় তথা কোন সমালোচনায় যদি যথাযথ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত না হয় তাহলে সেটাও আদর্শ সমালোচনা বলে স্বীকৃতি পাবে না। তাহলে সমালোচনা শব্দের ধাতুমূলীয় অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকেই সমালোচনার দু'টো নীতি প্রতীয়মান হল। যথা: (১) সমালোচনা হতে হবে বাস্তবসম্মত। (২) সমালোচনার অনুকূলে যথাযথ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত হতে হবে।

সমালোচনাকে আরবিতে বলা হয় নক্বদ (نقد)। আরবি এ শব্দটির মূল অর্থে রয়েছে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মর্ম। নক্বদ শব্দের এই ধাতুমূলীয় অর্থ থেকেও সমালোচনার কয়েকটি নীতি প্রতীয়মান হয়- তিনটি নীতি প্রতীয়মান হয়। যথা: (১) কোন বিষয়ে সমালোচনা করার পূর্বে সে বিষয়ে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক কোন বিষয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল সে বিষয়ে সমালোচনা করা যেতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

(২) কোন বিষয়ে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সে বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। তাই যে বিষয়ের সমালোচনা হবে সমালোচনাকারির মধ্যে সে বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। (৩) এমনিভাবে কোন ব্যক্তির সমালোচনা করতে হলে তার চেয়ে বেশি বা ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নতুবা তার কথা কিম্বা কর্ম যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হবে না।

তাহলে বাংলা শব্দ 'সমালোচনা' ও তার আরবি প্রতিশব্দ 'নক্বদ' (نقد)- এ দু'টোর ধাতুমূলীয় অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে সমালোচনার মোট পাঁচটি নীতি প্রতীয়মান হল। যথা:-

১.সমালোচনা হতে হবে বাস্তবসম্মত।

২.সমালোচনার অনুকূলে যথাযথ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত হতে হবে।

৩.কোন বিষয়ে সমালোচনা করার পূর্বে সে বিষয়ে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক কোন বিষয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল সে বিষয়ে সমালোচনা করা যেতে পারে।

৪.সমালোচনাকারির মধ্যে যে বিষয় নিয়ে তিনি সমালোচনামূলক কিছু বলবেন সে বিষয় সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে এবং

৫.কোন ব্যক্তির কোন কিছু নিয়ে সমালোচনা করতে হলে তার চেয়ে বেশি, ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক যোগ্যতা থাকতে হবে।

এ তো গেল 'সমালোচনা' ও তার আরবি প্রতিশব্দ 'নক্বদ' (نقد)- শব্দ দু'টোর ধাতুমূলীয় অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে আহরিত সমালোচনার নীতিমালা (পাঁচটি নীতি) সম্বন্ধে বিবরণ। এবার সমালোচনার নীতিমালা সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছের বক্তব্য কি জানা যাক। কুরআন-হাদীছের বক্তব্য থেকেও সমালোচনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিপঞ্চ প্রমাণিত হয়। এভাবে-

(১) সমালোচনা যেহেতু কোন ব্যক্তি বা কোন বিষয় সম্বন্ধে খবরের অন্তর্ভুক্ত, আর কোন খবর বাস্তবসম্মত না হলে সেটা হয় মিথ্যা এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি, তাই সমালোচনা বাস্তবসম্মত হওয়া জরুরি। মিথ্যার সংজ্ঞাই হল বাস্তবতা বিরোধী হওয়া। আল্লামা নববী মিথ্যার সংজ্ঞায় এমনই বলেছেন-

الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو، عمدًا كان أو سهوًا، سواء كان الإخبار عن ماض أو مستقبل.

অর্থাৎ অতীত বা ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে বাস্তবতার বিপরীত খবর দেয়াই হচ্ছে মিথ্যা, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে। অতএব মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সমালোচনা বাস্তবসম্মত হওয়া চাই। সমালোচনা বাস্তবসম্মত না হলে তাতে মিথ্যা বলার পাপ হবে, গোনাহে কাবীরা হবে।

(২) সমালোচনা এক ধরনের অপবাদ। আর কারও সম্বন্ধে অপবাদ আরোপ করতে হলে অপবাদের অনুকূলে দলীল-প্রমাণ পেশ করা জরুরি। হজরত আয়েশা রা.-এর প্রতি যারা ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছিল, কুরআনে কারীমে তাদেরকে শাসিয়ে বলা হয়েছে,

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا باالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون.

অর্থাৎ, কেন এই লোকগুলো এ বিষয়ে চারজন সাক্ষী পেশ করল না? সুতরাং যখন এরা সাক্ষী পেশ করল না তখন এরাই আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী। (সূরা নূর: ১৩) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় অপবাদের অনুকূলে সাক্ষী তথা দলীল-প্রমাণ পেশ করা জরুরি। অন্যথায় তা মিথ্যার শামিল হবে। সমালোচনাও যেহেতু এক ধরনের অপবাদ, তাই সমালোচনার অনুকূলে যথাযথ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত হতে হবে। অন্যথায় সমালোচনাকারী আল্লাহর নিকট মিথ্যা বলার দায়ে অভিযুক্ত হবে। উল্লেখ্য, আয়াতটি যদিও ব্যভিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে নাযেল হয়েছে, তবে উসূলে ফিকহের ইস্তিমবাত সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ পদ্ধতি দালালাতুন্নস (دلالة النص)-এর ভিত্তিতে অন্যান্য অপবাদের ক্ষেত্রেও এর হুকুম প্রযোজ্য।

(৩) সমালোচনা করার পূর্বে সে বিষয়ে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.

অর্থাৎ মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে

www.maktabatulabrar.com

(যাচাই-বাছাই ছাড়া) তা-ই বর্ণনা করে দিবে। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম) অতএব কারও কোন দোষ শুনেই (বা অন্য কোনভাবে জেনেই) তার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাবে না। যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে।

(৪) সমালোচনা যদি কোন ব্যক্তির কোন বিষয় সম্বন্ধে হয় তাহলে তার বিষয় যাচাই-বাছাই করার জন্য তার চেয়ে বেশি, ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক যোগ্যতা থাকার অপিহার্যতা অতি অবশ্যই সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সামনের ৫ নম্বরে এর দলীল আসছে।

(৫) সমালোচনা হচ্ছে কোন একটা কিছুর পিছে পড়া (দোষের পিছে পড়া)। আর কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, ولا تقف ما ليس لك به علم অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার যথাযথ জ্ঞান নেই তার পিছে পড় না । (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬)

এ আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয় সমালোচনাকারির মধ্যে যে বিষয় নিয়ে তিনি সমালোচনামূলক কিছু বলবেন সে বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। ব্যক্তির সমালোচনা করতে গেলে যেহেতু সেই ব্যক্তি তার জ্ঞানের যে স্তর থেকে কিছু করেছেন বা বলেছেন সে সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে, তাই এভাবে বলা যায় কোন ব্যক্তির সমালোচনা করতে হলে তার চেয়ে বেশি, ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক যোগ্যতা থাকতে হবে। সমালোচনার বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকা জরুরি- এ ব্যাপারে হজরত আয়েশা রা. থেকে একটি স্পষ্ট উক্তি রয়েছে। জানাযা সংক্রান্ত একটি বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به. অর্থাৎ, যে ব্যাপারে লোকদের জ্ঞান নেই সে ব্যাপারে তারা সমালোচনা করতে ত্বরা করল কেন? (মুসলিম: হাদীছ নং ১০০/২২২৬)

এতক্ষণ কুরআন-হাদীছ দ্বারা সমালোচনার এমন পাঁচটি মূলনীতি সপ্রমাণিত করা হল যা সমালোচনা ও তার আরবি প্রতিশব্দ নক্বদ-এর ধাতুমূলীয় অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকেও প্রতীয়মান হয়েছিল। কুরআন-হাদীছের আলোকে সমালোচনার শর্ত ও নীতি পর্যায়ের আরও পাঁচটি বিষয় রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

(১) সমালোচনা শরয়ী পরিভাষার গীবত তথা পশ্চাতে দোষ-বদনাম করার

হুকুমভুক্ত। আর তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত গীবত হারাম তথা নিষিদ্ধ। অতএব সেই তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত সমালোচনাও হারাম তথা নিষিদ্ধ। যে তিনটি ক্ষেত্রে গীবত তথা পশ্চাতে দোষ-বদনাম বলা যায় এবং সেসব ক্ষেত্রে সমালোচনার অনুমতিও রয়েছে সে ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে (এক) কারও ভুল-ভ্রান্তি ও গোমরাহী সম্বন্ধে অন্যদেরকে সাবধান-সতর্ক করার জন্য সমালোচনা। দেশ ও জাতিকে ক্ষতি থেকে বাচাঁনোর উদ্দেশ্যে কারও সমালোচনা তথা দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ফেরআউন, কওমে আদ, কওমে ছামুদ প্রভৃতির দোষ-ত্রুটি তুলে ধরেছেন মানুষকে সাবধান-সতর্ক করার জন্য। অতএব কারও সমালোচনা তথা কারও দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য থাকা চাই মানুষকে সংশ্লিষ্ট দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে সাবধান করা। মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। কাউকে হেয় করা বা কাউকে ছোট প্রতিপন্ন করে নিজেকে বড় হিসেবে দেখানো নয়। (দুই) ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য বিচারক-এর সামনে প্রতিপক্ষের যে দোষ-বদনাম তুলে ধরার প্রয়োজন পড়ে তার অনুমতি রয়েছে। বেসরকারীভাবে নির্বাচিত বিচারকমণ্ডলি তথা পঞ্চায়েতের সামনে বা যেকোনো শালিস বিচারের সময় কোন পক্ষের যে দোষ-বদনাম বলার প্রয়োজন পড়ে তা এর অন্তর্ভুক্ত। (তিন) তাদীব তথা আদব শিক্ষা দেয়া বা শাসনের নিয়তে মুরব্বী ও গুরুজনের কাছে অধীনস্থ ও ছোটদের দোষ-বদনাম তুলে ধরা যায়। উস্তাদের কাছে তার ছাত্রদের ব্যাপারে নালিশ এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। তাদীব বা শাসনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে দেশের অপরাধীদের অবস্থা তুলে ধরাও এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

(২) সমালোচনার ভাষা হওয়া চাই ভদ্রোচিত, শালীন, মার্জিত ও ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম সমালোচনার ক্ষেত্রে অশালীন ও ভারসাম্যহীন কথা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিয়েছে। সব রকম গালিগালাজকে হারাম করেছে। অশালীন ভাষায় সমালোচনা, গালিগালাজ, মানহানিকর অভিব্যক্তি প্রতিপক্ষকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে, জেদী করে তোলে, আলেম উলামা ও ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। এরূপ সমালোচনা দ্বারা তাই ক্ষতি হয়। মনে রাখতে হবে অশ্লীল ভাষা ও গালিগালাজ ইত্যাদির প্রয়োগ দ্বারা মনের ঝাল মেটানো যায় কিন্তু তা

www.maktabatulabrar.com

দ্বারা কাউকে কাছে টানা যায় না। ইসলামের স্বার্থে সমালোচনা হলে তা এমনভাবে হওয়া চাই যেন প্রতিপক্ষও আপন হয়ে ওঠে।

বাতিল ফিরকার লোকদের ও বিধর্মীদের সমালোচনার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নীতি প্রযোজ্য। । অশালীন ভাষার ব্যবহার ও গালিগালাজ তাদের বেলায়ও নিষিদ্ধ। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.

অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্যদের ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত শত্রুতায় এসে আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে। (সূরা আনআম: ১০৮)

ছোটখাটো শাখাগত বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর মতবিরোধ থাকতে পারে, তাদের ব্যাপারে কিছু বলতে বা লিখতে গেলেও আপনাকে সমালোচনার এই মাপকাঠি অনুসরণ করে চলতে হবে। শালীন ও ভারসাম্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। মার্জিত ও মোলায়েম ভাষা ব্যবহার করতে হবে। যার সমালোচনা করবেন তার ব্যক্তি সম্মান রক্ষা করে কথা বলতে হবে। অতএব তার ব্যাপারে সে বলে- এরূপ না বলে তিনি বলেন- এরূপ বলুন। তিনি তার লোকজনের কাছে আলেম মাওলানা বা পীর দরবেশ হিসেবে পরিচিত থাকলে আপনার দৃষ্টিতে সেরূপ আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য না হলেও বলুন, মাওলানা অমুক এরূপ বলেন, বা অমুক পীর সাহেব এরূপ বলেন। এরপর আপনার যা সমালোচনা করার করুন। এভাবে আপনি তার সমালোচনা করলেও তিনি ও তার অনুসারীগণ অন্তত আপনার ভদ্রতা ও শালীনতায় মুগ্ধ না হয়ে পারবে না, যা তাদেরকে আপনার কথা মানতে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে। এর বিপরীত করলে তারা হয়তো আপনার কথা পড়েও দেখবে না এই ভেবে যে, তার মধ্যে তো শালীনতা ভদ্রতাই নেই। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে যে দাওয়াতী পত্র দিয়েছিলেন তাতে রুম সম্রাটকে 'আজিমুর রূম' তথা রূমের প্রধান বা রূমের বড় সম্মানিত ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন। যদিও ইসলামের বিচারে সে এমন নয়। কিন্তু তার লোকদের কাছে সে এমন ছিল বিধায়ই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেছিলেন। এ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই। আগেও বলেছি অশ্লীল ভাষা, গালিগালাজ ও অসম্মানমূলক অভিব্যক্তি ইত্যাদির প্রয়োগ

দ্বারা মনের ঝাল মেটানো যায় কিন্তু তা দ্বারা কাউকে কাছে টানা যায় না। ইসলামের স্বার্থে সমালোচনা হলে তা এমনভাবে হওয়া চাই যেন প্রতিপক্ষকেও কাছে টানা যায়, প্রতিপক্ষও আপন হয়ে ওঠে।

(৩) সমালোচনায় ভারসাম্য থাকা চাই। ঢালাও সমালোচনা না হওয়া চাই। প্রয়োজনে কারও দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে হলেও এমনভাবে আলোচনা না করা যেন অনুমতি হয় তার আপাদ-মস্তক সম্পূর্ণটাই দোষে ভরা, তার মধ্যে বুঝি ভাল কোন দিকই নেই। বরং তার মধ্যে বিশেষ ভাল কোন দিক উল্লেখ করার মত থাকলে তাও উল্লেখ করা চাই। যাতে তার বিশেষ ভালটি থেকে উপকার লাভ করা যায়। কোন ফিরকা বা দলের সমালোচনা করলে সেই ফিরকা বা দলের মধ্যে কেউ ভাল বা ব্যতিক্রম থাকলে তারও উল্লেখ থাকা চাই, ঢালাওভাবে সকলের সমালোচনা না হওয়া চাই। ইয়াহূদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বড় দুশমন। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে কারীমে তাদের বহু কুকীর্তির কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তাদের সমালোচনা করেছেন। সাথে সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ যারা ভাল ছিলেন তাদের প্রশংসাও করেছেন। (দ্রষ্টব্য: সূরা আলে ইমরান: ১১৩-১১৪ আয়াতদ্বয়) এমনিভাবে কুরআনে কারীমে খৃস্টানদের সমালোচনা করা হলেও হাবশার খৃস্টান -যারা ভাল ছিল- তাদের প্রশংসাও করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য: সূরা মায়িদা: ১৮২) এ থেকে ঢালাও সমালোচনা না করার নীতি প্রমাণিত হয়।

আর একটা উদাহরণ দেই। মনে করুন আপনি কোন একটা গ্রন্থের একটা দু'টো ভুল-বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছেন। অথচ সে গ্রন্থটিতে উল্লেখ করার মত বহু উপকারী ও ভাল বিষয়ও রয়েছে যেগুলো দ্বারা মানুষের প্রচুর ফায়দা হচ্ছে বা হতে পারে। তাহলে সমালোচনার বিষয়গুলো তুলে ধরার সাথে সাথে সে গ্রন্থটির ভাল দিকগুলোও ব্যক্ত করা চাই। অন্যথায় গ্রন্থটির প্রতি অবিচার করা হবে, ভারসাম্য নষ্ট হবে। গ্রন্থটির বিষয় বিশেষের সমালোচনা করতে হলেও তার উল্লেখযোগ্য ভাল দিকগুলোও বর্ণনা করা চাই, তাহলেই ভারসাম্য রক্ষা হবে, তাহলেই গ্রন্থটির প্রতি অবিচার থেকে বিরত থাকা হবে। অন্যথায় মানুষের লেখা কোন গ্রন্থই এমন নেই যা সম্পূর্ণই ভুল-বিচ্যুতি মুক্ত। এখন কোন গ্রন্থের শুধু কয়েকটা ভুল তুলে ধরে সে গ্রন্থটিকে ঢালাওভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে দেখানোর

www.maktabatulabrar.com

নীতি গ্রহণ করা হলে মানুষের লেখা সব গ্রন্থকেই অগ্রহণযোগ্য বলে দেখানো যাবে। যেমন ধরুন বুখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ শরাহ গ্রন্থ ইবনে হাজার আসকালানী রচিত ফাতহুল বারী। বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ও অনন্য শরাহ গ্রন্থ হিসেবে এবং রেফারেন্স বুক হিসেবে সকলেই এটিকে গ্রহণ করেছেন। অথচ এতে যে ভুল-বিচ্যুতি বা সমালোচনার মত কোনো বিষয় একেবারেই নেই তা নয়। আল্লামা আইনী উমদাতুল কারী গ্রন্থে ফাতহুল বারির অনেক বিষয় নিয়ে সমালোচনা করেছেন, তার বহু ভুল তুলে ধরেছেন। আরও অনেকে ফাতহুল বারির দু'চারটে ভুল ধরেছেন। এখন কেউ যদি ফাতহুল বারী গ্রন্থের ভাল ও গ্রহণযোগ্যতার দিকগুলো সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে শুধু এ রকম বিশ পঞ্চাশটা ভুল একত্র করে সেগুলোর সমালোচনা করতে গিয়ে সেগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন মনে হয় এ গ্রন্থটি তাহলে অসংখ্য ভুলে ভরা, অতএব এ গ্রন্থটি বর্জনযোগ্য, তাহলে সেটা হবে ভারসাম্যহীন সমালোচনা। সেটা হবে ফাতহুল বারির প্রতি অবিচার। তবে হাঁ কোন গ্রন্থ যদি লেখাই হয়ে থাকে কোন বাতিল মতাদর্শ প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তাহলে তার ভাল দিকগুলো তুলে ধরে কাউকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা সংগত নয়। কেননা সার্বিকভাবে সে গ্রন্থটা বিভ্রান্তিরই সহায়ক।

(৪) সমালোচনা যেন কারও প্রচার প্রসিদ্ধির কারণ না ঘটে। কোন বাতিলপন্থী বা ভণ্ড যদি তার সীমিত পরিসরের বাইরে অপরিজ্ঞাত থাকে, তার ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে যদি সমাজে তেমন জানাজানি না হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে সীমিত পরিসরে তার সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু কোন বইপত্রে বা জাতীয় পর্যায়ের কোন প্ল্যাটফর্মে তাকে নিয়ে সমালোচনা করা সংগত নয়। কেননা তাতে তার প্রচার-প্রসিদ্ধি ঘটবে। আর তার প্রচার প্রসিদ্ধি ঘটা তার ভ্রান্ত মতবাদ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। কেননা বহু লোকের স্বভাব এমন আছে তারা নতুন কিছু শুনলেই তার প্রতি কৌতুহলী হয়ে ওঠে, এমনকি তার অনুসারীও হয়ে যায়। অতএব এরূপ লোকের সমালোচনা বনাম তার প্রচার-প্রসার ঘটানো থেকে বিরত থাকাই সংগত। তার সমালোচনা না করলেই তথা তার আলোচনা না ছড়ালেই বরং একসময় সে এবং তার ভ্রান্ত মতবাদ আপনা আপনি মরে যাবে। পক্ষান্তরে তার

সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা করলে সে মরা-থাকা-অবস্থা হতে জেগে উঠবে। সারকথা তার সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা হল একজন অখ্যাতকে খ্যাত করে দেয়া। আর আলোচনা-সমালোচনা থেকে বিরত থাকা হল অখ্যাতকে অখ্যাত থেকেই মরতে দেয়া। ইমাম মুসলিম রহ. মুকাদ্দামায়ে মুসলিমে এরকম একটা প্রসঙ্গে বলেছেন,

الإعراض عن القول المطرح أحرى لاماتته وإخمال ذكر قايله.

অর্থাৎ পতিত বক্তব্যের উল্লেখ থেকে বিরত থাকাই তাকে মেরে ফেলার এবং তার প্রবক্তাকে অখ্যাত রাখার অধিকতর উপযোগী পন্থা।

(৫) সমালোচনার নিয়ত ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে ইসলাহ-সংশোধন ও সতর্ককরণ। কাউকে হেয় করা বা তিরস্কার করা নয়। পূর্বে একটা প্রসঙ্গের আওতায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের সাবধান থাকা চাই এবং মনে রাখা চাই যে, কোন পাপ বা অপরাধের কারণে কাউকে হেয়-তিরস্কার করলে হেয়-তিরস্কারকারীকে আল্লাহ সেই পাপে জড়িয়ে দিতে পারেন। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে এসেছে- রসুল সাল্লাল্লাহু ইলাহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ.)

অর্থাৎ যে লোক কোন পাপের কারণে তার ভাইয়ের নিন্দা-তিরস্কার করবে সে ঐ পাপ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। এ হাদীছের সনদে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা তার অর্থ সমর্থিত হয় বিধায় ইস্তিদলালযোগ্য-

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ.

সাহাবা ও তাবিয়ী থেকেও উক্ত হাদীছের বক্তব্যের সমর্থনে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যেমন-

قَالَ إِبْرَاهِيم: إِنِّي لأرى الشَّيْء، فأكره أَن أعيبه مَخَافَة أَن أبتلى بِهِ، إِن عَبْد اللهِ، كَانَ يَقُول: إِن الْبلَاء مُوكل بالْقَوْل. (شرح السنة للبغوي).

অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ, বলেছেন, আমি কোন জিনিস দেখে তার সমালোচনা করতে ভয় পাই পাছে আবার আমি না তাতে জড়িয়ে পড়ি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলতেন, মুখের

www.maktabatulabrar.com

কথায় মুসীবত চেপে বসে। (শরহুস সুন্নাহ)

সমালোচনার নীতিমালা প্রসঙ্গে এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল- ইসলামে সমালোচনার নীতিমালার মধ্যে রয়েছে বিশেষ ১০ টি বিষয়। যথা:-

১. সমালোচনা হতে হবে বাস্তবসম্মত।
২. সমালোচনার অনুকূলে যথাযথ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত হতে হবে।
৩. কোন বিষয়ে সমালোচনা করার পূর্বে সে বিষয়ে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে।
৪. সমালোচনাকারির মধ্যে যে বিষয় নিয়ে তিনি সমালোচনামূলক কিছু বলবেন সে বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।
৫. কোন ব্যক্তির সমালোচনা করতে হলে তার চেয়ে বেশি, ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক যোগ্যতা থাকতে হবে।
৬. যে তিনটি ক্ষেত্রে গীবত তথা পশ্চাতে দোষ-বদনাম বলা যায় কেবল সে তিনটি ক্ষেত্রেই সমালোচনার অনুমতি রয়েছে। অন্য ক্ষেত্রে সমালোচনা পাপকর্ম।
৭. সমালোচনার ভাষা হওয়া চাই ভদ্রোচিত, শালীন, মার্জিত ও ভারসাম্যপূর্ণ।
৮. ঢালাও সমালোচনা না হওয়া চাই।
৯. সমালোচনা যেন কারও প্রচার প্রসিদ্ধির কারণ না ঘটে।
১০. সমালোচনার নিয়ত ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে ইসলাহ সংশোধন ও সতর্ককরণ। কাউকে হেয় করা বা নিছক নিন্দা-তিরস্কার করা নয়।

আল্লাহ্ আমাদের সবকিছুকে দোরস্ত করে দেন। আমীন!

আলেমদের সমালোচনা করতে পারবেন কারা, কীভাবে?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

ইদানিং দেখা যাচ্ছে ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়াতে আলেম সমাজের খুব বেশি সমালোচনা হচ্ছে। যাদের সমালোচনা করার মত যোগ্যতা ও নৈতিকতা নেই তারাও সমালোচনা করছে, যা অনাকাঙ্খিত, অবৈধ।

আলেমণমগণ সমালোচনার উর্ধে তা বলছি না। আলেমদের কোনো দোষ-ত্রুটি নেই তা বলছি না। আলেমরা ফেরেশতা নন, তারা রক্ত মাংসের মানুষ। তাদের কিছু দোষ-ত্রুটি ভুল-বিচ্যুতি থাকতেই পারে। তার সমালোচনাও হতে পারে। কিন্তু যে কেউ চাইলেই তাদের সমালোচনায় লিপ্ত হতে পারে না। সমালোচনার জন্য কিছু যোগ্যতা ও শর্ত রয়েছে। সমালোচকদের মধ্যে সমালোচনা করার নৈতিকতাও থাকা চাই।

যিনি কোন বিষয়ে কোন আলেমের সমালোচনা করবেন তার মধ্যে ঐ সমালোচনা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে এবং তার মধ্যে যে আলেমের সমালোচনা করবেন সেই আলেমের চেয়ে বেশি বা ন্যূনতম

www.maktabatulabrar.com

তার সমপর্যায়ের একাডেমিক জ্ঞান থাকতে হবে। চুনোপুঁটি নির্বিশেষে যার মনে চায় সমালোচনায় অবতীর্ণ হতে পারবে না। এটাই যুক্তির কথা, এটাই নীতির কথা, এটাই শরীয়তের কথা। কেননা সমালোচনা হচ্ছে কোন একটা কিছুর পিছে পড়া (দোষের পিছে পড়া)। আর কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, ولا تقف ما ليس لك به علم অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার যথাযথ জ্ঞান নেই তার পিছে পড় না। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬) এ আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয় সমালোচনাকারির মধ্যে যে বিষয় নিয়ে তিনি সমালোচনামূলক কিছু বলবেন সে বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। আর ব্যক্তির সমালোচনা করতে গেলে যেহেতু সেই ব্যক্তি তার জ্ঞানের যে স্তর থেকে কিছু বলবেন বা করবেন সে সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য, তাই অনিবার্য কারণেই বলতে হবে কোন ব্যক্তির সমালোচনা করতে হলে তার চেয়ে বেশি বা ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক যোগ্যতা থাকতে হবে। কেউ এ পর্যায়ে উন্নীত না হলে তার জন্য সমালোচনা-কর্মে অবতীর্ণ হওয়ার বৈধতা নেই।

সমালোচনার বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকা জরুরি- এ ব্যাপারে হজরত আয়েশা রা, থেকে একটি স্পষ্ট উক্তি রয়েছে। জানাযা সংক্রান্ত একটি বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به অর্থাৎ, যে ব্যাপারে লোকদের জ্ঞান নেই সে ব্যাপারে তারা সমালোচনা করতে ত্বরা করল কেন? (মুসলিম: হাদীছ নং ২২২৬/১০০)

যারা আলেমদের সমালোচনা করতে উদ্যত হন তারা যেন নিজেদের জ্ঞানের পরিমাণ কতটুকু তা-ও একটু তলিয়ে দেখেন। একজন তালিবে ইলম -ফারেগ হওয়ার পূর্বে যার ইলমের যাত্রাও ভালভাবে শুরু হয় না- সে কীকরে একজন বিজ্ঞ আলেমের সমালোচনায় অবতীর্ণ হতে পারে? একজন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ -যিনি আদৌ কুরআন হাদীছের সাথে একাডেমিক সম্পর্ক রাখেন না- তিনি কীকরে বিজ্ঞ আলেমদের সমালোচনায় অবতীর্ণ হতে পারেন? যিনি যে শাস্ত্রে বিজ্ঞ নন তিনি সে শাস্ত্রের কোন বিষয় নিয়ে সমালোচনায় লিপ্ত হতে পারেন না। এটা সর্বজন স্বীকৃত নীতিকথা। কোন শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোক যখন সেই শাস্ত্র নিয়ে পন্ডিতী ফলাতে আসে তখন সেই শাস্ত্রের বিজ্ঞ লোকদের কাছে তা কীভাবে কতটা হাস্যকর হয়ে ওঠে সেটা আঁচ করার মত যোগ্যতাও ঐ অনভিজ্ঞদের থাকে না।

সারকথা হল- আপনি যদি কোন আলেমের চেয়ে বড় বা ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক জ্ঞান সম্পন্ন না হয়ে থাকেন কিংবা আপনি যদি আদৌ আলেমই না হন তাহলে আপনি তার সমালোচনা থেকে বিরত থাকুন, বিষয়টা যোগ্য আলেমদের উপর ছেড়ে দিন।

এতক্ষণ গেল আলেমদের সমালোচনা কারা করতে পারবে সে সম্বন্ধে কিছু কথা। এবার সমালোচনা কীভাবে করা হবে এবং কাদের সামনে করা হবে সে প্রসঙ্গ। আলেমদের কোন মতাদর্শ বা চিন্তাধারার কিংবা তাদের কোন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সমালোচনা হতে হবে ইলমী ও একাডেমিক ভাষায়, কুরআন হাদীছের দলীল-আদিল্লাহ ভিত্তিক। কেননা তাদের ভিন্ন মতাদর্শ বা চিন্তা-চেতনা কিংবা ধর্মীয় কর্মকাণ্ড -যা নিয়ে সমালোচনা হবে- কুরআন হাদীছের দলীল-আদিল্লাহ ভিত্তিকই হয়ে থাকবে। অতএব ইলমী ও একাডেমিক ভাষা যারা বোঝে, কুরআন ও হাদীছের দলীল-আদিল্লাহ ভিত্তিক আলোচনা বোঝার যোগ্যতা যাদের রয়েছে, কেবল তাদের সামনেই আলেমদের সমালোচনা করা যেতে পারে। সাধারণত সমালোচনামূলক গ্রন্থ বিজ্ঞজনরাই পাঠ করে থাকেন, তাই কোন আলেমের সমালোচনার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে কোন সমালোচনামূলক গ্রন্থে তা করা যেতে পারে। কিংবা সরাসরি আলেমদের সাথে আলোচনা-মজলিসে তা করা যেতে পারে। পাবলিক ফিল্ডে বিজ্ঞ-অজ্ঞ, সমঝদার-নাবুঝ সব ধরনের লোক থাকে বিধায় পাবলিক ফিল্ডে আলেমদের বিরুদ্ধে সমালোচনা চলতে পারে না। কারণ সে ফিল্ডের অনেকেই ইলমী ও একাডেমিক ভাষা এবং কুরআন হাদীছের দলীল-আদিল্লাহ ভিত্তিক আলোচনা বোঝার মত যোগ্যতা রাখে না। ইলমী ও একাডেমিক ভাষা এবং কুরআন হাদীছের দলীল-আদিল্লাহ ভিত্তিক আলোচনা বোঝার মত ধারণ ক্ষমতা তাদের নেই। এমতাবস্থায় তাদের সামনে এরূপ আলোচনা তাদের জন্য ফিতনা তথা ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। ইসলামের বিধানমতে কোন লোকের সামনেই দ্বীনের এমন কথা পেশ করা ঠিক নয় যা তার ধারণ-ক্ষমতার বাইরে। করলে সেটা তার জন্য ফিতনার কারণ হতে পারে। এজন্যই হযরত ইবনে মাসঊদ রা. বলেছেন,

ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.

অর্থাৎ, তুমি লোকদের কাছে এমন হাদীছ বয়ান করবে না যা তাদের ধারণ

www.maktabatulabrar.com

ক্ষমতার বাইরে। করলে সেটা তাদের কারও কারও জন্য ফিতনার কারণ হবে। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

অতএব ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়াতে যেহেতু প্রচুর সংখ্যক এমন সাধারণ মানুষের উপস্থিতি রয়েছে, যারা ইলমী ও একাডেমিক ভাষা বোঝে না, যারা শাস্ত্রীয় কথাবার্তা ও দলীল-আদিল্লাহ ভিত্তিক আলোচনা বোঝার মত যোগ্যতা ও ধারণ-ক্ষমতা রাখে না, তাই এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় আলেমদের মতাদর্শ বা চিন্তা-চেতনা কিংবা তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সমালোচনা চলতে পারে না। কেউ করলে তার ওপর ধর্মীয় ফিতনা সৃষ্টির দায় বর্তাবে।

রয়ে গেল যদি আলেমদের এমন কোন দোষের বিষয় হয় যা তাদের ব্যক্তিগত, যার সাথে ধর্মীয় মতাদর্শ বা চিন্তাধারার কোন সম্পর্ক নেই, অতএব তার সাথে কুরআন হাদীছের দলীল-আদিল্লাহরও কোন সম্পর্ক নেই, তেমন বিষয়গুলো নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা করা যাবে কি না? এর জবাব হল- তাহলে সেটা হবে কোন আলেমের নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। আর কারও নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে অন্যের নাক গলানো অনুচিত। তদুপরি একান্তই ব্যক্তিগত দোষের বিষয় -যার সাথে কোন ইসলামী মতাদর্শ বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক নেই, কুরআন হাদীছের কোন সম্পর্ক নেই, তেমন বিষয়- নিয়ে আলোচনার দ্বীনী কোন প্রয়োজনও নেই। এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা নিষিদ্ধ, তা সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন যেকোনো অঙ্গনে হোক নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

وما علينا إلا البلاغ.

সমালোচনা করে আলেম সমাজকে কলঙ্কিত করে দিলে কাদের লাভ?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

খুব দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়াতে ইদানিং সর্বশ্রেণীর আলেম উলামার খোলামেলা সমালোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। বিবেক বিবেচনাহীন সমালোচনা। এমনকি অশালীন অভদ্র ভাষায় সমালোচনা। নোংরা ন্যক্কারজনক সমালোচনা। এমনতর সমালোচনার কবল থেকে কোনো শ্রেণীর আলেমই রেহাই পাচ্ছেন না। ছোট থেকে বড় কাউকেই সেই সমালোচনার কবল থেকে রেহাই দেয়া হচ্ছে না। একজন আলেমের সামান্য একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি পেলেই সেটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমন জঘন্য করে দেখানো হচ্ছে যেন তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন, যেন তিনি আর আলেম আখ্যায়িত হওয়ারই যোগ্য থাকেননি। এভাবে একে একে গোটা আলেম সমাজকে সমালোচনার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এভাবে সমালোচনা করে গোটা আলেম সমাজকে পচিয়ে দেয়ার কর্মকাণ্ড চলছে। কিন্তু এভাবে সমালোচনা করে আলেম সমাজকে পচিয়ে দিলে, এভাবে আলেম সমাজকে কলঙ্কিত করে দিলে তাতে কাদের লাভ?

www.maktabatulabrar.com

ইসলামের দুশমনদের একটা কর্মপদ্ধতি হল আলেম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করে তোলা, তাদের প্রতি সাধারণ মানুষদের বীতশ্রদ্ধ করে তোলা। তাদের থিওরি হল- আলেম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করে তুলতে পারলে, তাদের প্রতি সাধারণ মানুষদের বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে পারলে সাধারণ মানুষ আর তাদের অনুসরণ করবে না। সাধারণ মানুষ আলেম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন সাধারণ মানুষদেরকে রাখালবিহীন মেষপালের মত যেদিকে ইচ্ছা ধাবিত করা যাবে। তাদেরকে গোমরাহ করা সহজ হয়ে দাঁড়াবে। এই থিওরি অনুসরণ করেই ইসলামের দুশমনরা সব সময় আলেম সমাজের দোষ খুঁজে খুঁজে সমাজে সেগুলো ফলাও করে প্রচার করার অপচেষ্টায় রত থাকে। একথার সত্যতার পক্ষে আমাদের দেশের কিছু পত্র-পত্রিকা প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট, যেগুলোর সাংবাদিকরা হন্যে হয়ে আলেমদের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে থাকে। তারপর তাদের কারও কোন দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারলে তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মনের কলুষ মিশিয়ে প্রচার করে থাকে। তাহলে ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়াতে আজ যারা আলেম সমাজের সমালোচনা করে করে তাদেরকে পচিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলছেন, তারা কি নাউযু বিল্লাহ ইসলামের দুশমনদের সেই অপচেষ্টাকেই আগে বাড়িয়ে দিচ্ছেন না?

আলেমদের কোনো দোষ-ত্রুটি নেই তা বলছি না। আলেমরা ফেরেশতা নন, তারা রক্ত মাংসের মানুষ। তাদের কিছু দোষ-ত্রুটি ভুল-বিচ্যুতি থাকতেই পারে। তাদের কারও ইলম-কালামে কিছু অপরিপক্কতা থাকতেই পারে। কিন্তু তাই বলে সামান্য ভুল-বিচ্যুতির জন্য কোন আলেমকে এবং এমনতর ধারাবাহিকতায় গোটা আলেম সমাজকে একেবারে পচিয়ে দেয়া যায় না। তাহলে দুনিয়ার মানুষ অনুসরণ করার জন্য কোন আলেমই আর খুঁজে পাবে না। মনে রাখতে হবে মানুষকে দ্বীনী গাইড দেয়ার জন্য কখনও আসমান থেকে সরাসরি ফেরেশতা অবতরণ করবেন না। এই রক্ত মাংসের আলেম সমাজই এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন। অতীতেও দিয়েছেন, বর্তমানেও দিচ্ছেন, ভবিষ্যতেও দিবেন। অতএব তাদের সামান্য ভুল-বিচ্যুতি থাকলেও সেটা সহই তাদেরকে দ্বীনী গাইড মেনে নিয়ে চলা বৈ গত্যন্তর নেই। মানুষ হিসেবে তাদের সামান্য ভুল-বিচ্যুতি থাকাই স্বাভাবিক। এটাকে স্বাভাবিক মেনে নিয়েই চলতে

হবে। অন্যথায় দ্বীনী গাইড হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ফেরেশতা চরিত্র আলেম খুঁজতে খুঁজতে (নাউযু বিল্লাহ) বিনা গাইডেই বিভ্রান্ত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় ঘটতে পারে। অতএব যারা আলেমদের সমালোচনা করে তাদেরকে পচিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন তারা নিজেদের গাইডকে পচিয়ে দিচ্ছেন। তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছেন। নিজেদের দ্বীন ও দুনিয়া- উভয় জাহানের ক্ষতি করছেন। তারা আত্মঘাতী কর্মে লিপ্ত আছেন।

তবে হ্যাঁ কোন আলেমের ভুল-বিচ্যুতি যদি এমন পর্যায়ের হয় যা অন্য অনেকের গোমরাহির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কিংবা কোন নামধারী আলেম যদি এমন হয় যার আপাদ মস্তক গোমরাহ, যার ব্যাপারে মুখ না খুললেই নয়, তাহলে জাতিকে সাবধান সতর্ক করার বৃহত্তর স্বার্থে তার সমালোচনা হতে পারে বরং হতে হবে। তবে সে সমালোচনা কে বা কারা করতে পারবে, আলেমদের সমালোচনা করার যোগ্যতা কাদের রয়েছে সেটাও বিবেচনায় রাখার বিষয়। সে সম্বন্ধে "আলেমদের সমালোচনা করতে পারবেন কারা, কীভাবে?" শীর্ষক আমার একটি ব্লগে আমি দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে এতটুকু কথা তো স্পষ্ট যে, চুনোপুঁটি নির্বিশেষে যার মনে চায় সে আলেমদের সমালোচনায় অবতীর্ণ হতে পারে না। কোন আলেমের সমালোচনা করতে হলে সেই আলেমের চেয়ে বেশি বা ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক জ্ঞান থাকতে হবে। সমালোচনা করায় নৈতিক অধিকারও থাকতে হবে। এটাই যুক্তির কথা, এটাই নীতির কথা, এটাই শরীয়তের কথা।

যাদের মধ্যে সেই আলেমের চেয়ে বেশি বা ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক জ্ঞান নেই, সমালোচনা তাদের করণীয় বিষয় নয়, তাদের করণীয় বিষয় হল শুধু তিনটি। যথা:

১. তারা সেই আলমের ভুল-বিচ্যুতি গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকবে।

২. তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করবে না। বরং তার অন্য ভাল কথাগুলো গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

৩. তার ইসলাহের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবে।

ইসলামে এমন শিক্ষাই প্রদান করা হয়েছে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এক দীর্ঘ সহীহ রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.-এর দু'টো কথা এসেছে। (এক) احذركم زيغة الحكيم অর্থাৎ, আলেমের

www.maktabatulabrar.com

ভুল-বিচ্যুতি থেকে আমি তোমাদেরকে সাবধান করছি। (তাদের ভুল-বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাকবে।) (দুই) ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلق الحق اذا سمعته অর্থাৎ, এই ভুল-বিচ্যুতি যেন তোমাকে তার থেকে ঘুরিয়ে না দেয়। হতে পারে সে তার ভুল-বিচ্যুতি থেকে ফিরে আসবে। (অন্য রেওয়ায়েতে আছে- তাই তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকবে।) তাকে (অন্য) হক কথা বলতে শুনলে তা গ্রহণ করবে । (সুনানে আবূ দাউদ: ৪৬১৩) এ গেল রেওয়ায়েতে বর্ণিত এ সম্পর্কিত খাস দু'টো কথা। আর প্রত্যেকের ভুল-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্যই দুআ করা চাই। সেমতে মুকতাদায়ে কওম আলেমদের কোন ভুল-বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধনের জন্যও দুআ করা চাই। এ-ই হল মোট তিনটি করণীয় বিষয়, সাধারণ মানুষ শুধু যেগুলোর উপর ক্ষান্ত করবে। বাকি যা করার যোগ্য আলেমগণই তা করবেন। আলেমদের কাজ আলেমদেরই করতে দিন। এতেই ধর্মীয় অঙ্গনের শৃঙ্খলা রক্ষা পাবে। ধর্মীয় অঙ্গনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা সামাজিক ও জাগতিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেয়ে বড় অপরাধ।

সবশেষে একটি হাদীছ উল্লেখ করে আলোচনা সমাপ্ত করছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. – صحيح الجامع برقم ٥٤٤٣ وقال حسن.

অর্থাৎ, যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করল না, আমাদের ছোটদেরকে মায়া-দয়া করল না এবং আমাদের আলেমদের হক চিনলো না সে আমাদের লোক নয়। (সহীহুল জামে': হাদীছ নং ৫৪৪৩)

আল্লাহ্ আমাদেরকে সবক্ষেত্রে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

উলামায়ে কেরাম সামনে না থাকলে কি আদব রক্ষার গুরুত্ব কমে যায়?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد– فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

'আদব' শব্দের অর্থ হচ্ছে- শিষ্টাচার, ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা ও সম্মান প্রদর্শন। শরীয়ত পিতা-মাতা, উস্তাদ, গুরুজন অনেকের সঙ্গেই আদব-তাজীমের বিধান রেখেছে। উলামায়ে কেরামের সঙ্গে আদব-তাজীম রক্ষার বিষয়টিও তার অন্তর্ভুক্ত। উলামায়ে কেরামের আদব-তাজীমের বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ- এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। ইমাম ইবনে হাযম রহ. বলেছেন, اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي অর্থাৎ, কুরআনের ধারক-বাহক, ইসলামের ধারক-বাহক ও নবীর সম্মান রক্ষা করতে হবে- এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

উলামায়ে কেরামের আদব-সম্মান রক্ষার গুরুত্ব প্রমাণে কুরআনে কারীমের তিনটি আয়াত এবং একটি সহীহ হাদীছ পেশ করছি।
আয়াত তিনটি এই-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের সামনে কোনো বিষয়ে (কথায় বা কাজে) আগে বেড়ো না। (সূরা হুজুরাত: ১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না। এবং তোমাদের একজন অপরজনের সঙ্গে জোরে কথা বলার ন্যায় তাঁর সঙ্গে জোরে কথা বলো না। (সূরা হুজুরাত: ২)

এ দুই আয়াতে কোন কথায় বা কাজে নবীকে ওভারটেক না করা, নবীর সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা না বলা ইত্যাদি বলার মাধ্যমে মূলত নবীর সঙ্গে আদব রক্ষা করার নির্দেশই বর্ণিত হয়েছে। আর উলামায়ে কেরাম যেহেতু নবীর ওয়ারিছ, তাই তাদের সঙ্গে আদব রক্ষাও এ নির্দেশেরই অনুবর্তী।

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

অর্থাৎ, আর কেউ আল্লাহর শাআইরকে সম্মান করলে এটা তো (তার) অন্তরস্থ তাকওয়া থেকেই অর্জিত। (সূরা হজ্জ: ৩২)

এ আয়াতে শাআইর তথা দ্বীনে ইসলামের আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে খোদাভীতি ও তাকওয়ার লক্ষণ সাব্যস্ত করে এর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য- যা কিছুই ইসলাম ও মুসলমানিত্বের আলামত তথা পরিচয়-চিহ্ন তা সবই শাআইর-এর অন্তর্ভুক্ত। একে শাআইরুল্লাহ, শাআইরু দ্বীনিল্লাহ, শাআইরে ইসলাম বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। বাইতুল্লাহ, মসজিদ, আযান, নামায, হজ্জের স্থানসমূহ, কুরআন-কিতাব, দাড়ি, টুপি, আলেম-উলামা সবই শাআইর-এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো দ্বীনে ইসলামকেই বুঝায়, এগুলো দ্বীনে ইসলামেরই পরিচয়-চিহ্ন। সেমতে এগুলো শাআইরে ইসলাম। আয়াতে এইসব শাআইর-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ হাদীছটি এই-

عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: «لَيسَ مِنا مَن لَم يجل كَبيرنا، وَيرحَم صَغِيرَنَا، وَيعرِف لعالِمنا حَقه»(صحيح الجامع برقم٥٤٤٣ وقال حسن)

অর্থাৎ, হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করল না, আমাদের ছোটদেরকে মায়া-দয়া করল না এবং আমাদের আলেমদের হক চিনলো না সে আমাদের লোক নয়। (সহীহুল জামে': হাদীছ নং ৫৪৪৩)

উলামায়ে কেরামের আদব তাজীম রক্ষার গুরুত্ব এমন পর্যায়ের যে, বিষয়টি আকায়েদের কিতাবে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইমাম তাহাবী রহ. বলেছেন,

لا يُذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. (العقيدة الطحاوية)

অর্থাৎ, তাদের (উলামা, ফুকাহা ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের) ভাল দিকগুলোরই আলোচনা করা হবে। যে তাদের মন্দ নিয়ে আলোচনা করল সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। (আল-আকীদাতুত্তাহাবিয়্যাহ)

উলামায়ে কেরামের আদব-তাজীম রক্ষার দ্বীনী গুরুত্ব কেন এত বেশি তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও রয়েছে। সংক্ষেপে কথা হল- মনের মধ্যে উলামায়ে কেরামের ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকার ফলেই তাদের প্রতি আদব তাজীম থাকে না। আর তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকলে তাদের থেকে দ্বীন শেখা বন্ধ হয়ে যায়। আর সেটা তার বরবাদির সূচনা করে। সম্ভবত এটা সামনে রেখেই হযরত ইবনুল মুবারক রহ. বলেছেন,

من استخفّ بالعلماء ذهبت آخرتُهُ. (سير أعلام النبلاء)

অর্থাৎ, যে উলামায়ে কেরামের অবজ্ঞা করল, তার আখেরাত বরবাদ হল। (সিয়ারু আ'লামিন্নুবালা)

এই যে উলামায়ে কেরামের আদব-তাজীম গুরুত্বপূর্ণ, এটা উলামায়ে কেরাম সামনে থাকলে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তারা সামনে না থাকলেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। এমন নয় যে, উলামায়ে কেরাম সামনে না থাকলে তাদের আদব-তাজীম রক্ষার গুরুত্ব থাকে না বা হ্রাস পায়। অথচ কিছু লোককে দেখা যায় তারা উস্তাদ, মুরব্বী ও উলামায়ে কেরামের সামনে থাকা অবস্থায় আদব-তাজীম রক্ষা করে চলে, কিন্তু ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে তারা আদব-তাজীমের কথা ভুলে যায়। এরূপ যারা করে তাদের মধ্যে মাদ্রাসার কিছু ফুযালা, তালাবা

www.maktabatulabrar.com

ও ধর্মপ্রাণ মানুষও রয়েছে। আফসোস! শত আফসোস!! তারাই যদি আদব-তাজীম রক্ষা না করে, তাহলে জাতি আদব-তাজীম আর কাদের থেকে শিখবে? এমনিতেই সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুজনদের আদব-তাজীমের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে তাদের অভিধান থেকে আদব তাজীম শব্দগুলো বিলুপ্ত হওয়ার পথে। কেবল মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এটিকে গুরুত্বের সঙ্গে ধরে রাখা হয়েছে। এখন সেই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের থেকেও যদি আদব-তাজীম বিদায় নেয়, তাহলে নাউযু বিল্লাহ দুনিয়া থেকে আদব-তাজীম সম্পূর্ণই বিদায় নেবে।

হে আল্লাহ্! জীবনের সব ক্ষেত্রে আমাদেরকে সঠিক পন্থায় কায়েম রেখো। আমীন!

وما علينا إلا البلاغ.

প্রসঙ্গ: অমুক আলেম এটা করেন না কেন? তমুক আলেম সেটা করেন না কেন?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক পোস্টে দেখা যায় অনেক আলেমের উপর অনেকের অনেক রকমের প্রশ্ন, অভিযোগ, ক্ষোভ। অমুক আলেম রাজনীতি করেন না কেন? অমুক আলেমকে মিটিং মিছিলে দেখা যায় না কেন? অমুক আলেমকে আন্দোলনে দেখা যায় না কেন? অমুক আলেম অমুক প্রতিবাদ সভায় যোগ দিলেন না কেন? অমুক আলেম অমুক ব্যাপারে নীরব কেন? অমুক আলেম দাওয়াত ও তাবলীগে সময় লাগান না কেন? অমুক আলেম এটা করেন না কেন, তমুক আলেম সেটা করেন না কেন? ইত্যাদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ধরনের বহু অভিযোগ বা ক্ষোভ ব্যক্ত করে পোস্ট দিতে দেখা যায় অনেককে। অফলাইনেও এরূপ প্রশ্ন বা ক্ষোভ দেখা যায় না তা নয়, তবে অনলাইনে ব্যাপারটা একটু বেশি বেপরোয়া। বিজ্ঞ আলেমদের ব্যাপারেই এমনতর অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এসব অভিযোগ ও ক্ষোভ নিয়ে অনেককে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে দূরে সরে যেতেও দেখা যায়।

www.maktabatulabrar.com

বস্তুত কোন্ কাজে যোগ দেয়ার হুকুম কোন্ পর্যায়ের, কোন্ কাজে যোগ দেয়ার গুরুত্ব কতটুকু, কোন সময় কোন কাজে লিপ্ত হওয়া অধিকতর শ্রেয়, কার পক্ষে কোন কাজে যোগ দেয়া বেশি উপযোগী- এসব তত্ত্ব সামনে রেখেই বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম করণীয় নির্ধারণ করে থাকেন। কিন্তু এসব তত্ত্ব এবং তার ভিত্তিতে কী করণীয় নির্ধারণ করা চাই- এগুলো যারা ভাল করে বোঝে না, তারা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের অবস্থান বুঝে উঠতে সক্ষম হয় না। আর এই বুঝে উঠতে না পারা থেকেই তাদের মধ্যে জন্ম নেয় বিভিন্ন আলেমের অবস্থান নিয়ে নানান রকমের প্রশ্ন, অভিযোগ ও ক্ষোভ।

আমি এখানে কয়েকটা উসূলী বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা পেশ করছি। আশা করি তাতে বিভিন্ন আলেমের বিভিন্ন অবস্থান নিয়ে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয় তার অনেকটার নিরসন হয়ে যাবে, ক্ষোভ অভিযোগ প্রশমিত হবে। এ পর্যায়ে আমি ৭টা উসূলী কথা পেশ করছি।

১. সব কাজ ফরযে আইন নয় যে, সকলকে তাতে শরীক হতেই হবে। কোন কাজ ফরযে আইন হলে সকলকেই তা করতে হয়। পক্ষান্তরে কোন কাজ ফরযে আইন পর্যায়ের না হয়ে যদি ফরযে কেফায়া পর্যায়ের হয়, তাহলে সকলের তাতে শরীক হওয়ার আবশ্যকতা নেই। বরং কাজটি আঞ্জাম পায় এমন সংখ্যক লোক শরীক হয়ে গেলে অন্যদের তাতে শরীক না হলেও চলে। সে ক্ষেত্রে যারা তাতে শরীক হল না তাদের সমালোচনা বা তিরস্কার করার অবকাশ নেই এই বলে যে, তারা কেন তাতে শরীক হলেন না। কেননা, সমালোচনা তিরস্কার করলে বোঝাবে যে, সকলেরই তাতে শরীক হওয়া জরুরী ছিল। অথচ ফরযে কেফায়া কাজে সকলের শরীক হওয়া জরুরী নয়। রাজনীতির বিষয়টাও এমনই। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করা ফরযে কেফায়া। এই চেষ্টা-সাধনার অনেক সূরত হতে পারে, যার একটা সূরত হল ইসলামী রাজনীতি। এ হিসেবে ইসলামী রাজনীতি ফরযে কেফায়া ধরনের একটি কাজ। সুতরাং কোন আলেম যদি মনে করেন ফিল্ডে যারা রাজনীতি করছেন তারাই যথেষ্ট। আর এই ভেবে তিনি ফিল্ডের রাজনীতিতে যোগ না দেন, তাহলে এ নিয়ে তার সমালোচনা হতে পারে না। যেমন: জানাযার নামাজ ফরযে কেফায়া। তাই কিছু লোক দ্বারা জানাযার নামাজ আদায়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে যারা

শরীক হল না তাদের সমালোচনা করা যায় না। তবে অন্যদের দ্বারা যথেষ্টতা সম্পন্ন হচ্ছে ভেবে যারা রাজনীতিতে শরীক হলেন না তাদেরও এই শরীক না হওয়া নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো ঠিক হবে না যে, আমি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ, ফরযে কেফায়া কাজে অন্যদের দ্বারা যথেষ্টতা সম্পন্ন হলেও তাতে শরীক হওয়া উত্তম তো বটেই। আর কোন উত্তম কাজে শরীক না থাকাকে শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনা করা যায় না।

যদি কেউ বলেন, রাজনৈতিক অঙ্গনে যতজন কাজ করছেন, তাদের দ্বারা কেফায়াত তথা যথেষ্টতা সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব এ অবস্থায় অন্যদের এ থেকে দূরে থাকার অবকাশ নেই, তাহলে তার উত্তর হল- মূলত ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কাজ ফরযে কেফায়া। তা সেই কাজ প্রচলিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূরতেই হতে হবে তা জরুরী নয়। প্রচলিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূরতেও তা হতে পারে, অন্য কোন সূরতেও তা হতে পারে। যেমন কোন আলেম যদি এমন হন ক্ষমতাসীনরা যার কথাকে মূল্যায়ন করে, তাহলে তিনি ক্ষমতাসীনদের ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে সে দায়িত্ব আদায় করতে পারেন। অতএব কেউ ভিন্ন কোন প্রক্রিয়ার সূরতে যদি কাজটি সম্পন্ন করেন, তাহলে সূরত বিশেষে শরীক না হওয়ায় তার সমালোচনা হতে পারবে না। সামনে বর্ণিত ৩ নং উসূলে এ সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যা আসছে। আবার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চর্চিত রাজনীতি ফরযে কেফায়া ধরনের কাজ হলেও সেই রাজনীতির কর্মপদ্ধতি কী হওয়া চাই তা নিয়েও যোগ্য আলেমদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোন যোগ্য আলেম বিশেষ কোন এক কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে তা থেকে বিরত থাকলে তার অবকাশও রয়েছে বৈ কি। তবে কেউ কোন কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে তা থেকে বিরত থাকলেও বৃহত্তর আলেম সমাজ যে কর্মপদ্ধতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন তার অবকাশ থাকলে তার সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকা সংগত। অবকাশ নেই মনে করলে আর সমালোচনা করতে হলেও ইখতেলাফের আদাব ও সমালোচনার আদাব রক্ষা করা চাই। বিশেষত এ কারণে যে, অন্য দিকে বৃহত্তর আলেম সমাজ রয়েছেন। আর বৃহত্তর আলেম সমাজের অবস্থানকে শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করার রীতি বর্জিত হলে দ্বীনী অঙ্গনে বিচ্ছিন্ন মতবাদ প্রশ্রয় পাবে।

www.maktabatulabrar.com

অনেক আলেমের প্রচলিত রাজনীতিতে যোগ না দেয়ার পশ্চাতে আরও কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকে যা সামনে উল্লেখ করছি।

২. দ্বীনী কাজের অনেক সূরত মানসূস আলাইহি (যে ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট ভাষ্য পাওয়া যায় এমন) নয়, বরং কারও কারও ইজতিহাদ ভিত্তিক। এরূপ ক্ষেত্রে কোন যোগ্য আলেমের সেই ইজতিহাদী সূরতের ব্যাপারে ভিন্ন মতও থাকতে পারে এবং তার ভিন্ন মতের অনুকূলে দলীল-প্রমাণ তার কাছে শক্তিশালী মনে হতে পারে। এমন হলে তিনি অন্যদের ইজতিহাদী সূরত অনুযায়ী সে কাজ করবেন না, বরং যে দিকটার দলীল-প্রমাণ তার কাছে শক্তিশালী প্রতীয়মান হবে সে দিকটাই তিনি অবলম্বন করবেন। এটাই উসূলসম্মত কথা। জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে হযরত উছমান রা.-এর হত্যাকারীদের বিচার চাওয়ার যে সূরত দাঁড়িয়েছিল শেষমেষ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া- এটা ছিল কোন হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়ার একটা ইজতিহাদী সূরত। আল্লামা নববী বলেছেন, এ ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যার কাছে যে পক্ষের দলীল-প্রমাণ শক্তিশালী মনে হয়েছে, দলীলের ভিত্তিতে যে পক্ষ তার কাছে হক মনে হয়েছে তিনি সে পক্ষ অবলম্বন করেছেন। যাদের কাছে কোন পক্ষেরই দলীল শক্তিশালী মনে হয়নি তারা কোন পক্ষেই যোগ দেননি। যিনি যে পক্ষেই যোগ দিয়েছেন দলীলের ভিত্তিতেই তা করেছেন। যার কাছে কোন পক্ষেরই দলীল স্পষ্ট হয়নি তিনি কোন পক্ষেই যোগ দেননি। হযরত তাকী উছমানী হাফিজাহুল্লাহও 'ইনআমুল বারী'তে এমনই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তবে এখানে একটা কথা উল্লেখ্য, আমি এখানে মুশাজারাতে সাহাবা বা জঙ্গে জামাল ও সিফফীনের প্রসঙ্গ টেনেছি শুধু এটা দেখানোর জন্য যে, ইজতেহাদী মতভেদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষকে নিজ নিজ দলীল অনুসারে কাজ করতে হবে, যে পক্ষের কাছে যে দিকের দলীল শক্তিশালী মনে হবে সে পক্ষ সে অনুসারেই কাজ করবে- এটাই নীতি। এই নীতিটি বোঝানোর জন্যই জঙ্গে জামাল ও সিফফীনের প্রসঙ্গ টানা। অন্যথায় আমাদের মধ্যকার সব বিরোধকে জঙ্গে জামাল ও সিফফীনের বিরোধের সাথে হুবহু তুলনা করা সংগত মনে হয় না। কেননা ইজতিহাদী এখতেলাফের সময়ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে এখলাস ও লিল্লাহিয়াত, যে তাকওয়া ও তহারাত ছিল বলে আমরা বিশ্বাস রাখি,

আমাদের মধ্যে ইজতেহাদী বিরোধ লাগলে সে রকম এখলাস ও লিল্লাহিয়াত, সে রকম তাকওয়া ও তহারাত থাকে তা বলা কঠিন।

যাহোক এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়াদির টাচে আসা যাক। মনে করুন কিছু আলেম যদি কোন ধর্মীয় দাবি আদায়ের জন্য কিংবা কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য হরতাল বা অবরোধের ডাক দেন, তাহলে কোন বিজ্ঞ আলেম তাতে যোগ নাও দিতে পারেন। কারণ, কোন দাবি আদায়ের জন্য হরতাল বা অবরোধ পালন বা কোন অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য হরতাল বা অবরোধ পালন একটা ইজতিহাদী পদ্ধতি। কোন বিজ্ঞ আলেমের ইজতিহাদে এই পদ্ধতি অবৈধ প্রতীয়মানও হতে পারে এই যুক্তিতে যে, হরতাল বা অবরোধে সাধারণ মানুষের বিশেষত রোজ-আনে-রোজ-খায় গোছের লোকদের ভোগান্তি হয়, তাদের জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেকের জান মালের ক্ষতি হয় (যেটা হরতাল অবরোধের স্বাভাবিক অবস্থা)। তাদের তো কোন দোষ নেই। অতএব তাদের ক্ষতি-ডেকে-আনা হরতাল অবরোধ বৈধ হতে পারে না। হাদীছে কারও ক্ষতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا ضرر ولا ضرار. (رواه أحمد في مسنده برقم٢٨٦٧ وقال شعيب الأرنؤط: حسن.)

অর্থাৎ, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ করাও নেই অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করাও নেই। (মুসনাদে আহমদ: হাদীছ নং ২৮৬৭) অতএব এ যুক্তি ও দলীলের ভিত্তিতে কোন আলেম অন্য আলেমদের ডাকা হরতাল অবরোধের সাথে একাত্মতা পোষণ না করতে পারেন এমনকি তার বিরোধিতাও করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তার সমালোচনা করার অবকাশ নেই এই বলে যে, এমন এক ধর্মীয় ইস্যুতে কেন তিনি যোগ দিলেন না বা কেন তার বিরোধিতা করলেন।

৩. যদি এমন হয় যে, কোন একটা শরয়ী কাজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে। শরীয়ত কোন পদ্ধতি খাস করে দেয়নি। এরূপ ক্ষেত্রে কেউ যদি একটা খাস পদ্ধতির অনুসরণ না করেন বরং সে কাজটিই তিনি অন্য পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেন, তাহলে ঐ খাস পদ্ধতি কেন তিনি অবলম্বন করলেন না এ জন্য তার সমালোচনা করা যেতে পারে না। যেমন সাধ্য অনুযায়ী আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল

www.maktabatulabrar.com

মুনকার করা জরুরী। বয়ান বিবৃতির মাধ্যমে, ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে, লেখার মাধ্যমে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে বলে- বিভিন্ন পদ্ধতিতে এটা সম্পন্ন হতে পারে। সহীহ তরীকায় পরিচালিত হওয়ার শর্তে প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের জামাতের সঙ্গে জুড়েও কাজটি করা যেতে পারে। এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটা খাস পদ্ধতি অবলম্বন আবশ্যক নয়। অতএব কেউ যদি প্রচলিত তাবলীগ জামাতের সঙ্গে না জুড়ে অন্য কোন পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ তথা আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ আঞ্জাম দেন তা-ও চলবে। সে ক্ষেত্রে তার সমালোচনা চলবে না এই বলে যে, তিনি তাবলীগ জামাতে সময় লাগান না কেন। এই সমালোচনা চলবে না এ কারণে যে, আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ শুধু প্রচলিত তাবলীগ জামাতের সূরতেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্য আরও অনেক পদ্ধতিতে তা হতে পারে। তদ্রূপ মনে করুন কেউ বইপত্র লেখার কাজ না করলে এই বলে তার সমালোচনা চলবে না যে, তিনি বইপত্র লেখার কাজ করেন না কেন। কেননা আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ বইপত্র লেখার সূরতেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্য আরও অনেক পদ্ধতিতে হতে পারে। তদ্রূপ কোন আলেমের এই বলে সমালোচনা চলবে না যে, তিনি ওয়াজ-মাহফিলে ওয়াজ করেন না কেন। কেননা আম্‌র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ এই সূরতেই সীমাবদ্ধ নয়। এমনিভাবে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য লংমার্চ বা মানব বন্ধন ডাকা এমন কর্মসূচী বা পদ্ধতি যে, এই পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবেও সংশ্লিষ্ট অন্যায়ের প্রতিবাদ হতে পারে। প্রতিবাদ একমাত্র এই পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অতএব কোন আলেম যদি খাস এই পদ্ধতির প্রতিবাদে শরীক না হন বরং অন্যভাবে প্রতিবাদের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে এই খাস পদ্ধতির প্রতিবাদে শরীক না হওয়ায় তার সমালোচনা হতে পারবে না।

৪. দ্বীনের যেসব কাজ প্রত্যেককেই করতে হবে এমন নয় সেগুলোতে 'তাকসীমে আমল' তথা যোগ্যতা ও তবয়ী যওক হিসেবে কর্মবণ্টন থাকা উত্তম। সেমতে সকলকে সব কাজে না টেনে যার মধ্যে যে কাজের যোগ্যতা বেশি, যার যে কাজের প্রতি তবয়ী যওক থাকে, তাকে সেই কাজে নিয়োজিত রাখা উত্তম। তাতে কাজ ভাল হয়। যেমন:

একজন রাজনীতি ভাল বোঝেন না, রাজনীতি তার স্বভাব বিরুদ্ধ, তাকে রাজনীতিতে লাগালে তিনি রাজনীতিতে ভাল করতে পারবেন না। তার যদি পড়াশোনা গবেষণা স্বভাবসম্মত হয় তাহলে তাকে পড়াশোনা ও গবেষণায় লাগিয়ে রাখুন। এখানে তিনি ভাল করবেন। পক্ষান্তরে একজন রাজনীতি ভাল বোঝেন, এটা তার স্বভাবের অনুকূল, কিন্তু লেখাপড়া গবেষণায় তেমন নন, তাহলে তাকে রাজনীতিতে লাগিয়ে রাখুন। এ অঙ্গনে তিনি ভাল করবেন। পড়াশোনা গবেষণায় তিনি তত ভাল করবেন না। এমনিভাবে সাংগঠনিক কাজ, সমাজসেবামূলক কাজ, সমষ্টিগত তৎপরতা, ওয়াজ বয়ান প্রভৃতিতে যার যেটাতে যোগ্যতা ও তবয়ী যওক ভাল তাকে সেটাতে লাগালে তিনি তাতে ভাল করবেন। এটা বাস্তব কথা যে, সবাই সব কাজের জন্য যুৎসই নন। তাই সকলকে সব অঙ্গনে না টেনে যিনি যে অঙ্গনে যুৎসই তাকে সেই অঙ্গনে নিয়োজিত রাখাই ভাল। তবে যিনি যে অঙ্গনেই কাজ করুন অন্য সব অঙ্গনের ভাল কাজে তার সমর্থন থাকবে। এটাই হল তাকসীমে আমলের ব্যাখ্যা, যার সারকথা হল- ভাল বিষয়ের চিন্তায় সকলের ঐক্য থাকবে তবে তৎপরতা থাকবে বিশেষ বিশেষ অঙ্গনে যার যার যোগ্যতা ও তবয়ী যওক হিসেবে। সেমতে তাকসীমে আমলের নীতি মোতাবেক কেউ যদি এক অঙ্গনে তৎপর থাকেন অন্য অঙ্গনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ না নেন, তাহলে তার সমালোচনা হতে পারবে না এই বলে যে, তিনি শুধু অমুকটা নিয়ে পড়ে আছেন অমুকটা কেন করেন না।

৫. কোন কোন ইজতিমায়ী বা সাংগঠনিক কাজের জন্য, যেমন দলবদ্ধভাবে কোন আন্দোলনের জন্য, দলীয়ভাবে রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ইত্যাদি বেশ কিছু গুণাবলী থাকা আবশ্যক। অন্যথায় আন্দোলন বিক্রি হয়ে যায়, আন্দোলন মার খায়, আন্দোলনকারী সাধারণ কর্মীরা প্রতারিত হয় এবং ভবিষ্যতে সে ধরনের আন্দোলন সক্রিয় করার মত চেতনা জাগরণের পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় হয়ে থাকে। তাহলে সেরকম ইজতিমায়ী কাজ ও আন্দোলন করার চেয়ে না করাই শ্রেয়। অতএব কেউ যদি ইজতিমায়ী কাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় গুণাবলির অনুপস্থিতির কারণে এরকম নেতিবাচ্যতা লক্ষ করেন এবং তার পক্ষে সেটার প্রতিকার

www.maktabatulabrar.com

করাও সম্ভব না হয়, বরং প্রতিকার করতে গেলে ফ্যাসাদ বা দ্বীনী ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার জন্য সেই ইজতিমায়ী কাজ ও সামষ্টিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় হয়ে দাঁড়ায়। তখন তিনি ইজতিমায়ী কাজ ও সামষ্টিক আন্দোলন ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যা যতটুকু করা সম্ভব করে যাবেন। এক হাদীছ থেকে এমন শিক্ষাই পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস রা. বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিতনার (জমানার) কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন,

إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله فقمت إليه فقلت: كيف افعل يا رسول الله جعلني الله فداك؟ قال: الزَم بيتَك واملِك عليك لسانَك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٧٧٥٨ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره عليه الذهبي في التلخيص صحيح. والحديث أيضا في سنن ابي داود بإسناد صحيح برقم ٤٣٤٤ وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة برقم ٦٧٣٠ وإسناده صحيح على شرط مسلم)

অর্থাৎ, যখন দেখবে মানুষের ওয়াদা-অঙ্গীকার হ-য-ব-র-ল হয়ে গেছে, তাদের আমানতদারী-বিশ্বস্ততা হ্রাস পেয়েছে এবং তারা এমন হয়ে গেছে -তিনি এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে ঢুকিয়ে দেখালেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস রা. বলেন, তখন আমি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ বানাক (এ অবস্থা সৃষ্টি হলে) আমি কী করব? তিনি বললেন, নিজের ঘরে অবস্থান করবে, নিজের জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, যেটা হক জানো তা আঁকড়ে থাকবে, যেটা বাতিল জানো তা বর্জন করবে। এবং নিজের খাস বিষয় নিয়ে লিপ্ত থাকবে আর গণমানুষের বিষয় এড়িয়ে যাবে। (মুস্তাদরাকে হাকিম: ৭৭৫৮, আবূ দাউদ: ৪৩৪৪ ও সহীহ ইবনে হিব্বান: ৬৭৩০) হযরত যাকারিয়া রহ.ও 'আল-ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল' গ্রন্থে ইসলাহ করার ক্ষমতা না থাকলে এবং ইসলাহ করতে গেলে ফিতনা ও দ্বীনী ক্ষতির আশংকা থাকলে দল থেকে আলাদা হয়ে এবং দলের ইসলাহের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের কাজে মাশগুল থাকার পক্ষে এই হাদীছ দ্বারা ইস্তিদলাল করেছেন।

অতএব কেউ যদি ইজতিমায়ী কাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত নেতিবাচ্যতা দৃষ্টে এ হাদীছের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী ইজতিমায়ী কাজ হতে দূরে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দ্বীনী কাজ করে যেতে থাকেন, তাহলে ইজতিমায়ী কাজে শরীক না থাকার জন্য তার সমালোচনা হতে পারবে না। কারণ, তিনি হাদীছের দিক-নির্দেশনা মোতাবেকই চলছেন। তবে হাঁ যারা ইসলাহ করার ক্ষমতা রাখেন এবং যারা সব প্রতিকূলতা উৎরে কাজ এগিয়ে নেয়ার মত আশা ও হিম্মত রাখেন তারা সেভাবেই এগিয়ে যাবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যারা সেই ইজতিমায়ী কাজ থেকে বিরত থাকবেন তাদের উচিত হবে যারা আশা ও হিম্মত নিয়ে প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন, তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং তাদেরকে উৎসাহিত করা। তাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। দোষ-ত্রুটি ব্যাপক হয়ে যাওয়ার এই জমানায় কোন অঙ্গনই বা সম্পূর্ণ ফ্রেশ পাওয়া যায়। তবুও কাজ এগিয়ে নিতে হয়।

৬. শরীয়ত যদি কোন কাজের জন্য একটা খাস সময় নির্ধারণ করে থাকে, যে সময়ে সেটা না করলে পরে সেটা করার সময় থাকবে না, তাহলে সেই খাস সময়ে সেই নির্ধারিত কাজটিই করা কাম্য, যদিও সেটা করতে গেলে সেই মুহূর্তে এমন কোন কাজ বর্জিত হয়ে যায় যা তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেই মুহূর্তেই করতে হবে এমন নয়। এ উসূলটির কিছু তাফসীল করেছেন হযরত তাকী উছমানী হাফিজাহুল্লাহ 'ইনআমুল বারী' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে 'দাওয়াত ও তাবলীগ মে এক গলত ফাহমী' শিরোনামের অধীনে। একটা উদাহরণ দেই। যেমন ফজরের নামাযের পর নিজ জায়গায় বসে থেকে ইশরাকের ওয়াক্ত হলে ইশরাকের নামায পড়া একটি আমল। তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের হাসান স্তরের হাদীছ দ্বারা আমলটি প্রমাণিত। এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের আমল। একটা নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর এই আমলের সময় থাকবে না। কিন্তু এই আমল করতে গেলে ঐ সময় এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন আমল ছুটে যায় যেমন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ (যা ফরযে কেফায়া পর্যায়ের আমল হওয়ায় নফলের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ) ছুটে যায় যা এই সময়ের মধ্যেই করতে হবে এমন নয় পরেও করা যাবে। এ ক্ষেত্রে এই সময় ইশরাকের নামাযের আমলই

www.maktabatulabrar.com

শরীয়তের কাম্য। কেননা, শরীয়ত এই সময়ের জন্য এই আমলই বিধিবদ্ধ করেছে। সুতরাং এই সময় এই আমল করাই শরীয়তের তাগাদা ও কাম্য। অতএব কেউ যদি এ সময় দাওয়াত-এর আমলে লিপ্ত না হয়ে ইশরাকের নামায আদায়ে লিপ্ত থাকে, তাহলে এই বলে তার সমালোচনা করা যাবে না যে, তিনি ফরয কাজের উপর নফল কাজকে কেন প্রাধান্য দেন। আবার যারা মাশওয়ারা পূর্বক এই সময় দাওয়াত-এর কাজের নেজাম বানিয়ে নিয়েছেন এবং সে মোতাবেক এই সময় গাশত দাওয়াতে যাচ্ছেন তাদেরও সমালোচনা না করা চাই। কেননা কোন খাস ওয়াক্তের নফলের সময়ে মাশওয়ারা পূর্বক অন্য আমলের নেজাম বানানোরও অবকাশ রয়েছে। আকাবির আসলাফের তাআমুল এমনই। যেমন আমরা মাখসূস নফলের ওয়াক্তে মাশওয়ারা মোতাবেক মাদ্রাসার বিভিন্ন আমলের নেজাম রেখে থাকি।

এই ৬ নং উসূলের আর একটা উদাহরণ দেই। কেউ হজ্জ বা উমরার সফরে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে তিনি সময় সুযোগ পেলেই বেশি বেশি নফল তাওয়াফ নফল উমরায় মাশগুল হতে পারেন। আবার সময় সুযোগ পেলেই বেশি বেশি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ বা পীর মুরীদির কাজ কিংবা যিকির-আযকার তথা তাযকিয়ার কাজে মাশগুল হতে পারেন। এখন কোনটা শরীয়তের কাম্য? উসূল মোতাবেক আগের আমলগুলোই কাম্য। কারণ পরের আমলগুলো তিনি দেশে এসেও করতে পারবেন। পক্ষান্তরে আগেরগুলো দেশে আসার পর আর করতে পারবেন না। অতএব কেউ যদি হজ্জ উমরার সফরে আগের আমলগুলোই প্রাধান্য দিয়ে করেন তাহলে পরের আমলগুলোকে প্রাধান্য না দেয়ার কারণে তার সমালোচনা সংগত হবে না।

৭. সর্বশেষ একটা কথা হল অনেক সময় একজন মানুষের ব্যক্তিগত এমন মাজূরী থাকতে পারে যার ফলে তিনি অনেক কাজ করতে পারেন না। যেমন কারও হার্ট দুর্বল থাকার কারণে তিনি বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি পারেন না, কিংবা বাকপটু ও হাজির জওয়াব না হওয়ার কারণে বা নার্ভাসনেসের কারণে বাহাছ-বিতর্ক ও ডিবেট পারেন না, অথবা শারীরিক মাজূরির কারণে দৌড়ঝাপমূলক কাজ করতে পারেন না। এগুলো মাজূরী। কারও কারও তবীয়তে খালওয়াত বা নিভৃতচারিতা এত বেশি প্রবল থাকে যে, রাজনীতি ইত্যাদি ইজতিমায়ী কাজের

জালওয়াত বা কোলাহল তারা মোটেই সইতে পারেন না। এটাও যে কাজ সকলকে করতে হবেই এমন নয় সে রকম ক্ষেত্রে এক ধরনের মাজূরী গণ্য হবে বৈ কি। এমনিভাবে অনেক কাজে অনেকের শরীক না হতে পারার পেছনে এ জাতীয় আরও বহু রকমের মাজূরী থাকতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানেন অন্যরা তা নাও জানতে পারেন। তাই কাউকে কোন কাজে শরীক হতে না দেখলেই সেজন্য তার সমালোচনা করা সংগত নয়, কারণ তার কোন ন্যায়সংগত মাজূরীও থাকতে পারে।

এ পর্যন্ত ৭টি উসূলী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হল। আশা করি এই ৭টি উসূলী বিষয় সামনে রাখলে বিভিন্ন আলেমের বিভিন্ন অবস্থান নিয়ে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয় তার অনেকটার নিরসন হয়ে যাবে এবং অমুক আলেম এটা করেন না কেন, তমুক আলেম সেটা করেন না কেন ইত্যাদি অভিযোগ ও ক্ষোভ হ্রাস পাবে।

এরপরও বিশেষ কোন ব্যাপারে কোন বিজ্ঞ আলেমের অবস্থান পরিষ্কার না হলে এবং তা জানার নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে সে ব্যাপারে উক্ত আলেমের কাছে মুহাযযাব তরীকায় মুরাজাআত করে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু মুক্তাদায়ে কওম বিজ্ঞ কোন আলেমের ব্যাপারে ফেসবুক প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন মেরে দিয়ে পোস্ট ছাড়া যে, উনি এই করেন না কেন সেই করেন না কেন- এটা আদৌ সেই মুহাযযাব তরীকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

www.maktabatulabrar.com

সমালোচনার ভাষা কেমন হওয়া উচিত

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

কারও অন্যায় কাজ বা অন্যায় কথা কিংবা অন্যায় ধ্যান-ধারণার সমালোচনা করার বিধান যেমন শরীয়তে রয়েছে, তেমনি সমালোচনার ভাষা কেমন হবে তার বিধানও শরীয়তে রয়েছে।

শরীয়তের বিধান অনুসারে সমালোচনার ভাষা হওয়া চাই ভদ্রোচিত, শালীন, মার্জিত ও ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম সমালোচনার ক্ষেত্রে অশালীন ও ভারসাম্যহীন কথা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিয়েছে। সব রকম গালিগালাজকে হারাম করেছে।

অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইদানিং ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সাধারণ মানুষ দ্বারা তো বটেই ইসলামের অনুসরণীয় কিছু ব্যক্তি দ্বারাও মারাত্মকভাবে এ বিধান লংঘিত হচ্ছে। তালাবা ও উলামা পরিচয়ের কিছু ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে তারা প্রতিপক্ষের ব্যাপারে অভদ্রোচিত, অশালীন ও অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করছেন। এমনকি প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ পর্যন্ত করছেন। উলামায়ে কেরামকে নসীহত করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি তালিবে ইলমদের উদ্দেশে বলছি, তোমাদেরও জানা থাকবার কথা যে, সহীহ হাদীছের ভাষ্যমতে গালিগালাজ করা ফাসেকী। (سباب المسلم فسوق. رواه مسلم) এখন

তালাবা ও ওলামায়ে কেরাম দ্বারাও যদি এই ফাসেকী কাজ প্রকাশ্যে হয়, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারাও যদি ভদ্রতা ও শালীনতা রক্ষা না করেন, তাহলে সমাজ ভদ্রতা ও শালীনতা আর কাদের থেকে শিখবে? তালাবা ও উলামাও যদি গালিগালাজ করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ থেকে কী আশা যাবে? যারা আজকের তালিবে ইলম তাদের মনে রাখা চাই তারাই হবে ভবিষ্যত আলেম সমাজ, জাতির ভবিষ্যত কাণ্ডারী। ভবিষ্যতে জাতির জন্য তাদেরকেই কাজ করতে হবে। তারা এখন যা করবে এটাও তাদের ইতিহাস হয়ে থাকবে। ভবিষ্যত জীবনে কাজ করার সময় এই ইতিহাস তাদের সামনে টেনে আনা হবে। এখনকার অভদ্রতা ও গালিগালাজের ইতিহাস তখনকার জন্য বিব্রতকর হয়ে দাঁড়াবে, কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

মনে রাখতে হবে অশ্লীল ভাষা ও গালিগালাজ ইত্যাদির প্রয়োগ দ্বারা মনের ঝাল মেটানো যায় কিন্তু তা দ্বারা কাউকে কাছে টানা যায় না। বরং অশালীন অভদ্র ভাষায় সমালোচনা, গালিগালাজ, মানহানিকর অভিব্যক্তি প্রতিপক্ষকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে, জেদী করে তোলে, আলেম উলামা ও ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। এরূপ সমালোচনা দ্বারা তাই ক্ষতিই হয়। ইসলামের স্বার্থে সমালোচনা হলে তা এমনভাবে হওয়া চাই যেন প্রতিপক্ষও আপন হয়ে ওঠে। প্রতিপক্ষ মন্দ ভাষা ব্যবহার করলেও তার জবাব হওয়া চাই ভাল ভাষা দ্বারা। এভাবেই প্রতিপক্ষ আপন হয়ে উঠবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

অর্থাৎ, তুমি ভাল দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত করো। অতঃপর অকস্মাৎ (দেখতে পাবে যে,) তোমার ও যার মাঝে শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে যাবে যেন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরা হা-মীম-সাজদা: ৩৪)

বাতিল ফিরকার লোকদের ও বিধর্মীদের সমালোচনার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নীতি প্রযোজ্য। অশালীন ভাষার ব্যবহার ও গালিগালাজ তাদের বেলায়ও নিষিদ্ধ। অশালীন, অভদ্রতার ভাষা ব্যবহার করলে তারাও অনুরূপ করবে। গালি দিলে তারাও গালি দিবে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.

অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্যদের ডাকে তাদেরকে তোমরা

www.maktabatulabrar.com

গালি দিও না, তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত শত্রুতায় এসে আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে। (সূরা আনআম: ১০৮)

ছোটখাটো শাখাগত বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর মতবিরোধ থাকতে পারে, তাদের ব্যাপারে কিছু বলতে বা লিখতে গেলেও আপনাকে সমালোচনার এই মাপকাঠি অনুসরণ করে চলতে হবে। শালীন ও ভারসাম্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। মার্জিত ও মোলায়েম ভাষা ব্যবহার করতে হবে। যার সমালোচনা করবেন তার ব্যক্তি সম্মান রক্ষা করে কথা বলতে হবে। অতএব তার ব্যাপারে সে বলে- এরূপ না বলে তিনি বলেন- এরূপ বলুন। তিনি তার লোকজনের কাছে আলেম মাওলানা বা পীর দরবেশ হিসেবে পরিচিত থাকলে আপনার দৃষ্টিতে সেরূপ আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য না হলেও বলুন, অমুক মাওলানা সাহেব এরূপ বলেন, বা অমুক পীর সাহেব এরূপ বলেন। এরপর আপনার যা সমালোচনা করার করুন। এভাবে আপনি তার সমালোচনা করলেও তিনি ও তার অনুসারীগণ অন্তত আপনার ভদ্রতা ও শালীনতায় মুগ্ধ না হয়ে পারবে না, যা তাদেরকে আপনার কথা মানতে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে। এর বিপরীত করলে তারা হয়তো আপনার কথা পুরোটা শুনবেও না কিংবা পুরোটা পড়েও দেখবে না এই ভেবে যে, তার মধ্যে তো শালীনতা ভদ্রতাই নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে যে দাওয়াতী পত্র দিয়েছিলেন তাতে রূম সম্রাটকে 'আজিমুর রূম' (عظيم الروم) তথা রূমের প্রধান বা রূমের বড় সম্মানিত ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন। যদিও ইসলামের বিচারে সে এমন নয়। কিন্তু তার লোকদের কাছে সে এমন ছিল বিধায়ই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেছিলেন। এ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই।

আগেও বলেছি অশ্লীল ভাষা, গালিগালাজ ও অসম্মানমূলক অভিব্যক্তি ইত্যাদির প্রয়োগ দ্বারা মনের ঝাল মেটানো যায় কিন্তু তা দ্বারা কাউকে কাছে টানা যায় না। ইসলামের স্বার্থে সমালোচনা হলে তা এমনভাবে হওয়া চাই যেন প্রতিপক্ষকেও কাছে টানা যায়, প্রতিপক্ষও আপন হয়ে ওঠে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

সমালোচনার জন্য যাচাই-বাছাই চাই দলীল-প্রমাণ চাই

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

কারও ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শনপূর্বক যে আলোচনা হয় সেটাই সমালোচনা। সমালোচনায় কারও ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা দোষ নিয়ে আলোচনা হয় বিধায় সমালোচনা এক ধরনের অপবাদ। আর কারও সম্বন্ধে অপবাদ আরোপ করতে হলে অপবাদের অনুকূলে দলীল-প্রমাণ পেশ করা জরুরী। হজরত আয়েশা রা.-এর প্রতি যারা ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছিল, কুরআনে কারীমে তাদেরকে শাসিয়ে বলা হয়েছে,

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون.

অর্থাৎ, কেন এই লোকগুলো এ বিষয়ে চারজন সাক্ষী পেশ করল না? সুতরাং যখন এরা সাক্ষী পেশ করল না তখন এরাই আল্লাহর নিকট

www.maktabatulabrar.com

মিথ্যাবাদী। (সূরা নূর: ১৩) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় অপবাদের অনুকূলে সাক্ষী তথা দলীল-প্রমাণ পেশ করা জরুরী। অন্যথায় তা মিথ্যার শামিল হবে। সমালোচনাও যেহেতু এক ধরনের অপবাদ, তাই সমালোচনার অনুকূলে যথাযথ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত হতে হবে। অন্তত সমালোচনাকারির নিজের কাছে যথাযথ দলীল-প্রমাণ থাকতে হবে। অন্যথায় সে আল্লাহর নিকট মিথ্যা বলার দায়ে অভিযুক্ত হবে। উল্লেখ্য, আয়াতটি যদিও ব্যভিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে নাযেল হয়েছে, তবে উসূলে ফিকহের ইস্তিমবাত সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ফর্মুলা দালালাতুন্নস (دلالة النص)-এর ভিত্তিতে অন্যান্য অপবাদের ক্ষেত্রেও এর হুকুম প্রযোজ্য।

যে বিষয়ে কেউ সমালোচনা করতে চান সমালোচনা করার পূর্বে সে বিষয়ে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.

অর্থাৎ মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে (যাচাই-বাছাই ছাড়া) তা-ই বর্ণনা করে দিবে। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম) অতএব কারও কোন দোষ শুনেই (বা অন্য কোনভাবে জেনেই) তার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধিবদ্ধ নয়। যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে।

সমালোচনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দু'টো বিষয় তথা দলীল-প্রমাণ থাকা ও যাচাই-বাছাই করে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। মিথ্যা ও অপবাদের কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। অথচ দেখা যায় আমরা অনেকেই কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই, যথাযথ দলীল-প্রমাণ ছাড়াই অন্যের উপর নানান ধরনের অপবাদ চালিয়ে দেই। কিছু অপবাদ আছে গদবাধা, অবলীলায় যেগুলো আমরা একে অন্যের উপর চাপিয়ে থাকি। যেমন: উনি অমুকের দালাল, অমুকের এজেন্ট, অমুকের পা চাটা গোলাম, অমুক থেকে মাল-পানি খেয়েছেন, অমুকের কাছে মাথা বিক্রি করে দিয়েছেন, উনার কথা ষড়যন্ত্রমূলক, উনি বাতিল, ভণ্ড ইত্যাদি। যারা অন্য কারও প্রতি এ জাতীয় অপবাদ আরোপ করে থাকেন তাদের কাছে কি এগুলোর সপক্ষে উপযুক্ত দলীল থাকে? তারা কি যথাযথভাবে এগুলো যাচাই করে নেন?

অধিকাংশের বেলায় উত্তর হবে 'না'। তবে কি তারা এভাবে অপবাদ আরোপ করাকে গোনাহই মনে করেন না? তাহলে তো তা আরও মারাত্মক গোনাহ হয়ে দাঁড়াবে।

আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন। আমীন!

وما علينا إلا البلاغ.

www.maktabatulabrar.com

সোশ্যাল মিডিয়া গভীর ইলমী তাহকীকের জায়গা নয়

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত, আলেম গর আলেম, বুঝমান না-বুঝ সব ধরনের লোকের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। বিশেষত ধর্মীয় জ্ঞানের বিচারে না-বুঝ বা অল্প-বুঝ লোকের সংখ্যা এখানে প্রচুর বলা যায়। এ কারণে এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্বীনী আলোচনা অবশ্যই সাদামাটা ধরনের কিংবা বেশির থেকে বেশি মধ্যম ধরনের ইলমী আলোচনার মধ্যে সীমিত থাকা চাই। এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় গভীর ইলমী তাহকীকী আলোচনা কিংবা জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা সমীচীন নয়। কারণ সেরূপ আলোচনা অনেকের ধারণ ক্ষমতার বাইরে হওয়ায় তাদের জন্য ভুল বোঝাবুঝি তথা বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.

অর্থাৎ, তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন হাদীছ বয়ান করো যা তাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে, তাহলে সেটা তাদের কতকের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

যেসব কথা দ্বারা কম-ধারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে সেগুলো তাদের সামনে বর্ণনা করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও নিষেধ করেছেন। হাদীছে এসেছে- একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.-এর সামনে বললেন,

ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال : يا رسول الله! أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال : إذا يتكلوا.

অর্থাৎ, যে কোন বান্দা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। (এ কথা শুনে) হযরত মুআয রা. বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদেরকে এটা জানিয়ে দিব না, তাহলে তারা খুশি হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে (আমল ত্যাগ করে) বসে থাকবে। (মুসলিম শরীফ: হাদীছ নং ৫৩)

যারা দ্বীনী জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বোঝেন যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর সাক্ষ্য দিলে জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে- এর অর্থ এই নয় যে, তাহলে আমলের কোন প্রয়োজন নেই, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য শুধু উপরোক্ত সাক্ষ্যই যথেষ্ট। বরং এ কথা দ্বারা কালেমা তথা ঈমানের শক্তি বোঝানো হয়েছে বা জাহান্নামে চিরস্থায়ী না হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে, যা কিছু দিনের জন্য প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করার নিমিত্তে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়াকে নিশ্চিত করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ -যারা ইসলামী জ্ঞানে পরিপক্ক নয় এসব ব্যাখ্যা নাও বুঝতে পারে। তারা এ হাদীছ-এর বাহ্যিক ও স্থূল অর্থ থেকে আমল ছেড়ে দেয়ার অবকাশ বুঝে নিতে পারে, যা মূলত বিভ্রান্তি। তাই তাদের সামনে এ কথা বর্ণনা করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তাদেরকে সম্ভাব্য বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্যই তাদের সামনে এরূপ কথা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ হাদীছ দ্বারা প্রথমত প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ মানুষের সামনে রুখসুতের হাদীছ (অর্থাৎ যে হাদীছের বাহ্যিক ও স্থূল অর্থ থেকে আমল বর্জনের অবকাশ বুঝে আসে।) বয়ান করা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত এ হাদীছ-এর দালালাতুন্নস- এর ভিত্তিতে আরও ব্যাপকভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে,

www.maktabatulabrar.com

যতকিছু বর্ণনা দ্বারা সাধারণ মানুষের ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে, সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে বর্ণনা করা যাবে না। অতএব সাধারণ মানুষের সামনে গভীর ইলমী তাহকীকী আলোচনা কিংবা জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা করাও সমীচীন নয়। কেননা তাদের ইসলামী জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতা কম থাকায় তারা গভীর ইলমী তাহকীকী কথার অনেক কিছু সঠিকভাবে বুঝতে না পারার ফলে ভুল বোঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়তে পারে।

ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় যেহেতু প্রচুর সাধারণ মানুষের বিচরণ রয়েছে যারা ইসলামী জ্ঞানে পরিপক্ক নয়, তাই এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় গভীর ইলমী তাহকীকী আলোচনা কিংবা জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে বিরত থাকা চাই।

বিষয়টা খেয়াল না করে কেউ কেউ এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামী আকায়েদের জটিল বিষয়াদি নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হন- আল্লাহর যাত ও সিফাতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো নিয়ে তাফসীলী আলোচনা করেন, এটা ঠিক নয়। সাধারণ মানুষের জন্য এগুলো জানা জরুরীও নয় যে, তাদেরকে জানানোর জন্য এগুলো নিয়ে আলোচনার আবশ্যকতা রয়েছে। আওয়াম তথা সাধারণ মানুষদের জন্য জরূরিয়্যাতে দ্বীনের উপর ইজমালী ঈমানই যথেষ্ট। 'জরূরিয়্যাতে দ্বীন' বলতে বোঝায় দ্বীনের মোটামোটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যা আওয়াম খাওয়াস নির্বিশেষে সকলের কাছে সুবিদিত।

কেউ কেউ এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় জটিল দালীলিক মতবিরোধপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হন, এটাও ঠিক নয়। সাধারণ মানুষ দলীল আদিল্লাহ-র সিহহাত দা'ফ, উজূহে ইস্তিদলাল, উজূহে তারজীহ- এসবের কী বোঝে? আর এগুলো না বুঝলে তো দলীলের কার্যকারিতা ও কারিশমা কিছুই বুঝা হয় না।

কেউ কেউ এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় তাসাওউফের তাত্ত্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে প্রবৃত্ত হন। কোন কোন বক্তা পাবলিক মাহফিলে এ জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এভাবে অনেকেই যে অঙ্গনে যা নিয়ে আলোচনা ঠিক নয় সে অঙ্গনে তা নিয়ে আলোচনা করে থাকেন, আর এসবের কারণে যে বহু সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়, দিকভ্রষ্ট হয়, তার প্রতি তারা লক্ষ্য রাখেন না। সকলেরই তার আলোচ্য বিষয়ের নাজুকতা নিয়ে ভেবে দেখা উচিত।

হ্যাঁ কেউ এ জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে তা করবেন কিংবা বইপত্রে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। আর বলা বাহুল্য, বইপত্র সাধারণত তারাই পাঠ করে থাকেন যারা সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝার মত ধারণ ক্ষমতা রাখেন। ফলে যারা তা বুঝার মত ধারণ ক্ষমতা রাখে না তাদের সামনে সে আলোচনা যাবেই না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া তেমন নয়। এখানে যেকোনো আলোচনা ছাড়লেই অবলীলায় তা সব শ্রেণীর লোকের সামনে চলে যায়। আর সাধারণ লোকের সামনে সেগুলো গেলে তারা পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও নিছক কৌতূহল বশত সেগুলো পাঠ করে বসে। আর সেই পাঠ তাদের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এখানে সব ধরনের আলোচনা ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়।

আল্লাহ আমাদেরকে সকল বিষয় সঠিকভাবে বুঝার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وما علينا إلا البلاغ.

www.maktabatulabrar.com

সব বাতিল-ভণ্ডের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় আনতে নেই

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد

বাতিল-ভণ্ডের সমালোচনা হওয়া জরূরী। যাতে সাধারণ মানুষ -যারা সেই বাতিল-ভণ্ডদের সম্বন্ধে অবগত নয় তারা- সেই বাতিল-ভণ্ডদের সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং তাদের খপ্পর থেকে নিজেদের ঈমান আমল রক্ষা করতে পারে। এ অর্থে বাতিল-ভণ্ডের সমালোচনা নাহি অনিল মুনকারের অন্তর্ভুক্ত।

বাতিল-ভণ্ডের সমালোচনা হবে বাতিল-ভণ্ডের খপ্পর থেকে মানুষের ঈমান আমল রক্ষা করার জন্য, বাতিল-ভণ্ডের ফায়দা পৌঁছানোর জন্য নয়। অতএব খেয়াল রাখতে হবে এরূপ সমালোচনা যেন কোন বাতিল-ভণ্ডের প্রচার প্রসিদ্ধির কারণ না ঘটে। কোন বাতিলপন্থী বা ভণ্ড যদি তার সীমিত পরিসরের বাইরে অপরিজ্ঞাত থাকে, তার ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে যদি সমাজে তেমন জানাজানি না হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে সীমিত পরিসরে তার সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু কোন বইপত্রে বা জাতীয় পর্যায়ের কোন প্ল্যাটফর্মে যেমন- ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায়- তাকে নিয়ে কোন পোস্ট করা বা তার সমালোচনা করা সংগত নয়। কেননা তাতে ঐ বাতিল-ভণ্ডের ফায়দা হয়ে

যাবে। তাতে তার প্রচার-প্রসিদ্ধি ঘটবে। আর তার প্রচার-প্রসিদ্ধি ঘটা তার ভ্রান্ত মতবাদ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। কেননা বহু লোকের স্বভাব এমন আছে তারা নতুন কিছু শুনলেই তার প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠে, এমনকি তার অনুসারীও হয়ে যায়। অতএব এরূপ বাতিল-ভণ্ডের সমালোচনা বনাম তার প্রচার-প্রসিদ্ধি ঘটানো থেকে বিরত থাকাই সংগত। তার সমালোচনা না করলেই তথা তার আলোচনা না ছড়ালেই বরং একসময় সে এবং তার ভ্রান্ত মতবাদ আপনা আপনি মরে যাবে। পক্ষান্তরে তার সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা করলে সে মরা-থাকা-অবস্থা হতে জেগে উঠবে। সারকথা তার সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা হল একজন অখ্যাতকে খ্যাত করে দেয়া। আর আলোচনা-সমালোচনা থেকে বিরত থাকা হল অখ্যাতকে অখ্যাত থেকেই মরতে দেয়া। ইমাম মুসলিম রহ. মুকাদ্দামায়ে মুসলিমে এরকম একটা প্রসঙ্গে বলেছেন,

الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قايله.

অর্থাৎ পতিত বক্তব্যের উল্লেখ থেকে বিরত থাকাই তাকে মেরে ফেলার এবং তার প্রবক্তাকে অখ্যাত রাখার অধিকতর উপযোগী পন্থা।

কিন্তু ইদানিং ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন অনেক বাতিল-ভণ্ডের বিষয়ে বিভিন্ন পোস্ট দেখা যাচ্ছে যে বাতিল-ভণ্ডকে স্থানীয় কিছু লোক ছাড়া অন্যরা চেনে না জানে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব বাতিল-ভণ্ডদের সম্বন্ধে পোস্ট এসে যাওয়ায় তাদের প্রসিদ্ধি ঘটে যাচ্ছে, যা কাম্য নয়। তদুপরি ঐ বাতিল-ভণ্ডদের ভক্তরা তাদের পরিমণ্ডলে এসব পোস্ট দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারে যে, তাদের গুরু সাধারণ ব্যক্তি নন, সোশ্যাল মিডিয়ায় এত এত লোকের ঘুম হারাম করে দিয়েছেন!

কিছু লোক আছে যাদের কথা স্পষ্টত গোমরাহী ও গাঁজাখোরী ধরনের, তা যে গোমরাহী ও ভ্রান্ত তা বুঝতে কারো বেগ পেতে হয় না, আবার তারা অজ্ঞাত অখ্যাতও, এমন লোকের বিষয়ে পোস্ট করাও অহেতুক সময় মেধা নষ্ট করা। তদুপরি অখ্যাতকে খ্যাত করে দেয়াও বটে। যেমন কিছুদিন আগে একটা পোস্ট দেখলাম তাতে আছে- হুজুর গোছের একজন লোক বলছে, "আলেমদের কাছে গিয়ে আল্লাহকে চেনা যাবে না, কুরআন হাদীছ পড়ে আল্লাহকে চেনা যাবে না, মসজিদ মাদ্রাসায়

www.maktabatulabrar.com

গিয়ে আল্লাহকে চেনা যাবে না। আল্লাহকে চেনা যাবে আল্লাহর ওলীদের অন্তরের নূর দিয়ে।" বলুন তো এমন গর্দভের ন্যায় কথা যে লোক বলতে পারে তার সম্বন্ধে পোস্ট দিয়ে তাকে হাইলাইট করার কী প্রয়োজন? কুরআন হাদীছ তো আল্লাহকেই চেনানোর জন্য, নিজেকে মুসলমান পরিচয় দেয়ার পর সেটাকেই অস্বীকার করা গাধামী ছাড়া আর কী? এমনিভাবে বাউল ফকীরদের বিভিন্ন কথা নিয়ে পোস্ট করাও অর্থহীন। কারণ সকলেরই জানা আছে বাউল ফকীররা গাঁজাখোরী কথাবার্তাই বলে থাকে। অথচ দেখা যায় এই বাউল ফকীরদের বিভিন্ন কথাবার্তা নিয়েও অনেকে পোস্ট করে থাকেন। বস্তুত দ্বীনী কাজ অনেক সতর্কতা ও হেকমতের দাবী রাখে। জযবার সাথে হুশও রাখা চাই। এখন প্রত্যেকের হাতে মোবাইল আছে, যা দিয়ে অডিও/ভিডিও করে খুব সহজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোন পোস্ট ছেড়ে দেয়া যায় বটে। কোন কিছু পোস্ট করতে টাকা-পয়সাও ব্যয় হয় না। তাই বলে কি প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিবেচনা না করেই, লাভ ক্ষতি বিবেচনা না করেই যা মনে চায় তা পোস্ট করে দিতে হবে?

আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনী সচেতনতা দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যায় পোস্ট দেখলে যা করণীয়

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

ফেসবুক, ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকেই অনেক ধরনের পোস্ট দিয়ে থাকেন। আবার অনেকে বাছ-বিচার ছাড়া ঢালাওভাবে সে সব পোস্ট লাইক শেয়ারও করে থাকেন। কিন্তু বাছ-বিচার ছাড়া ঢালাওভাবে সব পোস্টে লাইক দেয়া বা সবটা শেয়ার করা ঠিক নয় উচিত নয়। কারণ সেগুলোর মধ্যে শরীয়তসম্মত পোস্টও থাকে শরীয়তবিরোধীও থাকে, নীতিসম্মত পোস্টও থাকে নীতিবিরোধীও থাকে, বিবেকসম্মত পোস্টও থাকে বিবেকবিরোধীও থাকে। অল্প কথায় ন্যায় ও ছওয়াবের পোস্টও থাকে, অন্যায় ও পাপের পোস্টও থাকে।

যারা আলেম রয়েছেন, সমঝদার রয়েছেন, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রয়েছেন তারা যদি অন্যায় ও পাপমূলক পোস্ট দেখলে তা লাইক শেয়ার না করে বরং প্রত্যেকে কমেন্ট করেন যে, এরকম বলা বা এগুলো প্রচার করা পাপ, আর পাপের পন্থায় ইসলামের কাজ হয় না, তাহলে এ জাতীয় পোস্ট নিরুৎসাহিত হবে, এগুলোর পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। যারা

www.maktabatulabrar.com

আলেম, সমঝদার ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন তাদের দায়িত্বও রয়েছে শরীয়তবিরোধী কাজ দেখলে জবান দ্বারা সেটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা।

যারা সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারেন না, তাঁরা গালি গালাজ মূলক পোস্ট দেখলে অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই লিখতে পারবেন যে, গালিগালাজ করা হারাম, মহা পাপ। বিরত থাকুন। কিংবা কেউ অশ্লীলতা ছড়ালে অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই লিখতে পারবেন যে, অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো পাপ। বিরত থাকুন। এতটুকুও যদি লিখতে না পারেন বা কোন কিছু লিখে তা পোস্ট করতে না জানেন, তাহলে যে কোন মন্দ পোস্ট দেখলে মনে প্রাণে তাকে ঘৃণা করুন, পোস্টকারির ইসলাহের জন্য দুআ করুন।

এভাবে আমরা শরীয়তবিরোধী, নীতিবিরোধী ও বিবেকবিরোধী তৎপরতাগুলো প্রতিহত করার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে চেষ্টা করলে ফেসবুকে বিচরণ করে ফেসবুক থেকে রকমারি তথ্য আহরণও হবে, সাথে সাথে দ্বীনী দাওয়াত ও গর্হিত তৎপরতা ইসলাহের ছওয়াবও হবে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ফেসবুক ইউটিউব: লাইক শেয়ার প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

ফেসবুক ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে 'লাইক' ও 'শেয়ার' শব্দদু'টো এখন অনেকের কাছেই পরিচিত। সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক পোস্টেই মানুষ লাইক দেয়, অনেক পোস্ট অন্যকে শেয়ার করে। লাইক দেয় অর্থাৎ সেটাকে পছন্দ করার কথা ঘোষণা দেয়, সেটার অনুকূলে মত প্রদান করে। লাইক (Like) শব্দের অর্থ পছন্দ করা, কোন কিছুর অনুকূলে মত প্রদান করা। আর কোন পোস্টকে শেয়ার করা অর্থ সেটাকে বিভক্ত করে দেয়া। অর্থাৎ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যের মধ্যে বিভক্ত তথা বিস্তৃত করে দেয়া। শেয়ার (Shear) শব্দের মূল অর্থই হচ্ছে বিভক্ত করা।

লাইক (পছন্দ) পরিভাষাটি আরবী মহব্বত (ভালবাসা)-এর কাছাকাছি। (কাছাকাছি বললাম এ কারণে যে, পছন্দ ও ভালবাসা শব্দ দু'টো কখনও কখনও সমার্থবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও কখনও কখনও ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন লাইক বা পছন্দ শব্দটি নির্বাচন ও মনোনয়ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ভালোবাসা শব্দটি সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আবার ভালবাসার মধ্যে আসক্তি ও অনুরক্ততার যে গভীর মাত্রা

www.maktabatulabrar.com

থাকে সাদামাটা পছন্দের মধ্যে সে মাত্রা থাকে না।) আর কোন কিছু শেয়ার করা শুধু ইনফরমেশন তথা অবগতির জন্যও হতে পারে আবার তাতে দাওয়াত ও তাবলীগের মনোভাবও থাকতে পারে। দ্বিতীয় অবস্থায় শেয়ার পরিভাষাটি ইসলামী পরিভাষার দাওয়াত ও তাবলীগ-এর সমার্থবোধক।

ফেসবুক ইউটিউবে লাইক শেয়ার এখন ডাল ভাত। মানে সস্তা ও সহজপ্রাপ্য। বলা যায় অনেকটা বেদামী জিনিস। যখন কোন জিনিসের ভাল-মন্দ, ইতিবাচক নেতিবাচক দিকগুলো যথাযথ বিচার না করেই তাতে অন্য অনেকের দেখাদেখি হুজুগে লাইক দেয়া হয়, শেয়ার করা হয়, তখন সে লাইক শেয়ারের দাম থাকবে কী করে? আর কোন জিনিসের ভাল-মন্দ, ইতিবাচক নেতিবাচক সব দিকগুলো যথাযথ বিচার করার ক্ষমতা ও যোগ্যতাই বা থাকে কয়জনের। লাইক শেয়ার তো হয় হুজুগে, লাইক শেয়ার তো হয় সস্তা আবেগের বশে। লাইক শেয়ার তো হয় অনুরোধ রক্ষার্থে, কারণ অনেকেই একটা কিছু পোস্ট করেই 'দয়া করে একটা লাইক দিন, শেয়ার করুন'- এভাবে লাইক শেয়ার খয়রাত চায়, তারপর অর্জিত খয়রাতের (মানে লাইক শেয়ারের) পরিমাণ বা সংখ্যা আবার অন্য কিছু অর্জন করার জন্য এপ্লাই করা হয়। আদৌ কে বা কারা লাইক দিল, শেয়ার করল তার বিচার করা হয় কি? যারা লাইক শেয়ার অর্জন করে, কীভাবে অর্জন করে- তা কি কেউ বিচার করে দেখে? তাহলে লাইক শেয়ারের দাম থাকবে কী করে? এরকম লাইক শেয়ার দিয়ে কোন কিছুর মূল্যায়ন করা হলে সেই মূল্যায়নের কী মূল্য থাকতে পারে? অথচ অনেকেই এমন লাইক শেয়ার নিয়ে গর্ব বোধ করেন যে, তার অমুক বিষয়ে এত সংখ্যক লাইক পড়েছে, এতটা শেয়ার হয়েছে! এভাবে লাইক শেয়ারের ভিত্তিতে নিজেকে বাস্তবে যতটুকু তার চেয়ে বেশি কিছু ভেবে বসেন, স্ফীত হয়ে ওঠেন। অন্যরাও কোন কিছুতে লাইক শেয়ারের পরিমাণ বেশি দেখে সেটাকে আহামরি কিছু ভাবতে শুরু করে। এটা ভেবে দেখে না যে, এই আহামরির ভিত কতটা শক্তিশালী।

এ তো গেল ফেসবুক ইউটিউবের লাইক শেয়ারের মূল্য কতটুকু সে বিষয়। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোন কিছু লাইক শেয়ারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ কি তা বিবেচনায় রাখা। ফেসবুক ইউটিউবে যারা বিভিন্ন কিছুতে লাইক দেন, বিভিন্ন কিছু শেয়ার করেন তাদের অনেকের ভাবগতি

দেখে মনে হয় এ বিষয়টিকে তারা মোটেই বিবেচনায় রাখেন না। তাই অবলীলায় এমন সবকিছুতে লাইক দিয়ে যান, অবলীলায় এমন সবকিছু শেয়ার করেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেগুলোর অনেকটা লাইক শেয়ারের যোগ্য নয়।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লাইক শেয়ারের বিষয়টা অনেক শক্ত। কেননা কোন ব্যক্তিকে লাইক দেয়া অর্থ তাকে পছন্দ করার ঘোষণা দেয়া, তাকে ভালবাসার ঘোষণা দেয়া। তার দোসর হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া। আর হাদীছে এসেছে- المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ।" অর্থাৎ, যার সঙ্গে যার ভালবাসা পরকালে সে তার সঙ্গে থাকবে। (বোখারী: ৬১৬৯ ও মুসলিম: ২৬৪০) অতএব কোন ব্যক্তিকে লাইক দেয়ার আগে ভেবে নিতে হবে সার্বিক বিবেচনায় তিনি এমন ব্যক্তি কি না যার সঙ্গে পরকালে থাকা কাম্য হতে পারে। এটা ভেবে দেখতে হবে তাকে ভালবাসার কারণে তার সঙ্গে জাহান্নামে যাওয়া না লাগে। সূরা সাফফাতের ২২-২৩ আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, (কেয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ হবে) একত্র কর অনাচারীদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং সেই উপাস্যদেরকেও তারা যাদের পূজা করত আল্লাহকে ছেড়ে। অতঃপর তাদেরকে দোযখের পথ প্রদর্শন কর। (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করেন।)

এখানে কেউ বলতে পারেন, লাইক অর্থ পছন্দ করা বা অনুকূলে মত প্রদান করা আর হাদীছে কাউকে মহব্বত করলে তথা ভালবাসলে তার সঙ্গে পরকালে থাকার কথা বলা হয়েছে, কাউকে পছন্দ করলে বা কারও অনুকূলে মত প্রদান করলে নয়। ভালবাসা আর পছন্দ করা বা অনুকূলে মত প্রদান করা- পুরোপুরি এক কথা নয়, যা পূর্বেও বলা হয়েছে। এর জওয়াব হল-মহব্বত তথা ভালবাসার যে হুকুম, পছন্দ করা বা কারও অনুকূলে যাওয়ারও সেই হুকুম। পূর্বে সূরা সাফফাতের যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে যে, "একত্র করো অনাচারীদেরকে ও তাদের দোসরদেরকে ... অতঃপর তাদেরকে দোযখের পথ প্রদর্শন কর।"- এখানে লক্ষ্য করুন কাউকে ভালবাসলে যে পরিণাম অর্থাৎ উভয়ের পরকালে একসঙ্গে থাকা, কারও দোসর হলেও সেই পরিণাম-এর কথাই বলা হয়েছে। বুঝা গেল মহব্বত ভালোবাসার যে হুকুম অন্য যেকোনো ভাবে দোসর বা জোড়া হয়ে গেলেও একই হুকুম। আর লাইক করা দ্বারাও কারও সঙ্গে জুড়ে যাওয়াই হয়, তার জোড়া বা দোসর হয়ে যাওয়াই হয়।

www.maktabatulabrar.com

তবে এখানে দুটো বিষয়ে একটু বিবরণের প্রয়োজন রয়েছে। (এক) কারও দোসর হলে যে পরকালীন পরিণামের কথা বলা হয়েছে তা কি দ্বীনী বিষয়ে দোসর হলে প্রযোজ্য নাকি পার্থিব বিষয়ে দোসর হলেও প্রযোজ্য? এর জওয়াব হল- দ্বীনী বিষয়ে দোসর হলে প্রযোজ্য, পার্থিব বিষয়ে নয়। কেননা পার্থিব বিষয়ে কাফের বে-দ্বীনের সাথেও একযোগে কাজ করা যায়। (যদি সে কাজটি অবৈধ না হয়।) যেমন কোন মুসলমান কোন কাফের মুশরিকের সঙ্গে একসাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। অতএব কোন পার্থিব বিষয়ে -যে বিষয়ের সাথে দ্বীন ঈমানের কোন টাচ নেই- কাউকে লাইক দিলে তার ক্ষেত্রে কারও দোসর হলে যে পরকালীন পরিণামের কথা বলা হয়েছে তা প্রযোজ্য হবে না। যেমন: কেউ কোন হাস্যরসমূলক কিছু দেখে তাতে লাইক দিল। কিংবা কারও জাগতিক কোন ভাল আবিষ্কার দেখে তাতে লাইক দিল, কারও উপকারী কোন প্রডাক্ট দেখে তাতে লাইক দিল। বরং উপকারী জিনিস দেখে লাইক দেয়া যদি অন্যের উপকারের নিয়তে হয় তাহলে তা শুধু বৈধই নয় বরং প্রসিদ্ধ হাদীছ إنما الأعمال بالنيات। (আমলের ধর্তব্য হয়ে থাকে নিয়তের ভিত্তিতে।)-এর ভিত্তিতে ছওয়াবের হয়ে যাবে। এর বিপরীত গোনাহের চেতনায়, খাহেশাত চর্চায় কোন কিছু লাইক দিলে তা গোনাহের হবে। (দুই) দ্বীনী বিষয়ে কারও দোসর হলে যে পরকালীন পরিণামের কথা বলা হয়েছে তা কি দ্বীনের সমগ্র বিষয়ে দোসর হলে প্রযোজ্য নাকি বিষয় বিশেষে দোসর হলেও প্রযোজ্য? এর জওয়াব হল- সমগ্র বিষয়ে দোসর হলে যে প্রযোজ্য হবে তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। রয়ে গেল বিশেষ কোন বিষয়ে দোসর হলে প্রযোজ্য হবে কি না। তো পূর্বে বর্ণিত হাদীছ ও আয়াতে যে ভালবাসা ও দোসর হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা মুতলাক (مطلق) তথা শর্ত বন্ধন মুক্ত। অর্থাৎ তাতে সমগ্র ক্ষেত্রে না বিশেষ কোন ক্ষেত্রে- কোন শর্ত বন্ধনের উল্লেখ নেই। তাই المطلق يجري على إطلاقه। (অর্থাৎ শর্ত বন্ধনমুক্ত ভাষ্য শর্ত বন্ধন হীন মুক্ত অর্থেই প্রযোজ্য হয়।) উসূল অনুযায়ী এখানে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। সেমতে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সমগ্র ক্ষেত্রে হলে প্রযোজ্য, আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে হলেও প্রযোজ্য। তাই সতর্কতাই জরুরী। অতএব দ্বীনী কোন বিষয়ে গলতিতে রয়েছে- এমন কাউকে সে বিষয়ে লাইক না দেয়া। হোক না সেটা বিষয় বিশেষ।

এ গেল লাইক বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ। আর শেয়ার যদি দাওয়াত ও তাবলীগ অর্থে হয়, তাহলে শরীয়তের বিচারে ভাল- এমন কোন বিষয় শেয়ার করলে ভাল বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেয়ার মত ছওয়াবের হবে। পক্ষান্তরে শরীয়তের বিচারে মন্দ- এমন কোন বিষয় শেয়ার করলে মন্দ বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেয়ার মত গোনাহের হবে। অতএব শরীয়তের এই দৃষ্টিকোণ সামনে রেখেই কোন বিষয় শেয়ার করা না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া চাই।

আল্লাহ আমাদের সকলকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ সামনে রেখে সবকিছু করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

www.maktabatulabrar.com

সোশ্যাল মিডিয়ায় যতসব বাজে চর্চা

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

ফেসবুক, ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভালো চর্চার পাশাপাশি মন্দ চর্চারও অভাব নেই। এখানে কত রকম নীতিহীনতা রয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এসব সোশ্যাল মিডিয়াকে একটা জগাখিচুড়ি ফিল্ড বললে অত্যুক্তি হবে না। এখানে শিক্ষিত, যোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও রুচিসম্পন্ন লোকের পাশাপাশি অশিক্ষিত, অযোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও কুরুচিপূর্ণ লোকেরও সমাবেশ রয়েছে এবং তাদের সংখ্যা নগন্যও নয়। তাদের দ্বারা এই ফিল্ড যাচ্ছে তাই হয়ে যাচ্ছে। তাদের কিছু লোক কত রকম অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, নীতিহীনতা, বিবেকহীনতা চর্চা করে যাচ্ছে, কত রকম বাজে চর্চা করে যাচ্ছে তা বর্ণনা করে শেষ করা কঠিন। সেসব বাজে চর্চার মধ্যে কয়েকটা নিম্নরূপ:

১. প্রতিপক্ষের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত দিয়ে কথা বলা,

২. প্রতিপক্ষের টিকা-টিপ্পনী কাটা,

৩. প্রতিপক্ষের মান-হানিকর কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন,
৪. অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ করা,
৫. ছুতোনাতা অজুহাতে প্রতিপক্ষকে কাফের ফাসেক ইত্যাদি ফতোয়া দেয়া,
৬. যার যোগ্যতা নেই তার যোগ্য ব্যক্তিদের সমালোচনা করা,
৭. বড়দের সমালোচনা করতে আদব-তমিজেরও বালাই না রাখা,
৮. সমালোচনার ভাষায় ভারসাম্য বজায় না রাখা,
৯. মানুষের দোষ খুঁজে খুঁজে সেগুলো অন্যদের শেয়ার করে কুরুচিকর আনন্দ উপভোগ করা,
১০. অন্যের কেলেংকারি জানতে পারলে প্রমাণিত হোক না হোক তা ছড়িয়ে মজা বোধ করা।

এসব অনিয়ম বিশৃঙ্খলার, এসব বাজে চর্চার কোনটাই শরীয়তসম্মত নয়, নীতিসম্মত নয়, সুরুচিসম্মত নয়, বিবেকসম্মত নয় বরং অনেকটাই পাপের। তা সত্ত্বেও এগুলো চর্চা করা হচ্ছে। অনেকে তো ভাল না মন্দ তা বিবেচনা ছাড়াই লঘু বিষয় ভেবে অবলীলায় সেগুলো করে যাচ্ছে। কুরআনের ভাষায়- وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم "তোমরা বিষয়টাকে লঘু মনে কর, অথচ আল্লাহর নিকট তা গুরুতর।" আবার অনেকে ভাল জ্ঞানেই সেগুলো করছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে করছে মন্দ। কুরআনের ভাষায়- الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا "দুনিয়ায় যাদের চেষ্টা-চরিত্র বরবাদ হচ্ছে অথচ তারা ভাবছে তারা ভালই করছে।"

ফেসবুকে যারা বিচরণ করেন, তাদের মধ্যে যারা আলেম রয়েছেন, সমঝদার রয়েছেন, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রয়েছেন তারা যদি এ জাতীয় অন্যায় ও পাপমূলক পোস্ট দেখলে তা লাইক শেয়ার না করে বরং প্রত্যেকে কমেন্ট করেন যে, এরকম বলা বা এগুলো প্রচার করা পাপ, তাহলে এ জাতীয় পোস্ট নিরুৎসাহিত হবে, এগুলোর পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। যারা এরূপ করবেন তারা দ্বীনী দাওয়াত ও গর্হিত তৎপরতা ইসলাহের ছওয়াবও লাভ করবেন। বিশেষত যারা আলেম, সমঝদার ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন তাদের দায়িত্বও রয়েছে শরীয়তবিরোধী কাজ দেখলে জবান দ্বারা সেটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা। এটা তাদের শরয়ী দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের অনেকেরই হাবভাব দেখলে মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়ার অঙ্গনে বুঝি এরূপ শরয়ী দায়িত্ব বলে কিছু নেই। তাই বুঝি তারা

www.maktabatulabrar.com

এখানে গাছাড়া। তাই বুঝি তারা এখানে যেদিকে হাওয়া চলে সেদিকেই নৌকার পাল খাটায়।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সকল অঙ্গনে দ্বীনী দায়িত্ব পালন করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ফেসবুকে কয়েকটি বিভ্রান্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد

ফেসবুক অনেক আগ থেকেই যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের একটি বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ফেসবুকের ইতিবাচক নেতিবাচক উভয় দিকই লক্ষ করা যাচ্ছে। ফেসবুক দ্বারা কিছু উপকার সাধিত হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। ফেসবুকে ব্যবসা-বাণিজ্যের তৎপরতা, ভাল পণ্যের প্রচার, ভাল কাজের প্রচার, ভাল কথার প্রচার, ভাল যোগাযোগ ইত্যাদি বহু উপকারের দিক রয়েছে। এভাবে ফেসবুককে বহু ইতিবাচক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার ফেকবুককে প্রচুর নেতিবাচক কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। ফেসবুক দ্বারা প্রচুর অপকার ও ক্ষতিও সাধিত হচ্ছে। কত ধরনের অপকার ও ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। আমি এখানে শুধু ধর্মীয় একাডেমিক ও তাত্ত্বিক ক্ষতির কিছু দিক তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি, যেগুলোকে ফেসবুকে বিভ্রান্তি আখ্যা দেয়া যেতে পারে। এরূপ ৫টা বিভ্রান্তি তুলে ধরছি।

১. ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই না করেই অবলীলায় যার তার পোস্ট, স্ট্যাটাস, স্টোরি ও ব্লগ পাঠ করে তা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং

www.maktabatulabrar.com

অন্যদের তা শেয়ারও করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে বহু দ্বীনী বিষয়ও রয়েছে। অথচ কারও থেকে দ্বীন-ধর্ম বিষয়ক কোন জ্ঞান নিতে হলে যাচাই করে নিতে হয় তিনি হকপন্থী লোক কি না, তিনি যোগ্য আলেম কি না, ইলম অনুযায়ী তার আমল আছে কি না, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কি না, আলেম না হলে কোন নির্ভরযোগ্য আলেম বা নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাতে কথা বলছেন কি না ইত্যাদি।

(কুরআন-সুন্নাহর বাইরের কথা হলেও নির্ভরযোগ্য সূত্রে বলছেন কি না তা দেখা চাই।) এসব বিষয় যাচাই না করে যার তার থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি তা প্রচার করাও ঠিক নয়। তাতে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী এসে যেতে পারে, হেদায়েত প্রচারের পরিবর্তে গোমরাহী প্রচার হয়ে যেতে পারে। বস্তুত দ্বীনী শিক্ষার বিষয়টি খুবই নাজুক, এ ক্ষেত্রে সাবধানী না হলে, কার থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে তা বিবেচনায় না রাখলে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। এজন্যই প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত ইবনে সিরীন রহ. বলেছেন, ইলম হচ্ছে একটি দ্বীনী বিষয়। অতএব তোমরা লক্ষ্য রেখো কার থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

২. ফেসবুকে আর একটা বিভ্রান্তি হল- যার যেমন ইচ্ছা যোগ্য ধর্মীয় ব্যক্তিদের সমালোচনা করছেন। অথচ সমালোচনাকারির মধ্যে যার সমালোচনা তিনি করছেন ন্যূনতম তার সমপর্যায়ের একাডেমিক ও নৈতিক যোগ্যতা থাকা আবশ্যক তা একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু ফেসবুকের সমালোচনাকারীদের অনেকেই নিজেদের যোগ্যতাকে একটুও তলিয়ে দেখছেন না। যার সমালোচনা তারা করছেন তার সমালোচনা করার নৈতিক ও বস্তুনিষ্ঠ অধিকার তাদের রয়েছে কি না, তার সমালোচনা তাদের মানায় কি না- বিষয়টা মোটেও তারা ভাবছেন না। তাদের সমালোচনা যে প্রকৃতপক্ষে সঠিক কি না তা বুঝার মত জ্ঞান ও যোগ্যতাও হয়তো তাদের মধ্যে নেই। এভাবে অন্যায় সমালোচনা হয়ে গেলে এবং তা দ্বারা সমাজে ধর্মীয় যোগ্য ব্যক্তিদের, ভাল মানুষদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়ে গেলে ইসলামী সমাজের যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হবে সে অনুভূতিও তাদের মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। ইসলামের দুশমনরা ইসলামের ক্ষতি সাধনের অসৎ উদ্দেশ্যে ফেক আইডি খুলে, ভুয়া নামে আইডি খুলে ইসলাম ও ইসলামী যোগ্য

ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার এই অপপ্রয়াস চালাচ্ছে কি না অতি অবশ্যই আমাদের সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। ফেসবুকে যে প্রচুর ফেক আইডি রয়েছে তা তো সকলেরই জানা। ফেসবুকে সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে সমাজের কোনো শ্রেণীর কোনো আলেমকেই আহত না করে ছাড়া হচ্ছে না, তাতে এ সন্দেহই প্রবল হচ্ছে বুঝি এটা ইসলাম বিরোধী কোন কুচক্রী মহলের অপতৎপরতা। কেননা এরূপ কুচক্রীমহল জানে আলেম সমাজের প্রতি সাধারণ জনগণকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলে আলেম সমাজ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই রাখালবিহীন মেষপালের মত তাদেরকে ইচ্ছামত যেকোনো দিকে চালিত করা সম্ভব হবে। অতএব ধর্মের কোন বিষয়ে বা ধর্মীয় কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সম্বন্ধে সমালোচনা দেখলে সমালেচনাকারী কে, তার যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তা অবশ্যই বিবেচনায় আনুন। যথাযথভাবে যাচাই করুন। তার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে, তার সমালোচনার যথার্থতা বিবেচনা না করে তার সমালোচনা আমলে নেয়া থেকে বিরত থাকুন, লাইক দেয়া থেকে বিরত থাকুন, অন্যদের তা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার কোন লাইক বা শেয়ার করা দ্বারা ইসলামের ক্ষতিসাধনের অপতৎপরতা অগ্রসর হবে কি না এবং এভাবে আপনি পাপে জড়িয়ে পড়বেন কি না তা সতর্ক বিবেচনায় রাখুন। এরূপ সমালোচনাকারী আপনার ফেসবুকের ফ্রেন্ড হয়ে থাকলে যেহেতু তাকে ফ্রেন্ড বানিয়েছেন, তাই তাকে বোঝান। তা না পারলে কিম্বা সে না মানলে তাকে আন-ফ্রেন্ড করে দিন। যাতে তার পোস্ট, স্ট্যাটাস ইত্যাদি অবলীলায় আপনার আইডিতে আসা বন্ধ হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটু বলতে চাই। তা হল সমালোচনা করা যোগ্য ব্যক্তিদের কাজ। যারা যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও সমালোচনা কর্মে অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে যোগ্যদের আসনে সমাসীন দেখানোর খাহেশ পোষণ করছেন, কিম্বা সস্তায় নিজেদেরকে হাইলাইট করার চেষ্টা করছেন, কিম্বা নিছক লক্ষ্যহীন কৌতূহল থেকে এমনটা করছেন তাদের প্রতি অনুরোধ বিরত হোন। আপনাদের এহেন কর্ম ইসলাম ও মুসলমানদের বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনাদের এহেন কর্ম ইসলামের শত্রুদের মিশনকেই আগে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

www.maktabatulabrar.com

অতএব প্রয়োজনীয় সমালোচনার বিষয়টি যোগ্য লোকদের উপর ছেড়ে দিন, অনধিকার চর্চা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখুন।

৩. ফেসবুকে আর একটা বিভ্রান্তি হল- সমালোচনা কিম্বা প্রতিবাদের ভাষায় ভারসাম্য ও শালীনতা রক্ষা করা হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে কেউ ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে সমালোচনা করল কিম্বা নবী-রসূলের অবমাননা করল কিংবা আলেম উলামার সমালোচনা করল, অমনি ক্ষিপ্ত হয়ে আরেকজন ভারসাম্যহীন ভাষায় তার সমালোচনা জুড়ে দিল, অশালীন ভাষায় তাকে গালাগাল করতে শুরু করল। তার মানহানিকর কার্টুন ও ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করতে আরম্ভ করল। এমনও দেখা গেছে একজন ফেসবুকে লিখেছে- অমুকের পুত! তুই আলেমদের সমালোচনা করিস, তোর মায়েরে ইয়ে করি। নাঊযুবিল্লাহ! এরূপ অশালীন ভাষার ব্যবহার ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়। এর দ্বারা ইসলাম বিরোধীদের এটা ভাববার কিম্বা বলার সুযোগ হয়ে হয়ে দাঁড়াবে যে, আলেম সমাজের মধ্যে শালীনতাবোধ নেই, তারা অসভ্য। এরকম সমালোচনাকারী ও গালমন্দকারীরা নিজেদেরকে আলেম সমাজের ও ইসলামের ভক্ত-দোস্ত বলে জাহির করলেও প্রকৃতপক্ষে এরা হয় ইসলাম ও আলেম উলামার দুশমন, এরূপ ছদ্মবেশে এরা ইসলাম ও আলেম উলামার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায়, নতুবা এরা ইসলাম ও আলেম উলামার নাদান দোস্ত, আর নাদান দোস্তদের দ্বারা অনেক সময় দুশমনদের চেয়েও বেশি ক্ষতি সাধিত হয়।

অশালীন তো দূরের কথা ইসলাম সমালোচনার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীন কথা থেকেও বিরত থাকার শিক্ষা দিয়েছে। সব রকম গালিগালাজকে হারাম করেছে। অশালীন ভাষায় সমালোচনা, গালিগালাজ, মানহানিকর কার্টুন ও ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি প্রতিপক্ষকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে, জেদী করে তোলে, আলেম উলামা ও ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। আর তার জন্য এরূপ সমালোচনাকারী ও গালিগালাজকারী গণই দায়ী হয়। মনে রাখতে হবে অশ্লীল ভাষা ও গালিগালাজ ইত্যাদির প্রয়োগ দ্বারা মনের ঝাল মেটানো যায় কিন্তু তা দ্বারা কাউকে কাছে টানা যায় না।

বাতিল ফিরকার লোকদের ও বিধর্মীদের সমালোচনার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নীতি প্রযোজ্য। । অশালীন ভাষার ব্যবহার ও গালিগালাজ

তাদের বেলায়ও নিষিদ্ধ। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্যদের ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত শত্রুতায় এসে আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে। (সূরা আনআম: ১০৮)

ছোটখাটো শাখাগত বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন শ্রেণীর লোকদের মতবিরোধ থাকতে পারে, তাদের ব্যাপারে কিছু বলতে বা লিখতে গেলেও আপনাকে সমালোচনার এই মাপকাঠি অনুসরণ করে চলতে হবে। শালীন ও ভারসাম্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। আপনি যদি তা মেনে চলতে না চান তাহলে আপনি সমালোচনার অঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত থাকুন। ভারসাম্যপূর্ণ লোকদের দ্বারাই আল্লাহ দ্বীনে হকের এ কাজ চালিয়ে নিবেন।

৪. ফেসবুকে আর একটা বিভ্রান্তি হল- যার তার কাছ থেকে বইপত্রের সাজেশন নেয়া হচ্ছে। কারও একটা বিষয় সম্বন্ধে বই-কিতাব সংগ্রহের চিন্তা জাগল, অমনি ফেসবুকে আবেদন জানিয়ে একটা পোস্ট ছেড়ে দিল- অমুক বিষয়ে কোন কোন বই-কিতাব পাঠ করা যায়? তখন একেকজন নিজ নিজ পছন্দের, নিজ নিজ মতবাদের অনুকূলের বইপত্রের সাজেস্ট করতে থাকল (যদিও সে মতবাদ ভ্রান্ত), পাবলিশাররা ব্যবসায়িক স্বার্থে তাদের প্রকাশিত বইপত্রেরই সাজেস্ট করতে থাকল (যদিও তাদের প্রকাশিত সে বইপত্র গ্রহণযোগ্য নয় বা সুন্দর নয়)। এভাবে হয়তো সে সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে যে বই ভাল তার নাম উঠে এল না, বরং যেটা ভাল নয় বা ক্ষতিকর এমন কোন বইয়ের নাম উঠে এলো আর আবেদনকারী সে বই সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত হল বা প্রতারিত হল বা বিভ্রান্ত হওয়ার যোগাড় করল। বস্তুত একটা বিষয়ে কি কি বই লেখা হয়েছে, তার মধ্যে কোন কোনটা বিশুদ্ধ ও ভাল সে সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়া যার তার কাজ নয়। এর জন্য যথেষ্ট লেখাপড়া ও যথেষ্ট খোঁজ-খবর থাকা চাই। তদুপরি পরামর্শ দেয়ার মত বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীও থাকা চাই। হাদীছে এসেছে- যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তার উপর আমানতদারী এসে যায়। সুতরাং ফেসবুকে এভাবে আবেদন জানিয়ে যার তার থেকে বইপত্রের ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার পথ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের থেকে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

৫. ফেসবুকে আর একটা বিভ্রান্তি হল- পর্যাপ্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনেকে বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিউ দিচ্ছেন। রিভিউ দেয়া কোন ছেলেখেলা নয়।কোন একটা গ্রন্থ সম্বন্ধে রিভিউ দিতে হলে সেই গ্রন্থের লেখকের চেয়েও বেশি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তদুপরি কোন ব্যক্তিস্বার্থের একপেশে চেতনা থেকে নয় বরং নিরপেক্ষ চেতনা থেকে, আমানতদারির চেতনা থেকে রিভিউ হওয়া চাই। কিন্তু ফেসবুকের রিভিউগুলো কি এমন হচ্ছে? স্বয়ং প্রকাশকরাই ব্যবসায়িক স্বার্থে নিজেদের প্রকাশিত বইপত্রের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রশংসা করে রিভিউ ছাড়ছে। এটাকে রিভিউ নয় বরং ফুলিয়ে ফাপিয়ে পাবলিসিটি বলা হয়। এমনও দেখা যাচ্ছে কোন প্রকাশক তার প্রকাশিত কোন বইয়ের ব্যাপারে যার রিভিউ ভাল হবে পুরস্কার ঘোষণা করল, ব্যাস রিভিউ দেয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এবং বইটি ভাল না হওয়া সত্ত্বেও নিছক পুরস্কার লাভের আশায় অনেকেই বইটি সম্বন্ধে খুব ভাল বলে রিভিউ দিয়ে দিল। কারণ তাদেরকে তো পুরস্কার পেতে হবে। আর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভাল না বললে যে পুরস্কার হাতানো যাবে না। এ ধরনের রিভিউকে রিভিউ নয় বরং হীন স্বার্থে পাবলিককে প্রতারিত করার অপচেষ্টা আখ্যায়িত করা উচিত।

আল্লাহ আমাদের সব ব্যাপারে সঠিক পন্থা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

গীবত ও গালিগালাজ কি সোশ্যাল মিডিয়ায় জায়েয হয়ে গেল?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد : فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ولا يغتب بعضكم بعضا.

গীবত শরীয়তে হারাম। গালিগালাজ করাও শরীয়তে হারাম। গীবত বলা হয় কারও পশ্চাতে তার এমন দোষ-ত্রুটি বলা যা তার অপছন্দনীয়। যদি সে দোষ-ত্রুটি বাস্তবেই তার মধ্যে থাকে, তাহলে তা গীবত, শরীয়তে যা হারাম কাবীরা গোনাহ। আর যদি বাস্তবে সে দোষ-ত্রুটি তার মধ্যে না থাকে তাহলে সেটাকে বলে বুহতান, যা আরও কঠিন গোনাহ।

গীবতের কাছাকাছি আর একটা বিষয় রয়েছে যাকে আরবিতে বলা হয় সাব্ব (السب) বা সিবাব (السباب) তথা গালিগালাজ বা গালমন্দ করা। সহীহ হাদীছের ভাষ্য মোতাবেক কোন মুসলমানকে সাব্ব তথা গালমন্দ করা ফাসেকী। অর্থাৎ তা কবীরা গোনাহ। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, سباب المسلم فسوق

অর্থাৎ কোন মুসলমানকে সাব্ব তথা গালমন্দ করা ফাসেকী। (সহীহ মুসলিম)

www.maktabatulabrar.com

উল্লেখ্য, এই সাব্ব বা সিবাব তথা গালিগালাজ বা গালমন্দ বলতে শুধু অমুকের বাচ্চা, তমুকজাদা ইত্যাদি বলাই নয়। বরং যেকোনো ব্যক্তির শান ও মর্যাদার খেলাপ কিছু বলাই সাব্ব তথা গালমন্দ-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব যেকোনো ব্যক্তির শান ও মর্যাদার খেলাপ কিছু বলাও নিষিদ্ধ যেমন গীবত নিষিদ্ধ।

কুরআন হাদীছের আলোকে কয়েকটি ক্ষেত্রে পশ্চাতে কারও দোষের উল্লেখ করা যায়। সেগুলো শাব্দিক অর্থে গীবত হলেও পারিভাষিক অর্থে গীবত নয়। অর্থাৎ, সেগুলো হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। শরীয়তে সেগুলোর অনুমতি রয়েছে। সেগুলো হল- (১) ন্যায্য বিচার পাওয়ার জন্য বাদী বিচারকের সামনে বিবাদীর দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করতে পারে। (২) মানুষের শিক্ষার জন্য তাদের সামনে কারও দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা যায়। যেমন কুরআনে কারীমে ফেরআউন, কওমে আদ, কওমে ছামূদ প্রমুখের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে। (৩) গুরুজনদের সামনে ছোটদের বা উস্তাদদের কাছে ছাত্রদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা যায় যাতে তারা তাদের শাসন করতে পারে।

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত আর কোথাও পশ্চাতে কারও দোষ চর্চার অনুমতি নেই। আর গালি-গালিগালাজ বা গালমন্দের অনুমতি তো কোনো ক্ষেত্রেই নেই। কিন্তু ইদানিং ফেসবুক টুইটার ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়াতে যেভাবে দেদারসে গীবত-শেকায়েত ও গালিগালাজ চলছে, এমনকি তালিবে ইলম ও আলেমদের দ্বারাও চলছে তাতে মনে হচ্ছে এসব সোশ্যাল মিডিয়াতে বুঝি গীবত-শেকায়েত ও গালিগালাজে শরয়ী কোনো বাধা নেই। তাহলে কি গীবত ও গালিগালাজ সোশ্যাল মিডিয়ায় জায়েয হয়ে গেল? মনে রাখা চাই নাজায়েজকে জায়েয মনে করলে ঈমান খতরার মধ্যে পড়ে যায়। (নাউযু বিল্লাহ!)

যারা অন্যের গীবত-শেকায়েত করছে তারা যেমন অন্যায় করছে তেমনি যারা গীবত-শেকায়েত শুনে তাহকীক তদন্ত ছাড়া অমনি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করছে, তা নিয়ে চর্চা করছে, তা অন্যকে শেয়ার করছে, যার সম্বন্ধে গীবত-শেকায়েত শুনছে তার সম্বন্ধে কুধারণা করে বসছে, কিংবা সাধ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গীবতকারীকে বাধা দিচ্ছে না, তারাও তেমনি অন্যায় করছে। কেননা কারও গীবত-শেকায়েত শুনলে কর্তব্য হল-

তাহকীক তদন্ত ছাড়া তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা, তা নিয়ে চর্চা না করা, যার গীবত-শেকায়েত শোনা হল তার সম্বন্ধে কুধারণা করে না বসা এবং সাধ্য ও সুযোগ থাকলে গীবতকারীকে বাধা দেয়া।

আল্লাহর কাছে আমরা পানাহ চাই নফছ ও শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকে এবং সব ধরনের গোনাহ থেকে। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

www.maktabatulabrar.com

যারা ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদিতে অন্যের কেলেংকারি ছড়াতে মজা বোধ করে

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد: فقد قال الله تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والاخرة.

সম্প্রতি ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়াগুলো কোন খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার বিশেষ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এগুলোতে ভাল অনেক কিছু ছড়ায় যা প্রশংসনীয়, আবার মন্দ অনেক কিছু ছড়ায় যা নিন্দনীয়। কিন্তু খুব বেশি নিন্দনীয় হল যখন একজনের চরিত্র হননমূলক কোন খবর ছড়ায় আবার তা যদি হয় অপ্রমাণিত ও ভুয়া। কারও কেলেংকারীমূলক কোন সংবাদ সত্য হলেও স্বাভাবিক অবস্থায় তা প্রচার করা গোনাহ। আর তা যদি হয় অপ্রমাণিত ও ভুয়া, তাহলে তো তা প্রচার করা আরও বড় গোনাহ। যেমন কেউ কারও ব্যাপারে পরকিয়া করার একটা পোস্ট দিল, বা কেউ আরেকজনের বউ নিয়ে ভেগেছে বলে পোস্ট দিল, বা কেউ অত নম্বর বিয়ে করেছে বলে পোস্ট দিল। আর এসব পোস্ট

দিতে না দিতেই হুহু করে বাতাসের মত ছড়িয়ে পড়ল। একজন থেকে আরেকজন মজা নিয়ে শেয়ার করতে থাকল, ভাইরাল হয়ে গেল। অথচ পরে প্রমাণিত হল মূল পোস্টটাই ছিল ভুয়া। তাহলে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার কারণে খবর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক মান-মর্যাদা, ইজ্জত-আব্রুর যে হানি ঘটল তার জন্য কে দায়ী? এটা কোন পর্যায়ের গোনাহ? কে দায়ী এ প্রসঙ্গে কথা হল- প্রথম যে তাহকীক তদন্ত ছাড়াই সেটা পোস্ট করেছে সে-ই মূল দায়ী। তারপর দায়ী যারা সেই পোস্টটা যাচাই-বাছাই ছাড়াই অন্যদের শেয়ার করেছে। আর এখানে কয়েক ধরনের কবীরা গোনাহ হয়েছে। এক. কোন মুসলমানের সম্মান হানির গোনাহ। দুই. যাচাই-বাছাই ছাড়াই কোন খবর প্রচার করা যে মিথ্যা বলার শামিল, সেই মিথ্যার গোনাহ। তিন. অশ্লীলতা ছড়ানোর গোনাহ। চার. যে মেয়ের সঙ্গে ঘটনাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার জীবন ধ্বংস করার গোনাহ। এভাবে চারটা কবীরা গোনাহ হচ্ছে। আর একটা কবীরা গোনাহই জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন উপরোক্ত চারটা গোনাহের একটা হল অশ্লীলতা ছড়ানোর গোনাহ। আর অশ্লীলতা ছড়ানোর ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة.

অর্থ: যারা চায় যে, মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা প্রসার পাক (অর্থাৎ ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক বা ব্যাভিচারের সংবাদ ও অশ্লীল কথাবার্তা চর্চা হোক) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি- দুনিয়াতেও আখেরাতেও। (সূরা নূর:১৯)

তাহলে দেখা গেল অশ্লীলতা ছড়ানো এত মারাত্মক গোনাহ যে, তার কারণে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে শাস্তি আসে। অথচ কত বেপরোয়াভাবে আমরা এই গোনাহ করে যাচ্ছি। আবার এই গোনাহকে গোনাহই মনে করা হচ্ছে না, অত্যন্ত লঘু জ্ঞান করে হেসে খেলে গোনাহটা করা হচ্ছে, যা গোনাহের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেউ এই গোনাহ করছে আর কেউ তাতে লাইক দিয়ে গোনাহকেই লাইক দিচ্ছে। আল্লাহ্ পানাহ! কোন গোনাহকে লাইক দেয়া মানে গোনাহকে পছন্দ করার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেয়া। কত দুঃসাহসের ব্যাপার সেটা!

www.maktabatulabrar.com

একটি কথা বলেই শেষ করছি। যারা ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদিতে অন্যের কেলেংকারি ছড়াতে মজা বোধ করেন, তারা যেন পূর্বে উল্লিখিত আয়াতের বক্তব্য স্মরণে রাখেন- যারা চায় যে, মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা প্রসার পাক (অর্থাৎ ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক বা ব্যাভিচারের সংবাদ ও অশ্লীল কথাবার্তা চর্চা হোক) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি- দুনিয়াতেও আখেরাতেও। (সূরা নূর:১৯)

আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ওয়াজ–মাহফিলে চলছে বিকৃত চর্চা: কারা দায়ী?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد:

ইদানিং ওয়ায়েজ ও ধর্মীয় বক্তার সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। বেড়েছে ওয়াজ-মাহফিলের পরিমাণও। ওয়াজ-মাহফিলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া অর্থ দ্বীনের সহীহ শিক্ষার বেশি বিস্তার ঘটা, দ্বীন প্রচারে ব্যাপকতা ঘটা যা মানুষের মধ্যে দ্বীনদারী বৃদ্ধি করার একটা বড় ওছীলা। এ অর্থে ওয়াজ-মাহফিলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া দ্বীনের জন্য একটি ইতিবাচক বিষয়। কিন্তু কিছু কিছু ওয়াজ-মাহফিলে এখন এমন অনেক কিছু চালু হয়েছে যা দ্বীনদারী বৃদ্ধি করছে না বরং বদ-দ্বীনী বৃদ্ধি করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত বিভিন্ন ওয়াজের ভিডিও দেখে জানা যাচ্ছে কিছু কিছু ওয়াজে যোগ হয়েছে নানান ধরনের বুলিবচন ও ভাব-ভঙ্গিমা। কিছু কিছু ওয়াজ-মাহফিলে চলছে শ্রোতাদের বিনোদন দেয়ার জন্য গানের সুরে এটা সেটা গাওয়া, এমনকি সরাসরি গান গেয়ে শোনানো, চলছে নাটুকেপনা ও নানান রকম ভাড়ামো। কিছু কিছু মাহফিলে চলছে যিকিরের নামে নর্তন-কুর্দন। কিছু কিছু ওয়াজ-মাহফিলে ওয়াজ তো নয় চলছে বিভিন্ন জনকে গালিগালাজ এবং বিভিন্ন জনের অযাচিত সমালোচনা ও

www.maktabatulabrar.com

খিস্তিখেউড়। কিছু কিছু ওয়াজ-মাহফিলে আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য আমদানি করা হচ্ছে ক্ষুদে বক্তা, শিশু বক্তা, হিজড়া বক্তা, কমেডিয়ান বক্তা এমনকি নারী বক্তা পর্যন্ত। এভাবে ওয়াজ-মাহফিলের মত একটা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ দ্বীনী অনুষ্ঠানকে রঙ্গ-রস ও খেল-তামাশার আসরে পরিণত করা হচ্ছে। বিনোদনের আসরে পরিণত করা হচ্ছে। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক! এটা দ্বীনী কাজে বিকৃতি সাধন হেতু নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধ। এমনতর মাহফিল থেকে হেদায়েতের আলো ছড়াবে না, ঈমান আমলের চেতনা ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মিল মহব্বত, আখলাক-চরিত্র ইত্যাদির কথা ছড়াবে না। বরং গোমরাহির অন্ধকার ছড়াবে, ঈমান-আকীদা বিধ্বংসী চেতনা ছড়াবে, গলত আমলের বার্তা ছড়াবে, মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বদ-আখলাকী ছড়াবে। দুঃখজনক হলেও সত্য এ জাতীয় অনুষ্ঠানের কল্যাণে (?) ইতিমধ্যে কিছু পরিসরে তেমনটা শুরু হয়েও গেছে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যা কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছে। তাই আবারও বলছি, নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক!

ওয়াজ মাহফিলের এই বিকৃতির জন্য কারা দায়ী? এর জন্য যেমন ঐসব ওয়াজ -মাহফিলের সংশ্লিষ্ট বক্তারা দায়ী, তেমনি দায়ী ঐসব মাহফিলের আয়োজক উদ্যোক্তারাও। বক্তারা দায়ী এ কারণে যে, তারা আসছেন ওয়াজ ও নসীহতের জন্য, অথচ "ওয়াজ" ও "নসীহত" বলতে কী বুঝায় তা বিস্মৃত হয়ে তারা অন্য অনেক কিছুতে লিপ্ত হচ্ছেন। অনেকের হাবভাব দেখে মনে হয় তারা ওয়াজ করতে আসেন না বরং আসেন মানুষকে বিনোদন দিতে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে এবং এভাবে নাম কামাই করে ভবিষ্যতে মোটা অংকের ধান্ধা করার লাইন রচনা করতে। নতুবা দ্বীন যদি তাদের মাকসাদ থাকবে তাহলে ওয়াজের নামে এসব কেন? চেহারা দেখানো, কণ্ঠ শোনানো ও বাচনভঙ্গি ফলানো নিয়ে এত কসরত কেন? ছবি ভিডিও নিয়ে এত তোড়জোড় ও ব্যস্ততা কেন? যাহোক এসব কারণে বক্তারা দায়ী। আর আয়োজক উদ্যোক্তারা দায়ী এ কারণে যে, তারা ওয়ায়েজ বা বক্তা নির্বাচন করার সময় কাদের দ্বারা প্রকৃত ওয়াজ-নসীহত হবে, ওয়াজ-নসীহতের জন্য কোন্ ধরনের বক্তা নির্বাচন করা চাই, কোন্ ধরনের বক্তার ওয়াজ-নসীহত শোনা চাই- এসব কথা মাথায় না রেখে অন্য অনেক ধরনের অবাঞ্ছিত চিন্তা মাথায় রেখে ওয়ায়েজ বা বক্তা নির্বাচন করছেন। যেমন তারা মাথায় রাখছেন কার সুর ভাল তাকে

আনতে হবে যেন শ্রোতারা মুগ্ধ হয়। তারা মাথায় রাখছেন কে সেলিব্রেটি তথা নামকরা তাকে আনতে হবে যেন লোক সমাগম বেশি হয়। তারা মাথায় রাখছেন কে হাসাতে পারে তাকে আনতে হবে যাতে শ্রোতারা মজা পায়। তারা মাথায় রাখছেন ব্যতিক্রম ধরনের কোন বক্তা আনতে হবে যাতে বৈচিত্র সৃষ্টি হয়। তা বৈচিত্র সৃষ্টি করার জন্য ক্ষুদে বক্তা বা শিশু বক্তা কিংবা হিজড়া বক্তা বা কোন কমেডিয়ান কিংবা অমুক তমুক শ্রেণীর যাকে হোক আনতে হবে। আয়োজক ও উদ্যোক্তারা এসব নামী দামী, কোকিলকণ্ঠী, হাসানো কাঁদানো ও বিচিত্র ধরনের বক্তা আনার চিন্তা এজন্যও করে থাকেন যাতে লোক সমাগম বেশি হয়, এটাকে কেন্দ্র করে কালেকশনও ভাল হয় এবং সর্বোপরি তাদের নামডাক হয়। কার দ্বারা হেদায়েত ভাল হবে, কার দ্বারা সত্যিকারের নসীহত হবে- এ চিন্তা তারা মাথায় কম রাখেন। এ চিন্তাই যদি তাদের মাথায় থাকবে তাহলে তো খোদাভীরু মুত্তাকী পরহেযগার হক্কানী আলেমদেরকেই বক্তা হিসেবে নির্বাচন করার কথা।

এভাবে বক্তা নির্বাচনে আয়োজক উদ্যোক্তাদের ভুল নীতি সেই সাথে বক্তাদের অনাকাঙ্খিত বক্তব্য, বুলিবচন ও আচরণ সবকিছু মিলিয়ে দ্বীনী মাহফিলগুলোর কাঙ্খিত ফায়দা হারিয়ে যাচ্ছে। দ্বীনী মাহফিলগুলো বদ দ্বীনী আসরে পরিণত হচ্ছে। হেদায়েতের মজলিস খেল-তামাশা ও রঙ্গ-রসের মজলিসে পরিণত হচ্ছে। দ্বীনী মাহফিলে ঘটছে বিকৃতি। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক! আফসোস শত আফসোস! এটা যে দ্বীনের কত বড় ক্ষতি হচ্ছে তা কি ভেবে দেখা উচিত নয়? সংশ্লিষ্ট সকলকে ভেবে দেখার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আয়োজক উদ্যোক্তাদের সতর্ক থাকা চাই তারা যেন ওয়াজ-মাহফিলের নামে ছওয়াব কামাই করতে গিয়ে গোনাহ কামাই করে না বসেন। আয়োজক উদ্যোক্তাদের মনে রাখা চাই ওয়াজ-মাহফিল রঙ্গ-রসের জন্য নয়, ওয়াজ-মাহফিল বিনোদনের জন্য নয়, ওয়াজ-মাহফিল শ্রোতাদের কান সুখ করানোর জন্য নয়, ওয়াজ-মাহফিল টাকা-পয়সা কালেকশনের জন্য নয়। এগুলো ওয়াজ-মাহফিলের উদ্দেশ্য নয়। ওয়াজ-মাহফিলের উদ্দেশ্য ওয়াজ ও নসীহত-এর মাধ্যমে মানুষের হেদায়েত। ওয়াজ-মাহফিল ওয়াজ ও নসীহতের জন্য।

বস্তুত ওয়াজ-মাহফিলের উদ্দেশ্য এবং 'ওয়াজ' ও 'নসীহত' বলতে কী বুঝায় তা যদি বক্তাগণ ও বক্তা নির্বাচনকারীগণ মাথায় রেখে কাজ

www.maktabatulabrar.com

করেন তাহলেই ওয়াজ মাহফিলগুলোর এই বিকৃতি থেকে উত্তরণ সম্ভব এবং এভাবেই ওয়াজ মাহফিলগুলোকে সত্যিকার অর্থে কল্যাণময়ী করে তোলা সম্ভব।

তাই আমি এখানে 'ওয়াজ' ও 'নসীহত' বলতে কী বুঝায় অর্থাৎ কথা দু'টোর কী অর্থ ও ব্যাখ্যা তা বর্ণনা করছি। আশা করি তাতে ওয়াজ-মাহফিলের বক্তাদের কী কী ধরনের কথা বলা উচিত তা সামনে এসে যাবে। তারা যদি সেভাবে বক্তব্য প্রদান করেন আর সে ধরনের বক্তব্য যাদের দ্বারা হবে তাদেরকেই যদি আয়োজক ও উদ্যোক্তারা বক্তা হিসেবে নির্বাচন করেন তাহলেই ওয়াজ মাহফিলগুলো সত্যিকার অর্থে কল্যাণ বয়ে আনবে।

"ওয়াজ"-এর অর্থ

কুরআনে কারীমে 'ওয়াজ' ধাতুমূল থেকে উদগত শব্দ এসেছে ৩টি আয়াতে। যথা: সূরা নিছা-এর ৬৩ নং আয়াতে, সূরা লুকমান-এর ১৩ নং আয়াতে ও সূরা সাবা-এর ৪৬ নং আয়াতে। হাদীছেও শব্দটি এসেছে। নিম্নে বিশিষ্ট অভিধান, তাফসীরের কিতাব ও হাদীছের শরাহ-গ্রন্থাদি থেকে ওয়াজ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে তার কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

* الوعظ : النصح والتذكير بالعواقب. (الصحاح في اللغة)
* وَعظَه: ذكّره ما يلين قلبَه من الثواب والعقاب. (تاج العروس)
* إن الوعظ بيان ما يصلح به حال من يوعظ. (روح المعاني)
* الوعظ كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. (تفسير البغوي)
* قال العيني: وهو التذكير بالعواقب. (عمدة القاري)

উলামায়ে কেরাম আরবী ইবারতগুলোর অর্থ বুঝবেন। সাধারণ মানুষ যারা বুঝবেন না তাদের জন্য বলছি, বিশিষ্ট অভিধান-গ্রন্থ আস-সিহাহ ও তাজুল আরূছ, বিশিষ্ট তাফসীর-গ্রন্থ রূহুল মাআনী ও তাফসীরুল বাগাবী এবং বিশিষ্ট হাদীছের শরাহ-গ্রন্থ উমদাতুল কারী-র বরাতে পেশকৃত উপরোক্ত ইবারতসমূহে যা বলা হয়েছে তার সারকথা হল- 'ওয়াজ' বলতে বুঝায় এমন সব কথা যা দ্বারা মানুষের (ঈমান-আকীদা, ধ্যান-ধারণা ও আমল

আখলাকের) সংশোধন হয়। ওয়াজ বলতে বুঝায় বিভিন্ন নেক আমলের ছওয়াব ও পুরস্কার কি এবং বদ আমলের শাস্তি ও খারাপ পরিণাম কি সেগুলো বর্ণনা করা যাতে মানুষের দিল নরম হয়।

"নসীহত"-এর অর্থ

কুরআনে কারীমে নসীহত-এর ধাতুমূল থেকে উদগত বিভিন্ন শব্দ এসেছে বহু আয়াতে। যথা: সূরা হূদ-এর ৩৪ ও ৬৮ নং আয়াতে, সূরা আ'রাফ-এর ২১ ও ৭৯ নং আয়াতে ও সূরা ক্বাসাস-এর ২০ নং আয়াতে। হাদীছেও নসীহত শব্দটি এসেছে। নিম্নে বিশিষ্ট অভিধান, তাফসীরের কিতাব ও হাদীছের শরাহ-গ্রন্থাদি থেকে নসীহত শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে তার কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

* نصح : خلص والثوبَ : خاطه. (القاموس المحيط)

* النصح تصفية العسل وخياطة الثوب. (تاج العروس)

* نصح الشيئ خلص والناصح الخالص من العسل. (لسان العرب)

* النصح في اللغة الخلوص يقال : نصحت العسل إذا خلصته من الشمع ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. (روح المعاني)

* قال الخطابي: النَّصِيحَة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. (شرح مسلم للنووي)

* قال العيني : وأصل النصيحة مأخوذ من نصح الرجل ثوبَه إذا خاطه بالمنصحة وهي الإبرة والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة. (عمدة القاري)

* والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة. (فتح الباري)

উলামায়ে কেরাম আরবী ইবারতগুলোর অর্থ বুঝবেন। সাধারণ মানুষ যারা বুঝবেন না তাদের জন্য বলছি, বিশিষ্ট অভিধান-গ্রন্থ আল-কামূছুল মুহীত, তাজুল আরূছ ও লিসানুল আরব, বিশিষ্ট তাফসীর-গ্রন্থ রূহুল মাআনী এবং বিশিষ্ট হাদীছের শরাহ-গ্রন্থ শরহে নববী, উমদাতুল কারী ও ফাতহুল বারী-র বরাতে পেশকৃত উপরোক্ত ইবারতসমূহে যা বলা হয়েছে তার

www.maktabatulabrar.com

সারকথা হল- 'নসীহত' বলতে বুঝায় এমন সব কথা যা দ্বারা মানুষের ভুল-ত্রুটি সংশোধন হয় এবং মানুষের জীবন বিশুদ্ধ ও পূতপবিত্র হয়।

অতএব যাদের দ্বারা এই ওয়াজ- নসীহত হবে না তাদেরকে ওয়াজ-মাহফিলের বক্তা বানানো থেকে বিরত থাকা চাই। যারা ওয়াজ-মাহফিলকে খেল-তামাশা ও রঙ্গ-রসের মজলিসে পরিণত করছে, যারা ওয়াজ-মাহফিলের দ্বীনী রূপে বিকৃতি ঘটাচ্ছে, তাদেরকে সর্বতোভাবে বর্জন করা চাই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وما علينا إلا البلاغ

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্রি স্টাইলে ভিডিও/ছবি ছাড়া কি জায়েয হয়ে গেল?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

সম্প্রতি ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে উলামা ও তালাবার ছবি ও ভিডিও-র উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি প্রাণীর ছবি ও প্রাণীর ছবিসম্বলিত ভিডিও প্রসঙ্গে উলামা ও তালাবা সমীপে কিছু কথা নিবেদন করতে চাই। প্রথমে ভিডিও প্রসঙ্গে তারপর স্থির ছবি প্রসঙ্গে। তার আগে এ যাবত উলামায়ে উম্মত যেসব হাদীছের ভিত্তিতে ছবি, মূর্তি ও ভাস্কর্যকে হারাম বলে আসছেন তার মধ্য থেকে দু'টো মারফূ' হাদীছ উল্লেখ করে নিচ্ছি।

(١) إنَّ أصْحَابَ هذِه الصُّوَرِ يَومَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فيُقَالُ لهمْ: أحْيُوا ما خَلَقْتُمْ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٢١٠٥)

অর্থাৎ, যারা ছবি বা মূর্তি তৈরি করে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং (শাসিয়ে) বলা হবে, (খুব তো সৃষ্টি করতে পারো ভাব

www.maktabatulabrar.com

দেখিয়েছ, তা এখন) যা সৃষ্টি করছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে দেখাওতো! (বোখারী: হাদীছ নং ২১০৫)

(٢) إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٩٥٠ ومسلم في صحيحه برقم ٥٦٥٩)

অর্থাৎ, অবশ্যই কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি কঠিন শাস্তি হবে তাদের যারা চিত্র (এমনিভাবে মূর্তি/ভাস্কর্য) বানায়। (বোখারী: হাদীছ নং ৫৯৫০ ও মুসলিম: হাদীছ নং ৫৬৫৯)

এবার ভিডিও এবং ছবি প্রসঙ্গে আলোচনায় আসছি।

ভিডিও প্রসঙ্গ

ভিডিও ভিন্ন সময়ে করে পরে মিডিয়ায় আপলোড করা হোক বা সরাসরি লাইভে ছাড়া হোক জায়েয হলে উভয়টার একই হুকুম হওয়ার কথা। আবার না-জায়েয হলেও উভয়টার একই হুকুম হওয়ার কথা। উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ এখনও যে প্রকারের ভিডিওই হোক না কেন তা না-জায়েয তথা হারাম হওয়ার মতেই অটল রয়েছেন। পক্ষান্তরে অনেকে জায়েয হওয়ার পক্ষে চলে গিয়েছেন। কেউ কেউ তো স্পষ্টতই জায়েযের ফতোয়া দিয়ে দিয়েছেন, আবার অনেকে মৌখিকভাবে ফতোয়া না দিলেও নিজেদের উদ্যোগে ভিডিও তৈরি করে তা আপলোড করা কিংবা লাইভ করার মাধ্যমে বা এরূপ করার ব্যাপারে সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে কার্যত সব রকম ভিডিও জায়েয হওয়ার মতেই চলে গিয়েছেন।

যারা এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও তৈরি করে তা আপলোড করা কিংবা লাইভ করাকে জায়েয বলে ফতোয়া দিচ্ছেন তারা মূলত তিনটা যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। নিম্নে যুক্তিত্রয় কিঞ্চিত পর্যালোচনাসহ পেশ করা হল।

১. শরীয়তে যে ছবিকে হারাম করা হয়েছে তা হচ্ছে স্থির ছবি। আর ভিডিও বা লাইভে স্থির ছবি থাকে না। অর্থাৎ তাতে ইস্তিকরার (استقرار) তথা স্থিতি থাকে না। আর যে ছবিতে ইস্তিকরার তথা স্থিতি না থাকে তা আয়না বা পানিতে প্রতিবিম্বিত ছবির মত হওয়ায় জায়েয। অতএব ভিডিও বা লাইভের ছবি স্থির ছবি না হওয়ার কারণে জায়েয, তা নিষিদ্ধ ছবির আওতাভুক্ত নয়।

কিন্তু এখানে দু'টো বিষয় বিবেচনার রয়েছে। (এক) ভিডিও-র ছবিকে আয়না বা পানিতে প্রতিবিম্বিত ছবির উপর কেয়াস করা যায় কি না। যুক্তি বলে, যায় না। কারণ আয়না বা পানিতে প্রতিবিম্বিত ছবি আর ক্যামেরার ছবির মধ্যে বহুভাবে পার্থক্য রয়েছে। যেমন: (১) আয়না বা পানিতে প্রতিবিম্বিত ছবির কোন উপাদান নেই, সেটা নিছক একটা ছায়া। পক্ষান্তরে ডিজিটাল ছবির উপাদান থাকে। সেটা হল পিক্সেল। (পিক্সেল সম্বন্ধে পরে বিবরণ আসছে।) সুতরাং উপাদানযুক্ত একটা জিনিসকে নিছক একটা ছায়ার উপর কেয়াস করা কেয়াস মাআল ফারেক্ব। (২) ছায়ার উপর কোন হুকুম আসে না। পক্ষান্তরে ছবির উপর হুকুম আসে। যেমন কোন মুরব্বির ছায়ার উপর পা রাখলে সেটাকে ঐ মুরব্বির অবমাননা গণ্য করা হবে না, অথচ সেই মুরব্বির ছবির উপর পা রাখলে সেটাকে অবমাননা গণ্য করা হবে। এ হিসেবেও যার উপর হুকুম আসে সেই ছবিকে যার উপর হুকুম আসে না সেই ছায়ার উপর কেয়াস করা কেয়াস মাআল ফারেক্ব। বস্তুত ছায়া ও ছবি দুটো ভিন্ন ধরনের জিনিস। (৩) ক্যামেরার ছবি এখতিয়ারী, পক্ষান্তরে পানি ও আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়া গায়র এখতিয়ারী। অতএব এখতিয়ারী জিনিসের হুকুম গায়র এখতিয়ারী জিনিসের মত হতে পারে না। (দুই) ভিডিও-র ছবিতে ইস্তিকরার তথা স্থিতি না থাকার ভিত্তিতে ভিডিও জায়েয হওয়ার যুক্তি দাঁড় করানো গেলেও সে যুক্তি অকাট্য নয় বরং এখানে ভিডিও না-জায়েয হওয়ার যুক্তিরও অবকাশ থেকে যায়। তাহল ছবিতে স্থিতি থাকুক বা না থাকুক যে খারাবিগুলোর কারণে (যেসব ইল্লতের কারণে) ছবি নিষিদ্ধ হয়েছে সে খারাবিগুলো উভয় রকমের ছবিতেই বিদ্যমান। অতএব উভয় রকমের ছবিই নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন হওয়া চাই।

উলামায়ে কেরাম ছবি (তদ্রূপ মূর্তি/ভাস্কর্য) হারাম হওয়ার পেছনে যেসব খারাবী (তথা ইল্লত)-এর কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বিশেষ ৩টা খারাবি (যেগুলো ইবনুল আরাবি তার 'আহকামুল কুরআন'য়ে উল্লেখ করেছেন।) একটু মুদাল্লাল আকারে আমি পেশ করছি।

(১) **প্রথম খারাবী হল**- এর দ্বারা আল্লাহর খালক তথা "সৃষ্টিকরণ" কর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য (বলা যায় টেক্কা) হয়ে যায়। এজন্যই সহীহ হাদীছে

www.maktabatulabrar.com

এসেছে যারা ছবি বা মূর্তি তৈরি করে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং (শাসিয়ে) বলা হবে, (খুব তো সৃষ্টি করতে পারো ভাব দেখিয়েছ, তা এখন) যা সৃষ্টি করছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে দেখাওতো! হাদীছটি এই-

إنَّ أصْحَابَ هذِه الصُّوَرِ يَومَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فيُقَالُ لهُمْ: أحْيُوا ما خَلَقْتُمْ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٢١٠٥)

হাদীছটির তর্জমা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, হাতে ছবি তৈরি করলে যদি নিষিদ্ধ হতে পারে তাহলে ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তৈরি করলেও তা নিষিদ্ধ না হওয়ার কোন কারণ নেই, যেমন মূর্তি হাতে বানালে যেমন নিষিদ্ধ মেশিনের সাহায্যে বানালেও নিষিদ্ধ। বস্তুত ক্যামেরার ছবি হাতের বদলে মেশিনের তৈরি। তাই এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, ভিডিও বা ডিজিটাল ছবিতে ছবি আঁকা হয় না বরং একটা ছাপ নেয়া হয় মাত্র।

(২) **দ্বিতীয় খারাবী হল**- কাফেররা মূর্তি ও ছবির পূজা করে থাকে, অতএব কেউ পূজার উদ্দেশ্যে ছবি না রাখলেও এটা পূজার দিকে গড়াতে পারে বিধায় শুরু থেকেই তার পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তদুপরি এটা যারা পূজার উদ্দেশ্যে রাখে তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় তা নিষিদ্ধ তথা হারাম। শরীয়তে তাশাব্বুহ বিল কুফফার তথা কাফেরদের সঙ্গে (আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন কোন ধর্মীয় বিষয়ে) সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। এজন্যই সূর্য পূজারীরা সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় সূর্যের পূজা করে থাকে বিধায় এ দুই সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বস্তুত তাশাব্বুহ বিল কুফফার হারাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা' রয়েছে। যেমন ওয়ালীদ ইবনে রাশেদ আস-সায়ীদান রচিত تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع গ্রন্থে বলা হয়েছে,

أجمعوا على المنع من التشبه بالكفار فيما هو من عاداتهم وعبادتهم.

(৩) **তৃতীয় খারাবী হল**- ছবি দ্বারা ছবি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে আত্মিক সম্পর্ক কায়েমে হয়, আর এটা ধীরে ধীরে তার প্রতি সম্মান ও তার পূজার দিকে গড়ায়। আর ফিকহের উসূল রয়েছে-

ما أدى إلى الحرام فهو حرام. (قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام)

অর্থাৎ, যা হারামের দিকে গড়ায় তা হারাম। অতএব শুধু ছবি/মূর্তির পূজাই নয় ছবি বা মূর্তি/ভাস্কর্য তৈরি করাও হারাম।

ছবি হারাম হওয়ার এসব কারণের ভিত্তিতে ছবি স্থির হোক বা না হোক উভয় রকম ছবিই একই হুকুমভুক্ত তথা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। অন্তত এতটুকু তো বলতেই হবে যে, এক যুক্তিতে না-জায়েয মনে না হলেও আর এক যুক্তিতে না-জায়েয মনে হয়। অতএব জায়েয হওয়া এবং না-জায়েয হওয়া উভয়টার সম্ভাবনা রয়েছে। আর ফিকহ ও ফতোয়ার উসূল (মূলনীতি) অনুযায়ী কোন বিষয়ে জায়েয হওয়া ও না-জায়েয হওয়া উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকলে সেখানে না-জায়েয হওয়ার দিকটাকে প্রাধান্য দিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাকওয়া হল না-জায়েয হওয়ার দিকের উপর আমল করা। সেমতে এরূপ ভিডিও থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া। আর ফতোয়াও হওয়া নিয়ম তাকওয়ার দিক অনুসারে। উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত মূলনীতিটির পক্ষে কয়েকটি বরাত পেশ করা হল-

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. (الوجيز في شرح القواعد الفقهية لعبد الكريم زيدان : الصفحة ١٨٥، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه لمحمد بكر اسماعيل: الصفحة ١٢٢ و الأشباه والنظائر لابن نجيم : الصفحة ٣٠١)

ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم. (قواعد الفقه للسيد محمد عميم الإحسان المجددي : الصفحة ١١٤ برقم ٢٨٥)

যাহোক যারা টেলিভিশনসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও তৈরি করে তা আপলোড করা কিংবা লাইভ করাকে জায়েয বলে ফতোয়া দেন এটা ছিল তাদের একটা যুক্তি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পর্যালোচনা।

২. কেউ কেউ মিডিয়াতে ভিডিও ছাড়া জায়েয হওয়ার পক্ষে যুক্তি দেন এই বলে যে, বাতিল যে সূরতে আসে সেই সূরতেই তার মোকাবেলা করতে হয়। আর বর্তমানে বাতিল মিডিয়া জগতের মাধ্যমে ফিতনা ছড়াচ্ছে। তাই মিডিয়া জগতে এসে তার মোকাবেলা করতে হবে। এই যুক্তির ব্যাপারে কথা হল- মিডিয়া জগতের ফিতনা মিডিয়া জগতে এসেই

www.maktabatulabrar.com

মোকাবেলা করতে হবে- এই যুক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু এখানে ভাববার বিষয় হল- বাতিলরা মিডিয়া জগতে যে ফিতনা ছড়াচ্ছে সেই ফিতনা ছড়াচ্ছে কি বক্তব্যের মাধ্যমে না ভিডিওর মাধ্যমে। অর্থাৎ ফিতনা ছড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা কি বক্তব্যের না ভিডিও-র ছবির। স্পষ্ট কথা যে, ফিতনা ছড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা বক্তব্যের, ভিডিও-র ছবির নয়। তাহলে তার মোকাবেলার জন্য মিডিয়া জগতে অডিও ছাড়লেই বা কোন লেখা ছাড়লেই যথেষ্ট, ভিডিও-র আবশ্যকতা কীভাবে প্রমাণিত হল? তদুপরি "বাতিল যে সূরতে আসে সে সূরতে তার মোকাবেলা করা নিয়ম"-এর অর্থ আদৌ এ নয় যে, বাতিল কোন না-জায়েয তরিকায় এলেও আমাদেরকে সেই না-জায়েয তরিকায়ই আসতে হবে।

এই আলোচনা দ্বারা তাদের যুক্তিরও খণ্ডন হয়ে গেল যারা বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ছেড়ে দিলে পৃথিবীর বহু মানুষ দেখবে, তাদের দ্বীনী ফায়দা হবে। এখানেও ঐ একই কথা- ফায়দা হলে সেটা বক্তব্য দ্বারা হবে, ভিডিও-র ছবি দেখে নয়। অতএব অডিও-র দরকার আছে বলা যাবে ভিডিও-র নয়। অডিও ছাড়া শুধু লেখা দ্বারাও দ্বীনী ফায়দা পৌঁছানোর কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

৩. তাদের আরেকটা যুক্তি হল- দ্বীনী দাওয়াত, হকের প্রচার ও বাতিলের খণ্ডনে অডিও-র চেয়ে ভিডিও বেশি আকর্ষণীয় ও আবেদনময়ী হয়ে থাকে। এটাকে জরূরত গণ্য করা হবে। আর ফিকহের সর্বসম্মত একটা মূলনীতি হল-

الضرورات تبيح المحظورات. (الأشباه والنظائر ورد المحتار والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)

অর্থাৎ, জরূরত নিষিদ্ধ বিষয়াদিকে বৈধ করে দেয়।

অতএব এই জরূরতে ভিডিওকে জায়েয বলা হবে। কিন্তু বেশি আকর্ষণ ও বেশি আবেদন- এগুলোকে আদৌ 'জরূরত' আখ্যায়িত করা ঠিক কি না তা বিবেচনার দাবি রাখে বৈ কি। ফিকহের পরিভাষায় যেকোনো রকম প্রয়োজন বা হাজতকেই জরূরত (ضرورة) বলা হয় না। ফিকহের পরিভাষায় জরূরত বলা হয়-কোন গত্যন্তর না থাকাকে। যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যা না হলে চলেই না তা-ই হল জরূরী। যেমন শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সালেহ **القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة**

للتيسير গ্রন্থে বলেছেন,

إن المحرم يصبح مباحًا إذا عرض للمكلف ضرورة تقتضي ذلك؛ بحيث لا تندفع تلك الضرورة إلا بارتكاب ذلك المحرّم.

অর্থাৎ হারাম বিষয় তখনই মুবাহ হয় যখন শরীয়তের দায়িত্ব থাকা ব্যক্তির সামনে পেশ আসা কোন জরুরত তার তাগাদা করে এমনভাবে যে, সেই হারাম করা ছাড়া সেই জরুরত মেটে না।

বস্তুত ফিকহের পরিভাষায় জরূরত অনন্যোপায় অর্থে, অপারগতার অর্থে, বাধ্য-বাধকতার অর্থে, যা না হলে চলেই না সে অর্থে। যেমন: যা না করলে প্রাণ যাবে বা মারাত্মক রোগের আশংকা দেখা দিবে কিংবা যা না করলে কোন ফরয ওয়াজেব বর্জিত হওয়া অবধারিত হয়ে দাঁড়াবে ইত্যাদি। যেনতেন প্রয়োজনকেই 'জরূরত' বলা হয় না। যেমন আলেমগণ "জরূরত"-এর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত নিম্নের বক্তব্যগুলো লক্ষ করতে পারেন-

قال الجصاص: الضرورة هي خوف الضرر ... إما على نفسه أو على عضو من أعضائه. (أحكام القرآن للجصاص)

قال ابن تيمية : "الضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات إلخ. (مجموع الفتاوى).

'জরূরত'-এর এ ব্যাখ্যাকে সামনে রাখলে কি বেশি আকর্ষণ ও বেশি আবেদনকে 'জরূরত' আখ্যায়িত করা যায়? আদৌ না। কারণ ভিডিও-র পরিবর্তে অডিও-র দ্বারা বা কোন লেখা দ্বারা প্রমাণিত যখন কাজ চালিয়ে নেয়া যায় তখন ভিডিও "এটা না হলে চলেই না"- এমন পর্যায়ের জিনিস রইল না। অতএব তার ভিত্তিতে ভিডিওকে জায়েয বলা যায় কীভাবে? তবুও সিংহভাগ উলামা হযারাত যেহেতু এটাকেই জরূরত আখ্যায়িত করে ভিডিওকে জায়েয বলছেন বা জায়েয ভাবছেন, তাই তাদের বিরোধিতা না করেও অন্তত এটা বলতেই হচ্ছে যে, "তাকওয়া হল বিরত থাকা"- এতটুকু অবশ্যই বলতে থাকার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তা বলা হচ্ছে না। আর তা না বলার কারণে জরূরত প্রয়োজন (হাজত) কোনোকিছু ছাড়াই বল্গাহীনভাবে ভিডিওর ব্যবহার চলছে। একজন আলেমের বিয়ে হচ্ছে, তার ভিডিও পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। এমনকি কেউ কেউ বউয়ের সাথে বিনোদন করে তার ভিডিও পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছে। কেউ কোথাও ঘুরতে গিয়ে

www.maktabatulabrar.com

নৌকায় চড়েছে, বা পিকনিক করেছে তার ভিডিও ছেড়ে দিচ্ছে। মাঠে হাল চালাচ্ছে তার ভিডিও ছাড়ছে। কেউ তার ছোট্ট বাচ্চার সাথে দুষ্টুমি করেছে তার ভিডিও ছেড়ে দিচ্ছে। এরকম বল্গাহীনভাবে কত রকমের ভিডিও ছাড়া হচ্ছে তার বিবরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। আলেম পরিচয় প্রদানকারী যারা এগুলো করছেন তাদের কথাই বলছি। এগুলোতে দ্বীনী কী জরূরত বা প্রয়োজন রয়েছে? যদি তাকওয়ার দিকটি প্রচার করা হত, তাহলে অবস্থার এতটা অবনতি ঘটত না, এরকম বল্গাহীন ভিডিও চর্চার রেওয়াজ ঘটত না।

উল্লেখ্য: একান্তই যদি অতিরিক্ত আকর্ষণ সৃষ্টির চিন্তা জাগে তাহলে অডিও-র সাথে প্রাণীর ছবি ছাড়া কোন ভিডিও দেয়া যেতে পারে। তাতে যদি কিছু আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

স্থির ছবি প্রসঙ্গ

স্থির ছবির মধ্যে যেগুলো প্রিন্ট কপিতে আনা হয় সেগুলোকে কেউ জায়েয মনে করছেন কি না তা জানা নেই। তবে যেগুলো ডিজিটাল ছবি সেগুলো প্রিন্ট কপিতে আসার আগ পর্যন্ত জায়েয বলেই অনেকে ভাবছেন। এই ডিজিটাল ছবির মধ্যে কিছু আছে যা বিভিন্ন দ্বীনী আর্টিকেল, দ্বীনী পোস্ট বা সাক্ষাৎকারের শুরুতে দেয়া হয় এগুলোকে অনেকেই জয়েয ভাবছেন।

যারা এসব স্থির ছবিকে নিছক ডিজিটাল ছবি হওয়ায় জায়েয ভাবছেন, তাদের যুক্তিও পূর্বের দু'টো যুক্তি। যথা:

১- ডিজিটাল ছবি প্রিন্ট কপিতে আসার আগ পর্যন্ত স্থির ছবি নয়। প্রিন্ট কপিতে আসার আগ পর্যন্ত তার কোন ইস্তিকরার (استقرار) তথা স্থিতি নেই। বরং মেমোরিতে কিছু পিক্সেল (চরীবষ) থাকে, অর্ডার দিলে সেগুলো জড় হয়ে ছবি শো করে। মূল মেমোরিতে কোন স্থির ছবি থাকে না। পিক্সেল বলতে বোঝায় কোন গ্রাফিক ছবির ক্ষুদ্রতম অংশ বা বিন্দু। মেমোরিতে স্থির ছবি থাকে না বরং ছবির পিক্সেল থাকে। সহজ অভিব্যক্তিতে বলা যায় মেমোরিতে কিছু ইলেক্ট্রোনিক্স কণা থাকে। অর্ডার দিলে সেগুলো জড় হয়ে ছবি শো করে।

কিন্তু এখানে এক নম্বর কথা হল মেমোরিতে ছবি কী অবস্থায় থাকে বা মেমোরিতে ছবির কী থাকে তা নিয়ে আলোচনা নয়, আলোচনা হল

স্ক্রিনে যে ছবি শো হয় তা নিয়ে। আর স্ক্রিনের ছবি তো স্থিরই, সেটাকে কণা নয় বরং ছবিই মনে হয়। দুই নম্বর কথা হল এখানেও পূর্বের ন্যায় এরূপ বলার অবকাশ রয়েছে যে, ছবি স্থির হোক বা স্থির না হোক যে খারাবীগুলোর কারণে ছবি নিষিদ্ধ হয়েছে সে খারাবীগুলো উভয় রকম ছবিতেই বিদ্যমান, যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব প্রিন্ট ছবির ন্যায় ডিজিটাল ছবিও নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। অন্তত এতটুকু তো বলতেই হবে যে, এক যুক্তিতে না-জায়েয মনে না হলেও আর এক যুক্তিতে না-জায়েয মনে হয়। অতএব জায়েয হওয়া এবং না-জায়েয হওয়া উভয়টার সম্ভাবনা রয়েছে। আর ফিকহ ও ফতোয়ার উসূল (মূলনীতি) অনুযায়ী কোন বিষয়ে জায়েয হওয়া ও না-জায়েয হওয়া উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকলে সেখানে তাকওয়া হল না-জায়েয হওয়ার দিকের উপর আমল করা। সেমতে এরূপ ছবি থেকেও বিরত থাকা তাকওয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকওয়ার দিককে একেবারে পশ্চাতে ফেলে যেভাবে বল্গাহীন ছবি চর্চায় নামা হয়েছে তা কোনোক্রমেই কাম্য নয়।

২- ডিজিটাল স্থির ছবি যেগুলো বিভিন্ন দ্বীনী আর্টিকেল, দ্বীনী পোস্ট বা সাক্ষাৎকারের শুরুতে দেয়া হয় এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট আর্টিকেল বা পোস্ট ইত্যাদির আকর্ষণ ও আবেদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ যুক্তি যে খুব একটা জোরালো নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভিডিও-র ছবি নড়াচড়া দেখে না হয় কিছুটা আবেদন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু স্থির, নড়ে না-এমন ছবি দেখলে পাঠকদের মনে বক্তব্যের ব্যাপারে কীইবা আবেদন বৃদ্ধি পায়। এটা নিতান্তই ঠুনকো যুক্তি।

তবে একটা কথা বলে রাখতে হচ্ছে যে, পাসপোর্ট বা ভিসা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে যে ছবি ব্যবহার তা জরুরতের পর্যায়ভুক্ত। এগুলোর সঙ্গে বিদেশ গমনকারী ব্যক্তির এবং যে দেশে সে গমন করবে সে দেশের নিরাপত্তার বিষয়ও জড়িত। ফলে তা বৈধ। এমনিভাবে অন্যান্য জরুরতের ক্ষেত্রেও ছবি ব্যবহার বৈধ। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় প্রয়োজনে বিদেশীদের সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার বা অনুষ্ঠানাদি হয়, যেখানে ছবি থেকে নিজেকে দূরে রাখা সম্ভবও হয় না, সেগুলোকেও বৈধতার পর্যায়ে ফেলা যাবে। কারণ সেখানে একদিকে রাষ্ট্রের বৃহত্তর বিষয় হলে তা জরুরতের পর্যায়ে পড়তে পারে, আবার এরূপ অনুষ্ঠানাদিতে ছবি ভিডিও এড়ানোর ক্ষেত্রে কিছুটা অপারগতাও থাকে।

www.maktabatulabrar.com

কিন্তু এরকম কোন জরুরত বা অপারগতা ছাড়া, এমনকি কোনো প্রয়োজন ছাড়া অনেকেই নিছক বিনোদনের জন্য বা নিজের চেহারা প্রদর্শনের জন্য ছবি আপলোড করে থাকেন। যেমন অনেকে ফেসবুক টুইটার ইত্যাদির প্রোফাইলে ছবি যুক্ত করেন, আবার কয়েকদিন পর পর নতুন পোজ দিয়ে ছবি তুলে প্রোফাইল পিকচার আপডেট করেন। কেউ কেউ কোন লেখা ছাড়াই খামাখা চেহারার জেল্লা দেখানোর জন্য ছবি পোস্ট করেন, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এটা সেটা করে সেগুলোর পিক দেন বা ছবি দিয়ে স্টোরি ছাড়েন। একজন প্রসিদ্ধ আলেম এসেছেন তো কেউ তার সঙ্গে সেলফি তুলে রাখছেন, এমনকি গর্বের সাথে সেই সেলফি তোলার বিবরণ দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার পোস্টও ছাড়ছেন। এগুলো কী চলছে? এগুলোর কী দ্বীনী প্রয়োজন রয়েছে? যারা এমনটা করছেন তারা সেটাকে জায়েয ভেবে করছেন নাকি না-জায়েয জেনেও করছেন আল্লাহই ভাল জানেন। তবে ডিজিটাল ছবি হওয়ার তথা স্থিতি না থাকার যুক্তিতে জায়েয হওয়ার সম্ভাবনা কেউ বললেও যেহেতু না-জায়েয হওয়ার দিকও রয়েছে তাই উলামায়ে কেরামের তাকওয়া অনুসারী হয়ে এ থেকে বিরত থাকাই কাম্য ছিল।

এভাবে তাকওয়ার দিকটি উপেক্ষা করে ফ্রি স্টাইলে ছবি ছাড়াকেও যদি জায়েয বলে দেয়া হয়, তাহলে উলামায়ে উম্মত এ যাবত সহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ছবি হারাম হওয়ার যে ফতোয়া দিয়ে আসছেন তার প্রয়োগক্ষেত্র আর বাকি রইবে কোথায়? হাদীছের ওঈদ প্রয়োগের ক্ষেত্র বাকি রইবে কোথায়? শুধু ছবির প্রিন্ট কপিকে প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে বাকি রাখা হবে? তা এই যুগে অফিস আদালত সর্বত্র প্রিন্ট ছবির প্রয়োজন হয়, যেকোনো মুহূর্তে এরকম ছবির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে- এই যুক্তিতে যদি সব সময় কাছে প্রিন্ট ছবি রাখাকে এবং আরও আগে বেড়ে সব জায়গায় ছবি ব্যবহারকেও জায়েয বলে দেয়া হয় বা মনে করে নেয়া হয়? বোধ হয় কিছু আলেম এমনটাই ভাবতে শুরু করেছেনও। ওয়াজের পোস্টারে তাদের ছবি আসতে শুরু করেছে, যার প্রতিবাদও তাদের পক্ষ থেকে আসছে না। নাউযু বিল্লাহ! এটা কি দ্বীনের ক্ষেত্রে মুদাহানাত নয়?

হাদীছের সেই কঠিন বক্তব্যকে আমরা কীকরে সর্বতোভাবে এড়িয়ে যেতে পারি, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে ইরশাদ করেছেন-

إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٩٥٠ ومسلم في صحيحه برقم ٥٦٥٩)

অর্থাৎ, অবশ্যই কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি কঠিন শাস্তি হবে তাদের যারা চিত্র (এমনিভাবে মূর্তি/ভাস্কর্য) বানায়। (বোখারী: হাদীছ নং ৫৯৫০ ও মুসলিম: হাদীছ নং ৫৬৫৯)

অতএব তাকওয়া তথা খোদাভীতিকে উপেক্ষা করে হুজুগের প্রবাহে ভেসে যাওয়া বড়ই খতরার বিষয়। যদি উলামায়ে কেরামই তাকওয়াকে উপেক্ষা করে এভাবে হুজুগের প্রবাহে ভেসে চলেন, তাহলে সাধারণ মানুষকে তাকওয়ার কথা বলার জন্য রইবে কারা!

তাই ভিডিও ডিজিটাল ছবি জায়েয হওয়ার প্রবক্তা উলামায়ে কেরামের কাছে নিবেদন- মাসআলাটিতে নজরে ছানী করুন। আপাতত অন্তত এতটুকু অবশ্যই বলুন, তাকওয়া হল এসব ভিডিও ছবি থেকে বিরত থাকা।

وما علينا إلا البلاغ.

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যদি উসূল ও দালায়েলের ভিত্তিতে আমার বক্তব্যের খণ্ডনে এবং ডিজিটাল ছবি ও ভিডিও অবাধে জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে কোন মুহাক্কিক আলেমের অকাট্য বক্তব্য সামনে আসে, তাহলে আমার বক্তব্যে সংশোধনী আনতে আমার কোনোরূপ জিদ থাকবে না ইনশা আল্লাহ।

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

www.maktabatulabrar.com

সোশ্যাল মিডিয়ায় লেগেছে ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ: আপনি কী করবেন?

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد :

অনেক সময় দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বা দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ বিরোধ লেগেছে। তখন অনেকেই সেই বিবাদ বিরোধের সাথে জড়িয়ে পড়েন। কেউ এই ব্যক্তির বা এই পক্ষের দিকে যান, কেউ ঐ ব্যক্তির বা ঐ পক্ষের দিকে যান। এভাবে ক্রমান্বয়ে দুই দিকই ভারী হয়ে ওঠে। দুই দিক থেকেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বক্তব্য আসতে থাকে। তা আহলে হকের পক্ষে কারও বক্তব্য যদি দলীল-আদিল্লাহ ভিত্তিক হয় বা শালীন ভাষায় সুন্দর যুক্তি ভিত্তিক হয় তাহলে তো ঠিক আছে। মুনকার তথা শরীয়ত-বিরুদ্ধ কিছু দেখলে তার বিরুদ্ধে বলা তথা নাহি আনিল মুনকার করা ঈমানী দায়িত্ব। সেই দায়িত্বই তারা পালন করছেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে আমরা এমন অনেক কিছু হতে দেখি যা ঠিক নয়, যা নাহি অনিল মুনকারের সহীহ তরীকা নয়। যেমন: প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ করা, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা, প্রতিপক্ষের মানহানিকর বক্তব্য প্রদান করা, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এগুলো ঠিক নয়। এগুলো যে ঠিক নয় তা তো সকলেই জানে,

কিন্তু আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেকেই এগুলো করে থাকে। হক পক্ষের হয়েও যারা এরূপ আবেগ চর্চায় বেসামাল হন, তাদের এরূপ আবেগ চর্চা হকপন্থী লোককে বা হক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা এর কারণে বাতিল প্রতিপক্ষ তাদের লোকদের দেখাতে সক্ষম হয় যে, এই পক্ষ অশালীন অভদ্র। এতে তারা হক পক্ষের বিরুদ্ধে বলার আরও ইস্যু পেয়ে যায়। এতে হক পক্ষের ক্ষতি সাধিত হয়। তাহলে তারা এলেন হক পক্ষের বন্ধু হয়ে উপকার করতে কিন্তু করলেন দুশমনের মত ক্ষতি। এরূপ লোকদেরকে বলে "নাদান দোস্ত"। অনেকে ভাল করে দলীল-আদিল্লাহ না বুঝেই এমনভাবে কিছু বলেন প্রতিপক্ষ যা খণ্ডন করে দিতে সক্ষম হয়। এর দ্বারাও হকপন্থী লোককে বা হক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এটাও নাদানদোস্তী।

আপনি যেকোনো বাতিল-ভণ্ডের বিরুদ্ধে বা যেকোনো না-হক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে চাইলে তা অবশ্যই এমন হওয়া চাই যার খণ্ডন তারা বা তাদের পক্ষের লোকেরা করতে সক্ষম হবে না। আপনি এমন কিছু বললেন যা তারা খণ্ডন করে দিতে সক্ষম হল, তাহলে আপনার বলা দ্বারা তাদের ক্ষতি নয় বরং ফায়দা হয়ে গেল। কারণ তারা আপনার বক্তব্য ও যুক্তি খণ্ডন পূর্বক তাদের লোকদেরকে দেখাতে সক্ষম হল যে, এই পক্ষের যুক্তি দুর্বল। এতে করে তাদের লোকজন তাদের ভ্রান্তিতে আরও অটল হল। হক পক্ষের বিরুদ্ধে বলার আরও ইস্যু পেয়ে গেল। এমন হলে তার জন্য দায়ী আপনার দুর্বল মন্তব্য বা দুর্বল উপস্থাপনা তথা আপনি। এতে আপনার সম্মানেরও ক্ষতি হবে- বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে ধরাশায়ী হবেন। তাই কোন বাতিল-ভণ্ডের বিরুদ্ধে বা যেকোনো না-হক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যা মনে আসে হুট করে বলে দেয়া সমীচীন নয়। কোনকিছু বলতে চাইলে আপনার দলীল পূর্ণ মজবুত কি না, আপনার বক্তব্য প্রতিপক্ষ খণ্ডন করতে সক্ষম হবে না- এমন কি না ভাল করে ভেবে নিন। মনে রাখবেন প্রতিপক্ষেরও লোকজন থাকতে পারে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক, আর তারা আপনার কথা খণ্ডনের চেষ্টা না করে বসে থাকবে না। অতএব ভেবে-চিন্তে পূর্ণ আঁটসাট বেঁধেই আপনাকে কথা বলতে হবে। তেমনটা না পারলে কিছু বলা থেকে বিরত থাকুন। যারা যোগ্য, যারা ভেবে-চিন্তে পূর্ণ আঁটসাঁট বেঁধে মজবুত দলীল দিয়ে কথা বলতে সক্ষম তাদের উপরই বিষয়টা ছেড়ে দিন। যা বলার তারাই বলবেন। নাদান দোস্ত হবেন না।

www.maktabatulabrar.com

একথা ভাবা ঠিক হবে না যে, খারাপ কিছু দেখলে তার বিরুদ্ধে বলা তথা নাহি আনিল মুনকার করা দায়িত্ব, তাই যে যেভাবে পারে যে যতটুকু পারে সে সেভাবেই ততটুকু তার বিরুদ্ধে বলবে। এটা ভাবা ঠিক হবে না এ কারণে যে, হাদীছে নাহি আনিল মুনকার করার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে "ইস্তিতাআত" (استطاعة) তথা সাধ্য থাকার শর্ত উল্লেখিত হয়েছে। আর সাধ্য কথাটির মধ্যে ভাল করে বলতে পারাও অন্তর্ভুক্ত। অতএব ভাল করে বলার যোগ্যতা না থাকলে কিছু বলতে যাবেন না। বিশেষত যেখানে ভাল করে বলার লোক থাকে এবং যেনতেন করে বললে ক্ষতির সম্ভাবনা সেখানে যারা ভাল করে বলতে পারবেন না তাদের অবশ্যই বিরত থাকা চাই। অন্যথায় দু'টো বিচ্যুতি হবে। (১) শরীয়তের নীতি হল গুরুজনদের চেয়ে আগে বেড়ে কথা না বলা। আর যে ব্যাপারে যিনি ভাল জানেন ভাল বলতে পারেন সে ব্যাপারে তিনি গুরুজন। অতএব তার উপস্থিতিতে অন্যদের আগে বেড়ে কিছু বলতে যাওয়া এই নীতির লঙ্ঘন। এ নীতি প্রমাণিত হয় সূরা হুজুরাতের প্রথম আয়াত থেকে, যাতে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের সম্মুখে আগে বেড়ে কথা বলো না।" এ আয়াত থেকে উপরোক্ত নীতিটি কীভাবে প্রমাণিত হয় তা একটু দীর্ঘ বর্ণনা সাপেক্ষ। কারও বুঝে না এলে প্রয়োজনে তাফসীরের কিতাবাদি দ্রষ্টব্য। (২) ভাল করে বলতে না পারার কারণে যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে -যার বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে- সেই ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার জন্য এরূপ লোকদের বিরত থাকা চাই। অন্যথায় দ্বীনের ক্ষতি করার দায় এসে যেতে পারে।

তবে হ্যাঁ যেখানে ভাল করে বলার মত লোক না থাকে এবং প্রতিপক্ষ থেকেও খণ্ডনের সম্ভাবনা না থাকে সেখানে কম জাননেওয়ালাও আল্লাহর উপর ভরসা করে যতটুকু সম্ভব নাহি আনিল মুনকার করবেন। আর সেটা হবে এই নীতি অনুসরণ করে যে, ما لا يدرك كله لا يترك كله অর্থাৎ, কোন কাজ পুরোপুরি পারা না গেলে মোটেই করা হবে না তা যেন না হয়। (বরং যতটুকু পারা যায় ততটুকু করা হবে।) এরূপ ক্ষেত্রে যার যতটুকু জানা আছে ততটুকুর ভিত্তিতে নাহি আনিল মুনকার করলে পূর্বে উল্লেখিত দু'টো বিচ্যুতির কোনটা দেখাও দিবে না।

উল্লেখ্য, "কোন কাজ পুরোপুরি পারা না গেলে মোটেই করা হবে না তা যেন না হয়।"- এ নীতিটি একাধিক আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে একটি আয়াত ও একটি হাদীছ উল্লেখ করছি।

আয়াত:

قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (الآية ١٦ من سورة التغابن)

অর্থাৎ, (আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,) তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা তাগাবুন : ১৬) উল্লেখ্য, এখানে "আল্লাহকে ভয় করো" অর্থ আল্লাহর বিধি-নিষেধ মান্য করো। এখানে যতটুকু সাধ্য ততটুকু করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

হাদীছ:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

(متفق عليه)

অর্থাৎ, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,) যখন আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই তার যতটুকু তোমাদের সাধ্য তা পালন করো। (বোখারী: হাদীছ নং ৭২৮৮ ও মুসলিম: হাদীছ নং ৩৩২১)

সারকথা- কোন মুনকার তথা শরীয়ত-বিরুদ্ধ কিছু দেখলে যদি তার বিরুদ্ধে বলার কেউ না থাকে এবং আপনি কিছু বললে তার প্রতিবাদ করার মতও কেউ না থাকে, তাহলে আপনি যতটুকু যেভাবে সম্ভব তার বিরুদ্ধে বলুন। আর যদি আপনার চেয়ে ভাল বলার লোক থাকে, তাহলে বলার বিষয়টা তাদের উপর ছেড়ে দিন। বিশেষত আপনার অপরিপক্ক বলার দ্বারা যদি হক পক্ষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে অবশ্যই বলা থেকে বিরত থাকুন।

وما علينا إلا البلاغ.

www.maktabatulabrar.com

কথায় কথায় কাফের ফতোয়া দেয়া প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد : فقد قال الله تعالى : ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. وقال تعالى : اتريدون ان تهدوا من اضل الله. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

কথায় কথায় কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার প্রবণতা অতীতেও কমবেশ ছিল, তবে ইদানিং এটা খুব বেশি ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এক আলেম আরেক আলেমকে, এক পীর আরেক পীরকে, এক পীর বা আলেমের অনুসারীরা সেই পীর বা আলেমের বিরোধীদেরকে, এক দল আরেক দলকে অবলীলায় কাফের ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে। ফেসবুকে এটা চলছে দেদারছে, একেবারেই লাগামহীনভাবে। কিন্তু তাকফীর (تكفير) তথা কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার বিষয়টা এমন লঘু বিষয় নয় যে, কথায় কথায় যেনতেন কারণে কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যায়। কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার বিষয়টা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। এটা অত্যন্ত সতর্কতা ও ভারসাম্যের দাবি রাখে। কেননা প্রকৃতপক্ষেই যদি কারও মতবাদ বা চিন্তা-চেতনা কুফরি পর্যায়ে উপনীত না হয়ে থাকে বরং ঈমানের আওতার মধ্যে থাকে, তাহলে তাকে কাফের বলে ফতোয়া দেয়ার অর্থ দাঁড়াবে ঈমানকে কুফরী বলা, একজন মুমিনকে কাফের বলা। তাহলে ফতোয়া প্রদানকারী যেহেতু নিজেকে মুমিন বলে পরিচয় দিচ্ছে

আর তারই ফতোয়া মোতাবেক মুমিন হচ্ছে কাফের, তাহলে তারই ফতোয়া মোতাবেক সে নিজেই কাফের হয়ে যাচ্ছে। অতএব দেখা গেল অন্যায়ভাবে কাউকে কাফের ফতোয়া দিলে সে ফতোয়া তারই দিকে বুমেরাং হয়। এক হাদীছে এ কথাই বলা হয়েছে। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ومن دعا رجلا بالكفر ، أو قال : عدو الله ، وليس كذلك ، إلا حار عليه.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন লোককে কাফের বলে ডাকবে কিংবা আল্লাহর দুশমন বলবে অথচ সে লোকটি তেমন নয়, তাহলে সেটা তারই উপর ফিরে আসবে। (মুসলিম)

তবে হ্যাঁ মুসলমান নামধারী বা মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দানকারী কেউ যদি প্রকৃতপক্ষেই কাফের হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাফের ফতোয়া দেয়ার মাধ্যমে তার অবস্থানকে মুসলমানদের সামনে পরিষ্কার করে দেয়া জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। যাতে তার পোষণ করা কুফরী মতবাদ বা কুফরী চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে সকলে সতর্ক হয়ে যায় এবং তাকে মুসলমান মনে করে সরল বিশ্বাসে তার মতবাদ ও চিন্তা-চেতনা গ্রহণ করে বিভ্রান্ত না হয়। এরূপ লোককে কাফের আখ্যায়িত না করা অর্থ তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলে স্বীকৃতি প্রদান করা। কুরআনে কারীমে এটা নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেছেন তোমরা কি তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলতে চাও? (সূরা নিছা: ৮৮)

তাহলে দেখা গেল কখনও তাকফীর করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ থাকে আবার কখনও তাকফীর করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। অতএব যারা মনে করে কোনো অবস্থাতেই কাউকে তাকফীর করা যাবে না, তাকফীর করলেই তারা সেটাকে কাদা ছোড়াছুড়ি আখ্যায়িত করে সর্বাবস্থায় তাকফীর করা থেকে উলামায়ে কেরামকে বিরত রাখতে চায়, তারা তাকফীর বিষয়ে ছাড়াছাড়িতে রয়েছে। আবার যারা কথায় কথায় খুঁটিনাটি কারণে বা সামান্য ভুল-বিচ্যুতির দরুণ তাকফীর করে বসে, তারা রয়েছে বাড়াবাড়িতে। তাকফীর বিষয়ে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি- কোন রকম প্রান্তিকতা নয় বরং সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকা চাই। যে অবস্থায়

www.maktabatulabrar.com

তাকফীর নিষিদ্ধ সে অবস্থায় তাকফীর থেকে অতি অবশ্যই বিরত থাকা চাই, আবার জরুরী অবস্থায় তাকফীর করাও চাই।

এখন রয়ে গেল কোন্ অবস্থায় তাকফীর নিষিদ্ধ আর কোন্ অবস্থায় তা জরুরী? তো এ ব্যাপারে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছ-এর ভিত্তিতে বেশ কিছু মূলনীতি দাঁড় করেছেন যেগুলোকে 'উসূলে তাকফীর' (কাফের আখ্যায়িত করা না করার মূলনীতি) বা তাকফীরের মূলনীতি বলা হয়। কাউকে কাফের বলে ফতোয়া দিতে হলে অবশ্যই তা সেসব মূলনীতির আলোকে হতে হবে। সেসব মূলনীতি সামনে রাখলে কথায় কথায় যেনতেন কারণে কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার অবকাশ বের হয়ে আসে না। কারও সেসব মূলনীতি জানা থাকলে তার কাছে তাকফীর-এর বিষয়টা লঘু বোধ হবে না। তাকফীর-এর বিষয়টা কেবল তার কাছেই লঘু বোধ হয় যে সেসব মূলনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, মূর্খ। এরূপ অজ্ঞ-মূর্খরাই কথায় কথায় খুঁটিনাটি কারণে, ঠুনকো দলীলের ভিত্তিতে বিভিন্নজনকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়ে থাকে। এরূপ অজ্ঞ-মূর্খরা আপন আপন ভক্ত অনুসারীদের পরিমণ্ডলে গলাবাজি করে, আস্ফালন করে অন্যকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়ে হয়তো বাহবা পায়, শ্লোগান পায়, ফেসবুকে নেটে লাইক শেয়ার পায় কিন্তু বিজ্ঞজনেরা বুঝতে পারেন তাদের ফতোয়া কতটা মূর্খতাপ্রসূত।

তাকফীরের মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ মূলনীতি হল- কোন মুসলমানের কোন কথা বা কাজ কুফর কি না- এ ব্যাপারে উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকলে তাকে সেই কথা বা কাজের ভিত্তিতে কাফের বলে ফতোয়া দেয়া যাবে না। এমনকি কুফরের দিকটার সম্ভাবনা অধিক হলেও। এমনকি কুফরের দিকের সম্ভাবনা ৯৯ ভাগ আর কুফর না হওয়ার সম্ভাবনা ১ ভাগ হলেও। অর্থাৎ কুফর না হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় তাকফীর করা যায় না। কেবলমাত্র কারও কোন কথা বা কাজ একশত ভাগ নিশ্চিত কুফরির সম্ভাবনাযুক্ত হলেই তার কারণে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে। (জাওয়াহিরুল ফিকহ)

তাকফীরের মূলনীতিসমূহের মধ্যে আর একটি বিশেষ মূলনীতি হল- একমাত্র এমন কোন বিষয় অস্বীকার করার কারণেই তাকফীর করা যাবে যার প্রামাণিকতাও অকাট্য (قطعي الثبوت) মর্ম জ্ঞাপনও অকাট্য (قطعي الدلالة)। কোন বিষয়ের প্রামাণিকতা যদি অকাট্য না হয় কিংবা

কোন কিছুর মর্মে যদি ভিন্ন কোন সম্ভাবনা থাকে (তাহলে সেটা মর্ম জ্ঞাপনে অকাট্য নয়) তেমন বিষয় কেউ অস্বীকার করলে তাকে তাকফীর করা যায় না। (প্রাগুক্ত)

অতএব খুঁটিনাটি কারণে বা সামান্য ভুল-বিচ্যুতির দরুণ কিংবা একটু সন্দেহমূলক কথা বা কাজের কারণে কিংবা ঠুনকো দলীলের ভিত্তিতে কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা কোনোক্রমেই জায়েয নয়, যেমনটা করতে দেখা যায় শরীয়ত সম্বন্ধে অজ্ঞ কিংবা হঠকারী কিছু লোককে।

তাকফীরের আরও যেসব মূলনীতি রয়েছে সবগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে ইবনুল হুমাম-এর আল-মুসামারাহ, ইবনু আবিদীন-এর রদ্দুল মুহতার (শামী), ইবনে তাইমিয়ার কিতাবুল ঈমান ও আস-সারিমুল মাসলূল, তাফতাযানী-এর শরহুল আকায়েদ, মোল্লা আলী কারী-এর শরহুশ শিফা ও শরহুল ফিকহিল আকবার এবং আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী-এর 'ইকফারুল মুলহিদীন' প্রভৃতি। উর্দুতে মুফতী শফী সাহেব রচিত 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' ও 'ইসলাম আওর কুফর'। এবং বাংলা ভাষায় (সংক্ষেপে জানার জন্য) আমার রচিত 'ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ' গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদ।

পরিশেষে একটা কথার পুনরাবৃত্তি করে বক্তব্য শেষ করছি। তা হল তাকফীরের বিষয়টা কোন লঘু বিষয় নয়, এটা অনেক গুরুতর বিষয়। এটাকে ছেলেখেলায় পরিণত করা থেকে অবশ্যই আমাদের বিরত থাকা উচিত। মোল্লা আলী কারী শরহুশ শিফা গ্রন্থে বলেছেন,

إدخال كافر في الملة الاسلامية أو إخراج مسلم عنها عظيم في الدين.

অর্থাৎ কোন কাফেরকে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা কোন মুসলমানকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহির্ভূত করা অনেক গুরুতর বিষয়।

অতএব তাকফীরের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা চাই, জযবার মাথায় কাউকে তাকফীর করে নিজে যেন ফেঁসে না যাই। জযবায় বা হুজুগে শরীয়তের নীতিমালা যেন লঙ্ঘন করে না বসি।

আল্লাহ্ আমাদেরকে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত হওয়ার এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وما علينا إلا البلاغ.

www.maktabatulabrar.com

যেগুলো ইসলামী গবেষণার সঠিক ফর্মুলা নয়

কুরআন-হাদীস শাশ্বত। কিয়ামত পর্যন্ত এর বিধি-বিধান বহাল থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সামনে যত দ্বীনী প্রয়োজন আসবে, যত দ্বীনী সমস্যা দেখা দেবে, সব ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। কুরআন-হাদীসে কোনো কিছু ছেড়ে দেয়া হয়নি; সবকিছুই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

এই কিতাবে আমি কোনো কিছু ছেড়ে দিইনি। (সূরা আনআম : ৩৮)

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ.

আর আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক (জরুরী) বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনাকারী। (সূরা নাহল : ৮৯)

কিতাবে তথা কুরআনে সবকিছু বলে দেয়া হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, সবকিছু বিশদভাবে বলে দেয়া হয়েছে; বরং অনেক বিষয় তো বিশদভাবেই বলে দেয়া হয়েছে, আবার অনেক বিষয়ের মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে সেগুলো বলা না হলেও বর্ণিত মূলনীতির মধ্যে সেগুলো এসে গিয়েছে। আবার অনেক বিষয় ইশারা-ইঙ্গিতে বলে দেয়া

হয়েছে। মুজতাহিদ ও গবেষকগণ সেই মূলনীতি ও ইশারা-ইঙ্গিত থেকে নতুন সৃষ্ট বিষয়াদির ব্যাপারে সমাধান বের করে নেবেন। কিংবা যেসব বিষয়ে ভাষ্য নেই, সেগুলোর সমাধান তার অনুরূপ যেসব বিষয়ে ভাষ্য আছে, সেগুলোর ওপর কিয়াস করে বের করে নেবেন।

মুজতাহিদ ও গবেষকগণ উসূল ও ইশারা-ইঙ্গিত থেকে কীভাবে নতুন সৃষ্ট বিষয়াদির হুকুম বের করবেন, যেসব বিষয়ে ভাষ্য নেই সেগুলোকে ভাষ্য আছে এমন বিষয়ের উপর কীভাবে কিয়াস করবেন, তথা কীভাবে ইজতিহাদ-গবেষণা করবেন তার বিধিবদ্ধ ফর্মুলা বা সূত্র রয়েছে। উসূলে ফিক্হের কিতাবপত্রে সেগুলো সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে। এই সূত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে–

١. عَامٌّ وخَاصّ ٢. مُطْلَقٌ ومُقَيَّدٌ ٣. مُشْتَرَكٌ ومُؤَوَّلٌ ٤. حَقِيقَةٌ ومَجَازٌ ٥. صَرِيْحٌ وكِنايَةٌ ٦. عِبارَةُ النّصِّ ٧. إشَارَةُ النّصِّ ٨. اقْتِضاءُ النّصِّ ٩. دَلاَلَةُ النّصِّ ١٠. ظَاهِرٌ ١١. نَصٌّ ١٢. مُفَسّرٌ ١٣. مُحْكَمٌ ١٤. خَفِيّ ١٥. مُشْكِلٌ ١٦. مُجْمَلٌ ١٧. مُتَشابِهٌ

-ইত্যাদি। এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলি অনুসারে ইস্তিমবাত-ইস্তিদলাল করতে হয়। এসব সূত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবিয়ীন-এর ইজতিহাদ-গবেষণার তরীকা দেখেই বের করা হয়েছে। কিছু ফর্মুলা এমন রয়েছে, যা স্বতঃসিদ্ধ ও আপনা-আপনি স্পষ্ট (بديهى /Self Evident), যার কোনো দলীলের প্রয়োজন পড়ে না।

উসূলে ফিকহের কিতাবপত্রে বর্ণিত ইজতিহাদ-গবেষণার এই ফর্মুলাগুলো উম্মতকর্তৃক স্বীকৃত ও অনুসৃত। এর বাইরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজন কর্তৃক যেসব মনগড়া ফর্মুলা বের হয়েছে, সেগুলো না উম্মত কর্তৃক স্বীকৃত আর না অনুসৃত। সেগুলো বাতিল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সেসব ফর্মুলা স্বীকৃতি দিলে কুরআন-হাদীস থেকে অনাকাঙ্খিত ও অগ্রহণযোগ্য বিষয়াদি প্রমাণ করার পথ খুলে যাবে। যেমন সামনের আলোচনায় আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ্।

বিভিন্ন সময়ে ইসলামী ইজতিহাদ-গবেষণার ক্ষেত্রে মনগড়া বিভিন্ন বাতিল ফর্মুলা অনুসরণ করে কিছু লোককে অদ্ভুত ধরনের সব প্রমাণাদি দাঁড় করাতে দেখা যায়। এরকম কয়েকটা বাতিল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য ফর্মুলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

www.maktabatulabrar.com

এক. কোনো কিছুর ভৌগোলিক অবস্থান দিয়ে কোনো মাসআলা বা বিধান প্রমাণিত করা

এটা এমন একটা মনগড়া ফর্মুলা, যা দ্বারা কোনো শরয়ী বিধান প্রবর্তন উম্মত কর্তৃক স্বীকৃতও নয়, স্বীকৃতিযোগ্যও নয়। যেমন, কেউ কেউ 'গোল্ডেন রেশিও'র ভিত্তিতে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর নাভি প্রমাণিত করে মক্কা মুকাররমাকে সারা পৃথিবীর মূল কেন্দ্র ধরে মক্কা মুকাররমার সাথেই একসঙ্গে সারা পৃথিবীর রোযা ও ঈদ উদযাপনের থিওরি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। যদিও তাদের গোল্ডেন রেশিওর ভিত্তিতে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর নাভি প্রমাণিত করার হিসেবে ভুল রয়েছে, তদুপরি শরীয়তে ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত নয় এমন সব ভিত্তির উপর আলোচনা দাঁড় করানো হয়েছে, যা আমি আমার 'গোল্ডেন রেশিও এবং কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি কি না এ প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণিত করে দেখিয়েছি। গোল্ডেন রেশিওর হিসেবে বা কোনো রকম ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে কোনো স্থানকে কোনো বিধানের ভিত্তি বানানোর ধারাকে স্বীকৃতি দিলে আরও কত অনাকাঙ্খিত ও অগ্রহণযোগ্য বিষয় প্রমাণ করার পথ খুলে যাবে সে সম্বন্ধেও আমি উদাহরণসহ বিবরণ তুলে ধরেছি। প্রবন্ধটি 'মাসিক আলকাউসার'-এর এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এটি নেটে ও ফেসবুকে আমাদের একাধিক আইডি, পেজ ও ওয়েবসাইটেও রয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার কারণে সে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এ প্রবন্ধে আনা সম্ভব হল না।

দুই. হরফের সংখ্যা দিয়ে কোনো কিছু প্রমাণিত করা

এটাও একটা মনগড়া ফর্মুলা, যা উম্মত কর্তৃক স্বীকৃত নয়, স্বীকৃতিযোগ্যও নয়। যেমন, কেউ কেউ কুরআনে কারীমের সূরা আলে ইমরানের ৯৬ নং আয়াত দ্বারা কা'বা শরীফকে গোল্ডেন রেশিও পয়েন্টে দেখানোর চেষ্টা করেন। (এই চেষ্টার উদ্দেশ্যও তাই, যা পূর্বে এক নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।) আয়াতটি এই :

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

এ আয়াতে কা'বাগৃহ সর্বপ্রথম গৃহ এ প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত বাক্কা (بكة) হল মক্কারই আরেক নাম। এখন যারা এই আয়াত দ্বারা কা'বা শরীফকে গোল্ডেন রেশিও পয়েন্টে দেখানোর চেষ্টা করেন,

তারা বলেন, এ আয়াতে বাক্কা (তথা মক্কা) শব্দটি উচ্চারিত হওয়া পর্যন্ত হরফ-সংখ্যা ২৯ এবং গোটা আয়াতে হরফ-সংখ্যা ৪৭। এখন গোল্ডেন রেশিও পয়েন্ট বের করার নিয়ম অনুযায়ী বড় সংখ্যাকে ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে গোল্ডেন রেশিও পয়েন্টে তথা ১.৬১ বের হয় (৪৭÷২৯=১.৬১)।

এখানে আমাদের প্রথম বক্তব্য হল এখানে ভাগফল ভুল হয়েছে। হবে ৪৭÷২৯=১.৬২। তাহলে সঠিক গোল্ডেন রেশিও হল না। যদি ভাগফল ১.৬১ হত তাহলে সঠিক গোল্ডেন রেশিও হত। কা'বা শরীফ সংক্রান্ত অন্য যেসব আয়াত রয়েছে সেগুলোতে গোল্ডেন রেশিওর ধারে কাছেও যায় না। যেমন একটি আয়াত :

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ.

এখানে শুরুতে কা'বা শব্দসহ ১৪ হরফ। আর মোট হরফ-সংখ্যা ৩৬। তাহলে ৩৬÷১৪= ২.৫৭। কৈ গোল্ডেন রেশিও গেল কোথায়? যদি কা'বা শব্দের আগের ৮ হরফ এবং কা'বা শব্দসহ পরের মোট ২৮ হরফ এভাবে হিসাব করা হয়, তাহলে হবে ২৮÷৮= ৩.৫। কৈ গোল্ডেন রেশিও গেল কোথায়?

এ তো গেল এ ব্যাপারে প্রথম বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য হল, যদি হরফের সংখ্যা দিয়ে আহকাম ফাওয়ায়েদ গবেষণা করে বের করার তথা ইস্তিমবাত-ইস্তিদলাল করার এই তরীকা মেনে নেয়া হয়, তাহলে কুরআন-হাদীস দিয়ে অনেক গোমরাহী প্রমাণিত করার অবকাশ বের হয়ে আসবে। যেমন, কেউ যদি বলে, রব (رب) শব্দে মোট তিনটি হরফ, অতএব (নাউযুবিল্লাহ) খৃস্টানদের কথিত ত্রিত্ববাদ তথা তিন খোদা থাকার দর্শন ঠিক, তাহলে তার কী জবাব দেয়া যাবে?

এমনিভাবে কেউ যদি বলে, ইলাহ (الہ) শব্দে মোট চারটি হরফ। অতএব হিন্দুদের কথিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এই তিনজন এবং পরমেশ্বর মোট চারজন ইলাহ থাকার মতবাদ সঠিক তাহলে তার কী জবাব দেয়া যাবে? কেউ যদি বলে, মাসজিদ (مسجد) শব্দে চারটি হরফ, অতএব মাসজিদে চারটির বেশি পিলার দেয়া যাবে না, একাধিক তলা করতে হলে চার তলার বেশি করা যাবে না তাহলে কী বলা যাবে?

www.maktabatulabrar.com

এভাবে কুরআনের কোনো শব্দ বা বাক্যের হরফ-সংখ্যা দিয়ে গবেষণা তথা ইস্তিমবাত-ইস্তিদলালের ছেলেমিপনা শুরু হলে তা ঠেকানোর কী উপায় থাকবে?

তিন. হরফের মান দিয়ে কোনো কিছু প্রমাণিত করা

এটাও একটা মনগড়া ফর্মুলা, যা উম্মত কর্তৃক স্বীকৃত নয়, স্বীকৃতিযোগ্যও নয়।

أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ.

এই বিন্যাস অনুসারে আরবী হরফগুলোর মান ধরা হয় যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০, ৬০০, ৭০০, ৮০০, ৯০০, ১০০০। এভাবে أبجد -এর আলিফ থেকে ضظغ -এর গাইন পর্যন্ত (ধারাবাহিকভাবে) হরফগুলোর যে মান (উপরে বর্ণিত) ধরা হয় তা একটা পারিভাষিক বিষয়। সেটা কোনো দ্বীনী বা শরয়ী বিষয় নয়। এর কিছু প্রাচীন যুগ থেকে এভাবে কথিত হয়ে আসছে আর কিছু (ثخذ ضظغ) পরবর্তীতে নাসর ইবনে আসিম নাহবী (নাহ্‌ব শাস্ত্রবিদ) যোগ করেছেন। এই বিন্যাস অনুসারে হরফগুলোর যে মান ধরা হয়েছে সেই মানে কোনো প্রভাব আছে এমন কিছুও কুরআন হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। এজন্যই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম-এর সংখ্যা ৭৮৬ লিখলে বিসমিল্লাহ লেখার হক আদায় হবে না। তাতে বিসমিল্লাহ-র ফায়দা আছর কিছুই হবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ইংরেজি বর্ণমালারও যে মান ধরা হয় যথা : অ, র, ঔ, ছ, ণ এই অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটির মান ১। তারপর ই, ক, জ এই অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটির মান ২। তারপর ঈ, খ, ঝ, এ এই অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটির মান ৩। তারপর উ, গ, ঞ এই অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটির মান ৪। তারপর ঊ, ঐ, ঘ, ঢ এই অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটির মান ৫। তারপর ট, ঠ, ড এই অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটির মান ৬। তারপর ঙ, ত এই অক্ষরদুটোর প্রত্যেকটির মান ৭। তারপর ঋ, চ এই অক্ষরদুটোর প্রত্যেকটির মান ৮ এই মানও নিছক একটি পারিভাষিক বিষয়। দ্বীন ও শরীয়তের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ কিছু লোককে দেখা যায়, আরবী হরফের এই মান দিয়ে আর কিছু লোককে

দেখা যায়, ইংরেজি বর্ণের বা সংখ্যার মান দিয়ে অনেক কিছু প্রমাণিত করতে চান। যেমন, তাবিজ-তুমারের অনেক বইপত্রে আরবী বিভিন্ন শব্দের হরফের মান দিয়ে অনেক নকশা ইত্যাদি দাঁড় করানো হয়েছে এবং সেসব নকশার নানাবিধ প্রভাব থাকার কথা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। জ্যোতিষীরা মানুষের নামের অক্ষরগুলোর মান দিয়ে বা জন্মের বছর, মাস ও তারিখের সংখ্যাগুলোর মান দিয়ে কোন কোন্ রাশির জাতক তা নির্ধারণ করেন এবং এক এক জাতকের জীবনে ঐ সংখ্যার ফলে এক এক ধরনের প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন। এগুলো না কুরআন-হাদীস দ্বারা সমর্থিত, না বিজ্ঞান কিংবা যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত। (এ সম্বন্ধে আমার রচিত 'ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ' গ্রন্থে (পৃ. ১৮৭-১৯৯) খণ্ডনমূলক বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

চার. গাণিতিক হিসাব দিয়ে কোনো কিছু প্রমাণ করা

এটাও একটা মনগড়া ফর্মুলা, যা উম্মত কর্তৃক স্বীকৃত নয়, স্বীকৃতিযোগ্যও নয়। কোনো রকম গাণিতিক হিসাবের ভিত্তিতে কোনো মাসআলা বা বিধান বের করার বিধিবদ্ধতা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অথচ কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে, নানান রকম গাণিতিক হিসাব দিয়ে নানা রকমের ইসলামী বিধান প্রমাণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। যেসব হিসেবের কোনো আগা-মাথাও নেই। যেমন, একজন গবেষণা করে বের করেছেন তারাবির নামায ৮ রাকআত। কেননা আরবী বছর সর্বনিম্ন ৩৫৩ দিনের হয়। আর ৩৫৩ সংখ্যার যোগফল হয় (৩+৫+৩=) ১১। এই ১১ থেকে ৩ রাকআত বিতিরের আর বাকি ৮ রাকআত তারাবীর। আবার আরবী বছর সর্বোচ্চ হয় ৩৫৫ দিনে। আর ৩৫৫-এর যোগফল হয় (৩+৫+৫=) ১৩। এখানে আগের চেয়ে ২ রাকআত বেশি হয়, সেটা হল ফজরের ২ রাকআত সুন্নাত। আবার আরবী বছর ৩৫৪ দিনেও হয়। আর ৩৫৪-এর যোগফল হয় (৩+৫+৪=) ১২। এর ৮ রাকআত তারাবীহের, আর ফজরের সুন্নত ও ফরয মিলে ৪ রাকআত। আবার এভাবেও বলেছে, কুরআন মাজীদের সূরা হল ১১৪টি, আর ১১৪-এর সংখ্যাগুলোর যোগফল হয় (১+১+৪=) ৬। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে তারাবীহ পড়েছেন মোট ৩ দিন। এবার ৬+৩=৯। এর মধ্যে ৮ হল তারাবীহ আর ১ হল বিতির। কী সব অদ্ভুত তরীকার গবেষণা!

www.maktabatulabrar.com

তাহলে হিসাবের সময় এক জায়গায় বিতির অন্তর্ভুক্ত হল আর এক জায়গায় হল না, এক জায়গায় বিতির তিন রাকআত ধরা হল আর এক জায়গায় এক রাকআত, এক জায়গায় ফজরের ফরয অন্তর্ভুক্ত হল আর এক জায়গায় হল না এগুলোর কারণ কী? এটা নিছক ইচ্ছেমত জোড়াতালি দিয়ে মতলব হাসিলের প্রয়াস নয় কি? এরকম গবেষণার সূত্র কি কুরআন-হাদীস দ্বারা বা ইজমায়ে উম্মত কিংবা কিয়াস দ্বারা স্বীকৃত? তারাবীহ নামাযের রাকআত-সংখ্যার সাথে বছরের দিন-সংখ্যার কী সম্পর্ক? তারাবীহের রাকআত-সংখ্যার সাথে কুরআনের সূরা-সংখ্যার কী সম্পর্ক? এরকম খামখেয়ালি মতে এখান-ওখান থেকে এটা ওটা নিয়ে বা এটা ওটা বাদ দিয়ে যোগফল বের করে তা দিয়ে কোনো বিধান প্রমাণ করা গবেষণার এই অদ্ভুত জগাখিচুড়ি পদ্ধতি কোথা থেকে বের হল?

গবেষণার এই পদ্ধতি মেনে নিলে কেউ যদি গবেষণা করে বের করে জাহান্নামের সংখ্যা হচ্ছে ৭, অতএব জাহান্নামে কারও শাস্তি হলে সর্বোচ্চ হবে ৭ দিন। আর জান্নাতের সংখ্যা হচ্ছে ৮, অতএব জান্নাতে অবস্থান হবে সর্বোচ্চ ৮ দিন, তারপর আর (নাউযু বিল্লাহ) জাহান্নাম জান্নাত থাকবে না। এরকম গবেষণার কী উত্তর থাকবে?

পাঁচ. সাংখ্যিক তাৎপর্য দিয়ে কোনো কিছু প্রমাণিত করা

এটাও ইসলামী গবেষণার স্বীকৃতিযোগ্য কোনো পন্থা নয়। এটা একটা বাতিল পন্থা, যা কেউ কেউ ব্যবহার করছে। যেমন, কেউ কেউ কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করার জন্য কুরআনের এক ধরনের সাংখ্যিক তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। তারা কুরআনের সূরা-সংখ্যা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই শব্দ যতবার ব্যবহার হয়েছে তার সংখ্যা ইত্যাদি অনেক কিছুর সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হয় দেখিয়ে এটা দ্বারা কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। (বলতে চেয়েছেন, এমনটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।) যেমন তারা বলেছেন, কুরআনের সূরা-সংখ্যা ১১৪, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হয় (১১৪÷১৯=৬)। সূরা আলাক কুরআন মাজীদের ৯৬ নং সূরা। শেষ থেকে উল্টোক্রমে এলে ১৯তম সর্বশেষ সূরাও এই আলাক। সর্বশেষ সূরা নাস-এর শব্দ-সংখ্যা ১৯। কুরআন মাজীদের প্রথম বাক্য বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম; যাতে মোট অক্ষর-সংখ্যা ১৯। পবিত্র কুরআনে ইসিম (অর্থ নাম) শব্দটি আছে ১৯বার, আল্লাহ্ শব্দটি আছে ২৬৯৮ বার, আররহমান ৫৭ বার আর আররহীম ১১৪ বার সবগুলোই ১৯

দ্বারা বিভাজ্য। এভাবে তারা অনেক কিছুই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হয় এবং উনিশ সংখ্যার পুনঃপৌণিক উপস্থিতি দেখা যায় বলে দেখিয়েছেন। আর এটা দ্বারাই কুরআনে কারীমের অলৌকিকত্ব প্রমাণিত করতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে আমাদের সংক্ষিপ্ত কথা হল, ১৯-এর এই সাংখ্যিক তাৎপর্য দেখানোর মধ্যে প্রচুর ফাঁক-ফোঁকর রয়েছে। যেমন, কুরআনের যে বিষয়গুলোর সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হয় না, কিংবা যেগুলোতে ১৯ সংখ্যার উপস্থিতি নেই, সেগুলোর কথা তারা এড়িয়ে গেছেন। যেমন, কুরআনের বহু সূরার আয়াত-সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হয় না। বহু শব্দের ব্যবহার-সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হয় না। এরকম যেসবের সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হয় না সেগুলোর কথা তারা এড়িয়ে গেছেন।

যাইহোক এই সাংখ্যিক তাৎপর্য নিয়ে অনেক পর্যালোচনা হতে পারে। এর সমালোচনায় অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেনও। তাই এ সম্বন্ধে আমি আর বিস্তারিত কিছু লিখলাম না। আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই, কোনো সংখ্যা দিয়ে কোনোভাবে কোনো কিছু প্রমাণিত করার নীতি না কুরআন-হাদীস দ্বারা স্বীকৃত, না উম্মত কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুসৃত। আচ্ছা ভেবে দেখুন তো, কোনো গ্রন্থের অনেক কিছু একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হলে যদি সেটা অলৌকিক বলে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়, তাহলে কোনো লোক যদি দীর্ঘ সময় নিয়ে হিসাব-নিকাশ করে এমন একটা গ্রন্থ দাঁড় করায়, যার অনেক কিছু একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হয় এবং সেটাকে ঐশী গ্রন্থ এবং সেই সুবাদে নিজেকে নবী বলে দাবি করে বসে, তাহলে কি মেনে নেওয়া যাবে? আদৌ না। বস্তুত একটা গ্রন্থের অনেক কিছু একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হবে এমন গ্রন্থ রচনা করা মানব সাধ্যের উর্ধ্বে নয়। অতএব এটাকে অলৌকিকত্ব সাব্যস্ত করার উপাত্ত বানানোর কোনোই অবকাশ নেই।

আরও ভেবে দেখুন, কোন লোক যদি বর্তমান বিকৃত বাইবেলের অনেক কিছুকে নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য দেখাতে পারে (যেমনটা কেউ কেউ করেছে বলেও শোনা যায়। কেউ ৭ দ্বারা কেউ ১২ দ্বারা অনেক কিছু বিভাজ্য দেখানোর চেষ্টা করেছে বলে শোনা যায়।), তাহলে কি বাইবেলের অলৌকিকত্ব বহাল থাকা সাব্যস্ত হয়ে সেটাকে অবিকৃত তথা সঠিক আখ্যায়িত করতে পারবে? কখনো নয়।

www.maktabatulabrar.com

যারা ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হওয়ায় কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করতে চান, তারা বলতে পারেন, ১৯ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হলে তাতে অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হবে না, ১৯ দ্বারাই বিভাজ্য হতে হবে। কেননা ১৯ সংখ্যা সম্বন্ধে কুরআনে সূরা মুদ্দাসসিরের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

এ আয়াতে বলা হয়েছে, সবকিছুর উপর ১৯ সংখ্যা। (তারা এমনই ভাবার্থ করে থাকে।) কাজেই ১৯ সংখ্যার ব্যাপারটাই ভিন্ন। এ ব্যাপারে আমরা বলব, আয়াতের তরজমায় মারাত্মক বিভ্রান্তি ঘটানো হয়েছে। تِسْعَةَ عَشَرَ অর্থ ১৯ এটা ঠিক আছে। কিন্তু عَلَيْهَا -এর অর্থ 'সবকিছুর উপর' এটা ঠিক নয়; বরং عَلَيْهَا শব্দে ها জমীরের 'মারজি' (مرجع) জাহান্নাম। সেমতে عَلَيْهَا -এর অর্থ হচ্ছে জাহান্নামের উপর। পুরো বাক্যের অর্থ হল জাহান্নামের উপর তথা জাহান্নামে ১৯ জন (প্রহরী) রয়েছে। তাহলে এবার বলুন, জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যার মধ্যে এমন কী মাহাত্ম্য ঢুকল যে, সেই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হলে তাতে অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হবে, অন্য সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হলে অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হবে না?

আল্লাহ্ আমাদেরকে সব ধরনের বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত রাখেন।

وما علينا إلا البلاغ

✦ গ্রন্থ সমাপ্ত ✦

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন রচিত
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

■ আহকামে যিন্দেগী
জীবনের সব রকমের বিধি-বিধান সম্বলিত একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। একজন মুসলমানের ইসলামী যিন্দেগী পরিচালনার জন্য যত ধরনের বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক, সংক্ষেপে সে সবকিছু এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

■ ফাযায়েলে যিন্দেগী
নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও কুরআনের আলোকে রচিত জীবনের সব বিষয়ের ফাযায়েল সম্বলিত। ঘরে মসজিদে ও মজলিসে তালীমের উপযোগী। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোন হাদীছ এ গ্রন্থে আনা হয়নি।

■ ফিক্হুন নিছা
নারী জীবনের ব্যাপক বিধি-বিধান জানার জন্য। নারীদের সিলেবাস রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য। বিশেষ বিশেষ মাসআলার দলীল জানার জন্য। এবং মীরাছ, পর্দা, বহুবিবাহ, তারাবীহ কয় রাকআত ইত্যাদি যেসব বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা রয়েছে, সেগুলোর দলীল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব জানার জন্য।

■ বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড
এ গ্রন্থে একজন ইমামের জন্য সারা বৎসর নিয়মিত বিষয়াদিসহ ইসলামের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বয়ান করার মত সব ধরনের বয়ান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন।

■ আহকামে হজ্জ
এ গ্রন্থে সব প্রকার হজ্জ এবং উমরা ও যিয়ারতের মাসায়েল বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জ ও যিয়ারত সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের মানচিত্র এবং ছবিও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

■ ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ
এ গ্রন্থে ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা এবং এ সব আকীদা থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। দেশী বিদেশী, নতুন পুরাতন সব ধরনের ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

■ ইসলামী মনোবিজ্ঞান
এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার মনোবৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা এবং ইসলামে মনোবিজ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ও বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

■ ইসলামী ভূগোল
এ গ্রন্থে ভূগোল শাস্ত্র বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় আলোচনা অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক বিষয়াদির বিশদ বিবরণ পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি চার কালারে মুদ্রিত বহু ছবি ও মানচিত্র সম্বলিত।

■ কুরআন ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র
এক পৃষ্ঠার এ মানচিত্রে কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত স্থানসমূহের বর্তমান অবস্থান ও বর্তমান নাম উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের প্রাচীন সীমানা ও বর্তমান সীমানা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

■ হজ্জ ও জিয়ারতের মানচিত্র
এ মানচিত্রে হজ্জ, উমরা ও জিয়ারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় ও স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এক পৃষ্ঠায় মক্কা মুকাররমাহ ও তার বিষয়াদি আরেক পৃষ্ঠায় মদীনা মুনাওওয়ারাহ ও তার বিষয়াদি চিহ্নিত করা হয়েছে।

■ কথা সত্য মতলব খারাপ
রম্য রচনায় উগ্র আধুনিকতা এবং সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে বদ মতলব সিদ্ধি করা ও প্রতারণা করার অপপ্রয়াসের সমালোচনা।

■ ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ
এতে লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। মৌলিক রচনার নিয়ম-নীতি ও অনুবাদের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্ণের নাম ও উচ্চারণ থেকে শুরু করে ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য সমালোচনা, কবিতা ও ছড়া রচনার নিয়ম-নীতি, সংবাদ, কলাম ও ফিচার লেখা এবং বাংলা ভাষার অলংকার ইত্যাদি সব বিষয়ের আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলীর উচ্চারণ সম্পর্কিত একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে। আর শেষে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য শিখতে আগ্রহীদের জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সিলেবাস।

■ চশমার আয়না যেমন

পৃথিবীতে মতবাদের শেষ নেই। মত মতান্তরের অন্ত নেই। এই মত বিভিন্নতা বা মতবিরোধের মূলে রয়েছে কে কোন্ বিষয়কে কোন্ অ্যাঙ্গেলে দেখছেন, কে কোন্ বিষয়কে কোন্ দৃষ্টিভংগিতে বিচার করছেন সেটা। যার চশমার আয়না যেমন, তিনি সব কিছুকে দেখছেন তেমন। এ বিষয়টার উপরই একটি রম্য রচনার প্রয়াস হল "চশমার আয়না যেমন"।

■ যদি জীবন গড়তে চান

শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের জীবন গড়ার পদ্ধতি। সুখী-সমৃদ্ধ, টেনশনমুক্ত, নিরাপদ, বরকতময় ও নূরানী জীবন গড়ার পদ্ধতি। সব বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক আলোচনায় সমৃদ্ধ, সকল বয়সের সবশ্রেণীর লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় এক অনবদ্ধ গ্রন্থ।

■ মিসরে কয়েকদিন

এটি একটি মিসরের সফরনামা। এতে মিসরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদিসহ মিসর সম্পর্কে জানার উৎসুক্য আছে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দর্শনীয় স্থানসমূহের প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি মিসর সফরে আগ্রহীদের জন্য গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।

■ তাফসীরে বুরহানুল কুরআন (১-৪ খ-, পূর্ণ সেট)

বৈশিষ্ট্যাবলি : ● তাহকীকী তরজমা। ● তরজমার বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। ● প্রয়োজনীয় শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির উল্লেখ। ● প্রতি আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে নম্বরবদ্ধ করে উল্লেখ।

লেখক: বিশিষ্ট কয়েকজন আলেম কর্তৃক রচিত ও মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত।

■ চার ইমাম

ফিকহের চার ইমাম– ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইমাম মালেক রহ, ইমাম শাফিঈ রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.–এর প্রামাণ্য জীবন কথা। লেখক দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ একাডেমির তত্তাবধায়ক মাওলানা কাজি আতহার মুবারকপুরি রহ.। গ্রন্থটির প্রতিটি তথ্য নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স সমৃদ্ধ।

অনুবাদক: মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ ও অন্যান্য।
সম্পাদনায়: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

www.maktabatulabrar.com

□ الاستفادة بشرح سنن ابن ماجة

এটি সুনানে ইবনে মাজা-র এক অনন্য শরাহ। আরবীতে রচিত এ শরাহর বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ :

١. بيان من أخرج الحديث مسندًا غير ابن ماجة.
٢. كلام موجز حول أحوال الحديث ورواته.
٣. شرح المفردات.
٤. الشرح الإجمالي للحديث ليقرب معنى الحديث وغرضه إلى الأذهان.
٥. بيان المباحث المتعلقة بالحديث على المنهج التدريسي.
٦. بيان ما يستفاد من الحديث موجزًا.
٧. بيان مطابقة الحديث للترجمة.

■ চিন্তা-চেতনার ভুল

এ গ্রন্থে মৌলিকভাবে জানা যাবে–

" চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়।
" চিন্তা-চেতনার মৌলিক গলদসমূহ।
" চিন্তা-চেতনার ভুল কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তার বিবরণ।
" ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সব দিকে কি কি ভুল চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে তার বিবরণ।

■ নফ্স ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

নফ্সের যত ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, মনের মধ্যে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলামের বিভিন্ন আমল ও আখলাক সম্বন্ধে যত ধরনের কুট প্রশ্ন ও ওয়াছওয়াছা জাগে এ গ্রন্থে সেসব ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের কৌশল এবং সেসব প্রশ্নের প্রশান্তিমূলক জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

■ সলাতুন নবী স.

- এ গ্রন্থ নামাযের মাসায়েল দলীলাদিসহ জানার জন্য।
- এ গ্রন্থ মাযহাব মানার প্রয়োজন নিয়ে বিভ্রান্তি কিংবা দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করার জন্য।
- এ গ্রন্থ হানাফী মাযহাবে বর্ণিত নামাযের পদ্ধতি সহীহ ও সুদৃঢ়- তার দলীলাদি জানার জন্য।
- এ গ্রন্থ হানাফী মাযহাবের নামায রসূল স.-এর নামায থেকে অভিন্ন- তা প্রমাণ করার জন্য।

লেখক : মুফতি গোলামুর রহমান
সম্পাদনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন